কাহাকে ?

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

উপহার

কাহাকে ?

করুণা সে চাহে কৃতজ্ঞতা
ভালবাসা চাহে ভালবাসা ,
তব প্রেম অতুল মহান্,
শুধু দান নাহিক প্রত্যাশা !
নিষ্কাম চরণে তব দেব,
প্রীতিময় এ পূজা, প্রণতি,—
স্বার্থপূর্ণ দীন সকামের
আত্মহারা বিস্ময়-ভকতি ।

কাহাকে ?

•:•:••

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:•:—

Man's love is of Man's life a thing apart
'Tis woman's whole existence.

এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি এক জন পুরুষ। পুরুষ হইয়া রমণীর অন্তর্গত প্রকৃতি এমন হুবহু ঠিকটি কি করিয়া ধরিলেন, ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়। আমি ত আমার জীবনের দিকে চাহিয়া অক্ষরে অক্ষরে এ কথার সত্যতা অনুভব করি। যতদূর অতীতে চলিয়া যাই, যখন হইতে জ্ঞানের বিকাশ মনে করিতে পারি, তখন হইতে দেখিতে পাই—কেবল ভালবাসিয়াই আসিতেছি, ভালবাসা ও জীবন আমার পক্ষে একই কথা; সে পদার্থটাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে জীবনটা একেবারে শূন্য অপদার্থ হইয়া পড়ে—আমার আমিত্বই লোপ পাইয়া যায়।

তখন আমার বয়স কত? সাল তারিখ ধরিয়া এখনি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। আমাদের দুই বোনের কাহারো জন্মকোষ্ঠী বা ঠিকুজি নাই, তাই ইচ্ছামাত্র সময়ে অসময়ে এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারি না। একবার একখানা গানের খাতার কোণে তারিখটা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু খাতাখানা খুঁজিতে গিয়া শৈশবের বড় বড় মক্সওয়ালা ক খ লেখা কাগজপত্রের কাঁড়িগুলা পর্য্যন্ত মিলিল, কেবল সেইখানাই পাওয়া গেল না। পুরুষে সম্ভবতঃ আমার সারল্যে অবিশ্বাস করিয়া ইহার মধ্য হইতে গূঢ় অভিপ্রায় টানিয়া বাহির করিবেন, কিন্তু স্ত্রীলোক বুঝিবেন, বাস্তবিক পক্ষে সাল তারিখ মনে করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে কিরূপ কঠিন ব্যাপার। বরঞ্চ ঘটনার ছবি হইতে তাহার আনুষঙ্গিক বার তিথি আমরা ঠিক ধরিতে পারি, কিন্তু তিথি নক্ষত্র আগে মনে করিয়া যদি ঘটনা মনে করিতে হয়, তাহা হইলে ঘটনাটির কালাশুদ্ধি হইবার যোল আনাই সম্ভাবনা। যেমন দিদির বিবাহ যখনি মনে পড়ে—তখনি উৎসব-সমারোহপূর্ণ ফাল্গুন মাসের সেই বিশেষ পূর্ণিমা নিশিটিও চোখের উপর জলজীবন্ত দেখিতে পাই, কিন্তু সালের মূর্ত্তিতে আর ফাল্গুনের বসন্তে বা পূর্ণিমার সে জ্যোৎস্নালোকে উপরঞ্জিত নহে। কাজেই ছবিগত সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য ধরিবার মাস তিথির মত সাকার চিত্রে এক সাল হইতে অন্য সালের তফাৎ মনে করিতে পারি না! নিরাকার নিরূপ ধ্যানের ন্যায় ধ্যান সহকারে এখনকার সাল ধরিয়া দশ বৎসর পূর্ব্বের সে সালটা গণিয়া তবে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এ নিয়মে অর্থাৎ স্মৃতির সাহায্যে ত আর নিজের জন্মসাল নির্ণয় করা যায় না, বিধাতা পুরুষ তাহা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। সৃষ্টির এ কি এক অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিতে পারি না—মানব জন্মগ্রহণ করে ধরাতলে, অমনি আকাশের তারা নক্ষত্ররাশি তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়া তাহার ভাগ্য-রচনা করিতে বসে, আর মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ আত্মীয় যে স্মৃতি, তাহাকে সে তখন একেবারে হারাইয়া ফেলে, অন্ততঃ সে সময় স্মৃতির সহিত মানুষের কোন সম্পর্কই থাকে না। এখানে তাই কেবল নিতান্তই অঙ্কের সঙ্কেতে অর্থাৎ সালের খাতিরে সালটা মনে রাখিতে গিয়াই যত মুস্কিল বাধিয়াছে, তাহা ১২৮২ বা ৮৩ ক্রমাগতই ভুল হইয়া যায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এ ভুলে ক্ষতি কাহার? আমারো নহে, পাঠকেরো নহে। অবশ্য এ রকম একটা ভুলে জীবনে যদি সুদীর্ঘ তিনশত পঁয়ষট্টি দিন ও বারটা মাসওয়ালা একটা বৃহৎ সংবৎসরের ব্যবধান পড়িত, তাহা হইলে ক্ষুদ্রজীব এক জন মনুষ্যের পক্ষে তাহাতে বিস্তর তফাৎ করিয়া তুলিত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমি হাজার ভুলি

না কেন, কাল আমাকে কিছুতেই ভুলিবে না, বয়স আমার সর্ব্ব অবস্থাতেই কড়ায় গণ্ডায় ঠিকটি থাকিয়া যাইবে, আর পাঠকের পক্ষে—আমি উনিশ না হইয়া যদি বিশ হই কিংবা বিশ না হইয়া যদি একুশই হই —সব সমানই কথা। যতদূর বুঝিতেছি, তিনি কেবল বিষয়টায় একটা শেষ নিষ্পত্তিতে আসিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, নিষ্পত্তিটা ঠিক বা বেঠিক হউক, তাহাতে কি এত আসিয়া যায়? এ প্রকৃতি পুরাতত্ত্ববিদেরই একচেটিয়া নহে। তবে ধরিয়া লওয়া যাক্, আমার বয়স তখন আঠার উনিশ, আমি এখনো অবিবাহিত।—শুনিয়া কি কেহ আশ্চর্য্য হইতেছেন? কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার ইহাতে কি আছে? আজকাল ত এমন অনেকেই ইহার চেয়েও অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকেন, আমিও না হয় আছি। ইহাই যদি বিস্ময়জনক হয়, তবে অধিকতর বিস্ময়ের কথা পরে আসিতেছে। আমি ভালবাসি, বিবাহের পূর্ব্বেই ভালবাসি, তিনি যে স্বামী হইবেন, এমনতর আশা করিয়াও ভালবাসি নাই। কেবল তাহাই নহে, এই ভালবাসাই আমার একমাত্র প্রথম এবং শেষ ভালবাসা নহে। আমি ইহাকে যখন ভালবাসি নাই, তাহাকে ভাল বাসিয়াছিলাম—আর তাহাকে যখন বাসি নাই, তখনো আমার হৃদয় শূন্য ছিল না। মাকে মনে পড়ে না, শিশুকালেই মাতৃহারা, কিন্তু শৈশবে বাবাকে যেমন ভালবাসিতাম, কোন সন্তান মাকে যে তাহার অধিক ভালবাসিতে পারে, এরূপ আমি কল্পনাও করিতে পারি না। অনেকেরই সংস্কার আছে, পিতৃমাতৃপ্রেম ও দাম্পত্যপ্রেম পরস্পর নির্লিপ্ত পৃথক্ দুই বস্তু, একের সহিত অন্যের তুলনাই অসঙ্গত, অসম্ভব। তুমি আমার সহিত মিলিবে কি না, জানি না, আমার কিন্তু ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, আমার অভিজ্ঞতায় শৈশবের মাতৃপ্রেমে ও যৌবনের দাম্পত্যপ্রেমে অল্পই তফাৎ। যৌবনে প্রণয়ীরই মত, শৈশবে পিতামাতা আমাদের একমাত্র নির্ভরের সামগ্রী, পূজার সামগ্রী, ভালবাসার সামগ্রী, পিতা-মাতা রক্ষক, দেবতা, প্রণয়ী, একাধারে সর্ব্বস্ব। উভয় প্রেমেই—সেই আসঙ্গলিপ্সা, সারাদিন চোখে চোখে রাখিতে সাধ, প্রাণে প্রাণে আপনার করিবার ইচ্ছা, সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া রাখিবার বাসনা, না পাইলে পরম অতৃপ্তি, তাহার সুখে সুখ, তাহার সুখের জন্য কষ্ট-স্বীকারে আনন্দ, এ সমস্ত একই রকম।

আমরা দুই বোন, কিন্তু দিদির সঙ্গে আমার তেমন ভাব হইতে পারে নাই। তিনি বয়সে আমার চেয়ে ৪।৫ বৎসরের বড়, তাহা ছাড়া তিনি বেশীর ভাগ পিসীমার কাছে কলিকাতাতেই থাকিতেন। তবুও দিদিকে খুব ভালবাসিতাম; তিনি বাড়ী আসিলে আনন্দ হইত, কিন্তু বাড়ী আসিয়া দিদি যদি বাবাকে দখল করিতেন বা তাঁহার কোন কাজ করিয়া দিতেন, আমার ভাল লাগিত না। সন্ধ্যা-বেলা আহারান্তে বাবা বিছানায় শুইয়া গুড়গুড়ি টানিতেন, দিদি যখন থাকিতেন, তখন আমরা দুই বোনে দুই পাশে গিয়া শুইতাম, কিন্তু বাবার গলা জড়াইয়া থাকা আমার একচেটিয়া ছিল। দুই হাতে কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কানে কানে কথা হইত—"বাবা, তুমি কাকে ভালবাস?" মনের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস, আমাকেই ভালবাসেন, তিনি কিন্তু তাহা বলিতেন না, বলিতেন, "দু'জনকেই ভালবাসি।" উত্তরে সন্তুষ্ট হইতাম না, অসন্তুষ্টও হইতাম না; কেন না, তিনি যাহাই বলুন, আমার মনে হইত, আমাকেই ভাল-বাসেন। আমি কানে কানে বলিতাম—"দিদি রাগ করবেন বুঝি।" বাবা হাসিতেন, আমার বিশ্বাস মনে আরো দৃঢ় হইয়া আঁটিয়া বসিত। তখন আমার বয়স কত জানি না—বোধ হয় ৫।৬ বৎসর হইবে। শীতকালে বাবার গায়ে যথেষ্ট গরম-কাপড় থাকিলেও আমার গায়ের ছোট রুমালখানি দিয়া যতক্ষণ তাঁহাকে না ঢাকিতাম, ততক্ষণ মনে হইত, তাঁহার শীত ভাঙ্গিতেছে না। গরমী-কালে টানাপাখা যতই হউক না কেন, মাঝে মাঝে হাতপাখা না করিলে আমার তৃপ্তিবোধ হইত না। দাসদাসীর অভাব নাই, কিন্তু আমি সুবিধা পাইলেই কুটনা কুটিবার আড্ডায় গিয়া একখানা বঁটি টানিয়া আলুটা পটলটা যাহা সম্মুখে পাইতাম, তাহার উপরেই আঁচড় পাড়িবার অভিপ্রায়ে আঙ্গুলের আঁচড় পাড়িয়া বসিতাম, আর রান্নাঘরে গিয়া বামুনদিদির ভাতের কাঠী কাড়িয়া লইয়া ডাল, মাছের ঝোল, অম্বল নির্ব্বিচারে সবই ঘুঁটিবার প্রয়াস পাইতাম, কখনো বা ব্রাহ্মণীকে স্তুতি-মিনতিতে বশ করিতে পারিলে তাহার লুণ-মসলাটা নিজের হাতে করিয়া হাঁড়িতে ফেলিবার মহানন্দলাভও অদৃষ্টে ঘটিত। এইরূপে রান্নাঘরে কত

দিন যে হাত-পা পুড়াইয়াছি, তাহার ঠিক নাই। হইলে কি হয়,—আমার বিশ্বাস ছিল, অন্ন-ব্যঞ্জনে আমি কাঠী দিলেই বাবার পক্ষে তাহা সুখাদ্য হইবে, কেন না, রান্নাটা তবেই আমার হইল। পান সাজিবার সময় বাবার পানে মসলা দিতে আমাকে না ডাকিলে আমি আর সে দিন রক্ষা রাখিতাম না। বাবা ত ভাত খাইয়া তাড়াতাড়ি আফিসে চলিয়া যাইতেন, তাহার পর সে দিন আমাকে সাধিয়া ভাত খাওয়ান অন্য কাহারও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। —বাগানের ফুলে আর কাহারো অধিকার ছিল না—তোর মা হইতেই যত ভাল ভাল ফুল তুলিয়া আনিয়া বাবার কাছে হাজির করিতাম। জ্যেঠাই-মার পূজার ফুল অল্পই অবশিষ্ট থাকিত, কোন দিন বা মোটেই থাকিত না; সে দিন তিনি বাবার কাছে নালিশ করিতে আসিয়া তাঁহার ফুলগুলি সব লইয়া যাইতেন। আমার এমন রাগ ধরিত! একবার আমার অসুখ করিয়াছিল, দিদি তখন বাড়ী ছিলেন, তিনি আমার বদলে বাবাকে ফুল তুলিয়া দিতেন, অসুখের কষ্ট তেমন অনুভব করিতাম না—যেমন সেই কষ্ট! আমি দুষ্টামি করিলে আমাকে জব্দ করিবার জন্য তেমন কোন সহজ উপায় ছিল না—যেমন "আজ সন্ধ্যাবেলা তোকে চাবী দিয়ে রাখব, বাবার কাছে শুতে দেব না" এই কথা। সহস্র দুষ্টামি এই শাসনে তখনকার মত আমার বন্ধ হইয়া যাইত। এক কথায় আমার সেই ক্ষুদ্র শৈশবজীবন কূলে কূলে তখন তাঁহাতেই পরিপূর্ণ ওতপ্রোত ছিল। তাই বলিয়াছি, শৈশব ও যৌবনপ্রেমে তফাৎ অল্পই। বস্তুতঃ আমার মনে হয়, কি মাতৃপ্রেম, কি ভাইবোনের ভালবাসা, কি বন্ধুত্ব, কি দাম্পত্যপ্রেম, সকলরূপ গভীর ভালবাসারই মূলগত ভাব একই। একের সহিত অন্যের পার্থক্য কেবল সে ভাবের স্থায়িত্ব ও প্রবলতার তারতম্যে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার সুখে সুখবোধ ও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিবার ইচ্ছা প্রেমের এই যে নিঃস্বার্থ অথচ সর্ব্বেসর্ব্বা ভাব—পিতামাতার স্নেহেই ইহার প্রথম স্ফূর্ত্তি এবং ভ্রাতাভগিনী সখাসখীর ভালবাসার মধ্য দিয়া প্রণয়ে ইহার চরম পরিণতি। আসলে, প্রেম-মাত্রে একই রস, কেবল বিকাশনে ও ভিন্নাধারে ভিন্নাকার।

আমি যেমন শিশুকালে যে আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি আছি, তথাপি দেহ জ্ঞানবৃদ্ধির বিকাশে স্বতন্ত্র আকারও হইয়া পড়িয়াছি, সেইরূপ শৈশবপ্রেমই যখন যৌবন মহাকারে বর্দ্ধিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে, তখন আর পূর্ব্বের পরিমিত ক্ষুদ্র ভাবগুলিতে তাহার পরিধি পূর্ণ করিতে পারে না, সে তখনকার শিক্ষাজ্ঞান আকর্ষণ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ আধারে আপনাকে পরিব্যাপ্ত বিকাশিত করিতে চাহে। তখন যাহা দেখিয়াছি, জানিয়াছি, পাইয়াছি, তাহাতেই মন তৃপ্তি মানে না —কেন না, যাহা দেখি নাই, জানি নাই, এমন মহা-সুন্দর ভাব কল্পনায় আমাদের মনে আবির্ভূত হইয়াছে; সেই জন্য তখন এই উভয় ভাবের সম্মিলনে সর্ব্বসুন্দর সর্ব্বপরিতৃপ্তিকর মানসদেবের আরাধনায় সাকারে নিরাকার পূজার জন্য মনপ্রাণ ব্যগ্র আকুল হইয়া উঠে। সে রমণীই ধন্য—যে তাহার মনোদেবতার সন্ধান পাইয়া এই পরিপূর্ণ উথলিত আবেগময় প্রাণের পূজায় জীবন সার্থক করিতে পারে; আর সেই পুরুষই ধন্য, যে এই পূজারতা হৃদয়ের দেবতারূপে বরিত হইয়া তাহার পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে, আর সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম, যাহা এই উভয়ের আত্মহারা পূজায় অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবলভাবে চিরবিরাজমান।

আমি পিতাকে এখন খুব ভালবাসি, তাঁহার সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত নহি —কিন্তু তিনি এখন আর আমার জীবনের একমাত্র সুখদুঃখ আশ্রয় অবলম্বন, আকাঙ্ক্ষা কামনা পূজা আরাধনা, দেবতাসর্ব্বস্ব নহেন। অধিক দিন তাঁহাতে উক্ত সর্ব্বেসর্ব্বা প্রেমভাব স্থায়ী হয় নাই। এইখানেই প্রণয়ের সহিত ইহার মূলগত পার্থক্য। যৌবনের বহুপূর্ব্বে শৈশবের বাবার এ ভালবাসার ভাগীদার জুটিয়াছিল।

এতক্ষণ বলি নাই, আমাদের বাড়ী কোথায়। কথাটা না পাড়িয়া চলিলে বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ঢাকা জেলার লোক, বাবার জমীদারী সম্পত্তি কিছু আছে, কিন্তু প্রধান আয় চাকরীতে, তিনি এক জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। যত দিন বাড়ী বসিয়া কাজ পাইয়াছিলেন, তত দিন সকল বিষয়ে আমাদের বেশ সুবিধা ছিল। কিন্তু আমার

বয়স যখন আট নয়, তখন এক সবডিবিসনে তাঁহার বদলী হইল। পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, বিত্তাশিক্ষার জন্ত দিদি পিসীমার কাছে কলিকাতায় থাকিতেন। আমি কিন্তু কখনও বাবাকে ছাড়িয়া থাকি নাই, এখনও থাকিতে পারিব না জানিয়া জ্যেঠাইমাকে ও আমাকে সঙ্গে লইয়া বাবা কর্ম্মস্থলে আসিলেন। এখানে সরকারী স্কুল বা বালিকা-বিত্তালয় কিছুই ছিল না, জমীদার কৃষ্ণমোহন বাবুর বাড়ীতে তাঁহার বাড়ীর ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্ত একটা স্কুল বসিত, পাড়ার শিশুগণও অনেকেই এখানে পড়িতে আসিত, আমিও আসিতাম। কলিকাতায় এরূপ প্রথা আছে কি না, জানি না; পাড়াগাঁয়ের অনেক স্থলেই এক পাঠশালায় শিশু বালক বালিকাগণ একত্রে পড়ে। সেখানে সকলেরই সঙ্গে আমার খুব ভাব হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে ছোটুর সহিত। ইহার আসল নাম কি, জানি না, বাড়ীর মধ্যে ছোট বলিয়াই বোধ হয় সকলে ইহাকে ছোটু ছোটু করিয়া ডাকিত। তখন ভাবিতাম, ইহাই তাহার একমাত্র নাম। ছোটু কৃষ্ণমোহন বাবুর ভাগিনেয়; বাবা না থাকায় মামার বাড়ী প্রতিপালিত। ছোটুর সহিত বেশী ভাব হইবার প্রধান কারণ,সে স্কুলে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, বোধ হয়, বার তের হইবে। বাল্যকালে বয়স্ত-বয়স্তাদিগের অপেক্ষা বয়োধিকদিগের সহিত কিরূপ আকর্ষণ, তাহার অভিজ্ঞতা বোধ হয় অনেকেরই আছে; দ্বিতীয়তঃ ইনি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রধান পড়ো, নিম্নক্লাশের ছাত্র ছাত্রীগণের পড়া দেখিবার ভার ইঁহার উপর সমর্পণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় নিজের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব করিতেছেন। স্কুল বসিত কৃষ্ণমোহন বাবুর বাহিরের একখানা আটচালা ঘরে প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটার সময়, আর ভাঙ্গিত সাড়ে দশটায়। কিন্তু আমরা সকলে সাড়ে ছটার মধ্যে স্কুলে গিয়া হাজির হইতাম। আর এমন এক দিনও যায় নাই যে, আমরা গিয়া ছোটুকে বেঞ্চের উপর বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। পণ্ডিত মহাশয় আসিতেন সাড়ে সাতটায়, কোন দিন বা আটটায়, ততক্ষণ ছোটু আমাদিগকে পড়া বলিয়া দিত, কপি-বুকে অক্ষর লিখিয়া দিত, পকেট হইতে মুড়ি-মুড়কি বিতরণ করিত, বোধ করি, ইহা তাহার প্রাতরাশের অবশিষ্ট, আর বাকী সময় বই হাতে করিয়া মনে মনে নিজের পড়া মুখস্থ করিত ও মুখে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিত; এই তাহার এক বিশেষ অভ্যাস ছিল। আমরা কোন কোন সময়ে যদি ধরিয়া পড়িতাম, কি গাহিতেছ, স্পষ্ট করিয়া গাও, তা কখনও গাহিত না। এক দিন কেবল আমরা তাহার গানের দু'এক লাইন স্পষ্ট শুনিয়াছিলাম। আটচালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছি, তাহার গুণগুণানি একটু স্পষ্টতর ভাবে কানে গেল। প্রভা বলিল—তাহার সকলের চেয়ে দুষ্টবুদ্ধি বেশী যোগাইত,"ছোটু গান করছে,এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি, তা'পর শিখে গিয়ে বলব, কেমন শুনে নিয়েছি।" দু'এক দিন আগে কৃষ্ণমোহন বাবুর ছেলের পৈতে উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে কলিকাতার নাচ আসিয়াছিল। আমরা থিয়েটারকে নাচ বলিতাম। আমরাও দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু কি যে দেখিয়াছিলাম, কি যে অভিনয় হইয়াছিল, তাহা যদিও জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব না। আমি সমস্ত ক্ষণই প্রায় জ্যেঠাইমার কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইয়াছিলাম। একবার কেবল একটা ভয়ঙ্কর চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখি, জরীর পোষাক পরা এক জন রাজার ছেলে ভারী রাগিয়া গেছে, রাগিয়া জোরে জোরে তক্তার উপর লাথি মারিতেছে আর তরবারি উঠাইয়া চীৎকার করিতেছে। দেখিয়া ভারী ভয় হইল, তাহার পর আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। আর একবার জ্যেঠাইমা আমাকে জাগাইয়া দিয়াছিলেন; সে বার দেখিলাম, কতকগুলি পরী শূন্তে ঝুলিতেছে। সে দৃশ্যটি বড় ভাল লাগিয়াছিল। সেই থিয়েটারেই বুঝি ছোটু গান শিখিয়া থাকিবে, সে গাহিতেছিল—

"হায় ! মিলন হোলো,
যখন নিভিল চাঁদ, বসন্ত গেলো !
হাতে ক'রে মালাগাছি, সারাবেলা ব'সে আছি
কখন্ ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো—"

এইটুকু শুনিয়াই আমরা হাসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। পরে এমন আপশোষ হইয়াছে—কেন গানটি শেষ পর্য্যন্ত শুনি নাই। অনেক উপন্তাস প্রহসন গীতিনাট্যে গানটি খুঁজিয়াছি, কিন্তু পাই নাই। আমরা ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিলাম, "কেমন তোমার গান শুনে ফেলেছি," ছোটু ভারী লজ্জিত হইল। গানটির সেই ক'লাইন একবার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কখনও আর ভুলি নাই, আর

পরের ভাল করিয়া মুখস্থ করা গানও কত ভুলিয়াছি, তাহার ঠিক নাই।

আগেই বলিয়াছি, ছোটু আমাদিগকে মুড়ি-মুড়কি দিত। মুড়িমুড়কি বাড়ীতে যে আমাদের কাছারো দুষ্প্রাপ্য ছিল, তাহা নহে, কিন্তু হরির লুটের বাতাসার মত তাহার হাত হইতে মুড়িমুড়কি পাইতে আমাদের ভারী আমোদ হইত।

কথা ছিল, দুষ্টামি না করিলে, ভাল করিয়া পড়া বলিতে পারিলে ছোটু মুড়িমুড়কি দিবে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ভিন্নরূপ হইয়া পড়িয়াছিল, দুষ্টামি করিলে ছোটু যদি বকিত, আমার চোখও অমনি জলে ভরিয়া উঠিত, হাসিখুসি খেলাধূলা সমস্ত বন্ধ হইয়া পড়িত, ছোটু তখন আদর করিয়া আমাকে চের বেশী করিয়া মুড়িমুড়কি দিত। এই আদরের লোভে অথবা বেশী মুড়িমুড়কির লোভে জানি না আমার দুষ্টামিটা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পড়া জানিলেও অনেক সময় ভুল উত্তর দিতাম—লেখা দেখিতে আসিলে কালীর কৌটা হাতে ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া কুটি-কুটি হইতাম, বোর্ডে আঁক কষিয়া শিখাইতে গেলে খড়িমাটী মুছিয়া তাহার মাথায় ঘষিয়া দিয়া দূরে পালাইতাম, ইহাতে যদি সে রাগ করিত ত কাঁদিতে বসিতাম,—আর রাগ না করিয়া সেও যদি হাসিয়া খেলায় যোগ দিত—ভুল পড়া বলিলে যদি হাসিয়া বলিত—চালাকি করা হচ্ছে,—হাতে কালী দিলে হাসিমুখে যদি কলমটা লইয়া আমাকে ফোঁটা পরাইয়া দিত, কিংবা আমার কপি-বুকে নাম লিখিতে বসিত, খড়িমাটী চিত্রিত হইলে ফুল ছিঁড়িয়া যদি আমাদের মাথায় বর্ষণ করিত, তাহা হইলে আমার আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না। তাহার এরূপ খেলার ভাব দেখিলে সে দিন কেবল একা আমি কেন—আমরা স্কুলের যত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সকলে মিলিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতাম।

বাবা আর একলাই বাগানের ভাল ভাল ফুল পাইতেন না, ছোটুর মুড়িমুড়কির বদলে তাহাকে আমি রোজ ফুল আনিয়া দিতাম। কাহাকে ফুল দিতে বেশী ভাল লাগিত—বাবাকে বা তাহাকে, আর কাহার সঙ্গই বা বেশী ভাল লাগিত—বাবার বা তাহার, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। কোন একটি ভাল ফুল দেখিলে একবার মনে হইত, বাবাকে দিই, একবার মনে হইত, তাহার জন্ত লইয়া যাই; যে দিন দেখিতাম, বাবা উঠিয়াছেন, সে দিন ফুলটি তাঁহাকেই দিতাম, আর যে দিন দেখিতাম, তিনি উঠেন নাই, সে দিন ছোটুর জন্ত লইয়া যাইতাম। সকালে যেমন ছোটুর কাছে যাইতে ব্যগ্র হইতাম, সন্ধ্যাবেলা তেমনি আগ্রহে বাবার জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম; যাহার কাছে যখন থাকিতাম, তাহাকেই তখন বেশী ভালবাসি বলিয়া মনে হইত। ছোটুর কাছ হইতে বাবার কাছে আসিয়া প্রায়ই তাঁহাকে বলিতাম—"বাবা, তোমাকে খুব ভালবাসি।" বাবা যেন সন্দেহ করিয়াছেন।

তিনি বলিতেন, "সত্যি ?"

আমি বলিতাম—"হ্যাঁ, সত্যি বলছি।"

বাবা হাসিয়া চুম্বন করিতেন; আমিও করিতাম —ভাবিতাম, ছোটু ত আমাকে চুম্বন করে না; তবে বাবার মত আমাকে ভালবাসে না, আমি কেন তবে ভালবাসিব? কে বলে ভালবাসা ভালবাসার প্রত্যাশা করে না? ছেলেবেলাও এই যে ভাব, ইহা ত আমাকে কেহ শিখায় নাই!

দুই বৎসর আমরা একত্র পড়িয়াছিলাম, তাহার পর অনেক চেষ্টা-যত্ন করিয়া নিজ ঢাকাতেই বাবা বদলী হইলেন। এই সময় দিদির বিবাহ হইল। সেই দুই বৎসরের প্রতি প্রাতঃকাল কিরূপ আনন্দে কাটিয়াছিল, মনে করিতে হৃদয় এখনো আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর আট দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাহার পর আমি ভালও বাসিয়াছি, শৈশবের স্নিগ্ধ কোমল ভালবাসা নহে, যাহাকে লোক বলে প্রেম—যৌবনের সেই জলন্ত অনুরাগ—তাহা-রও অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, জীবনে কত বড় বড় আশা ভাঙ্গিয়াছে, গড়িয়াছে, কত প্রবল আনন্দ নিরানন্দ জীবনের গ্রন্থিগুলি যেন দলিয়া পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু শৈশবের সেই অপরিণত ক্ষুদ্র প্রেমে কি ইহা অপেক্ষাও কম সুখ, কম নিঃস্বার্থ ভাব ছিল? তখনকার সেই ছোট-খাট সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার প্রতি আমার মমতা আকর্ষণ কি এখনো কিছু কম! তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবে কি—কে জানে কি! তোমরা শুনিলে হয় ত বুঝিতে পারিবে, কি। আমার নিজের নিকট ত নিজের জীবন প্রকাণ্ড একটা প্রহেলিকা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

"তাহাকে" প্রথম দেখি দিদির বাড়ী—টেনিশ পার্টিতে। ভগিনীপতি বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার, ইংরাজীয়ানা চালে চলেন; টেনিস খেলা উপলক্ষে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার বাড়ীতে ছোটখাট একটি স্ত্রী-পুরুষসম্মিলনী হইয়া থাকে। "তিনিও" বিলাত-ফেরত; ভগিনীপতির সহিত একটু কি রকম সম্পর্ক আছে, ভগিনীপতির ভগিনীপতির দূরসম্পর্কীয় ভাই, কি এই রকম একটা কিছু।

প্রথম দর্শনেই কি আমি প্রাণসমর্পণ করিয়া-ছিলাম? মোটেই নহে; আমি উপন্যাস লিখিতেছি না। বরঞ্চ বিপরীত আলাপ হইবামাত্র একটু পরে তিনি একটু টেপা হাসি হাসিয়া দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—যদিও জনান্তিকে—"এমন মণিকে আপনি এত দিন খনির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন?" আমার নাম মৃণালিনী, আমাকে সকলে মণি বলিয়া ডাকে। কথাটা আমি শুনিতে পাইলাম এবং এই প্রশংসার মধ্য হইতে কেমন একটা বেতর বেসুরো স্বর খট করিয়া কানে বাজিল। ভগিনীপতি আবার ইহার পর ঠাট্টা করিয়া প্রকাশ্যেই বলিলেন—

Full many a gem of parest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air.

দিদির ননদাই সংস্কৃতে এম, এ দিয়াছেন, তিনিই বা বিদ্যা ফলাইবার এমন সুযোগ ছাড়িবেন কেন? তিনিও গোঁপে তা দিতে দিতে বলিলেন—"ন রত্ন-মন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ—রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না, তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়।"

সকলের মুখেই বেশ একটু হাসি ফুটিল; এইরূপে হাস্যাস্পদ হইয়া ইহার কারণকে যে আমি বিশেষ প্রীতির নজরে দেখিয়াছিলাম, এমনটা ঠিক বলিতে পারিতেছি না—কিন্তু এ ঘটনা হয় টেনিস খেলার আগে,—খেলার পরে একটু অবস্থান্তর ঘটিল। উদ্যান হইতে সকলে গৃহে সম্মিলিত হইলে তিনি গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথমে গাহিলেন ইংরাজী গান; দিদির তাহাতে মন উঠিল না, দিদি ধরিয়া পড়িলেন—"বাঙ্গালা গান গাহন";—অনেক আপত্তি প্রকাশ করিয়া, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে নাচারে পড়িয়া তিনি বাঙ্গালা গানই আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ যে ছেলেবেলায় ছোটুর সেই গান।

হায় মিলন হোলো—
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো।

কেবল ছোটুর অস্পষ্ট গুণগুণানি নহে। দিদি তাহার গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাইতেছিলেন, পিয়ানোর তানে লয়ে তাঁহার পূর্ণ কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া গৃহে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল; আমি ত মুগ্ধ অভিভূত হইয়া শুনিতে লাগিলাম। পিপাসিত ব্যক্তির জলপানের ন্যায় গানের প্রতি শব্দ ছত্র সোৎসুকে গ্রাস করিতে করিতে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা যতই সামান্য হউক, যদি মর্ম্মান্তিক হয়, তবে বুঝি তাহা সহজে পূর্ণ হয় না, ইহাই বুঝি সংসারের অব্যর্থ নিয়ম। দুই লাইন শেষ হইতে না হইতে মিষ্টার কর সস্ত্রীক সপুত্রিক গৃহে প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনা-সমাদরের সাধারণ একটা হিল্লোল-প্রবাহের মধ্যে গান-বাজনা থামিয়া গেল, গায়ক বাদক উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহা-দিগকে অভিবাদন সম্ভাষণ করিলেন। স্বাগতগণ তাঁহাদের পালায় আবার সকলের সহিত যথাবিহিত ভদ্রতানুষ্ঠান শেষ করিবার পর যদিও সেই অসমাপ্ত গীত-বাদ্যের পুনরারম্ভ প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু গায়ক আর তাহাতে সম্মত হইলেন না। মিস কর এক জন সুগায়িকা, তিনি তাঁহাকেই গাহিতে অনুরোধ করি-লেন। কেবল আমার ছাড়া গৃহশুদ্ধ অন্য সকলেরই সেইরূপ ইচ্ছা,—অতএব কুসুম তাঁহার সুলোভন শীলতাপূর্ণ আপত্তি প্রকাশের সুখভোগ পর্য্যন্ত কাল-ব্যয় করিতে অবসর না পাইয়া তখনই পিয়ানোর কাছে আসিয়া বসিতে বাধ্য হইলেন। আবার গান-বাজনায় গৃহ গম-গম করিয়া উঠিল; কুসুমের সুকণ্ঠ সুতানে মুগ্ধ হইয়া শ্রোতৃগণ অবিরাম একটি গানের পর আর একটির ফরমাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার কর্ণে তাহার কোনটিই প্রবেশ করে নাই, আমার মাথায় সেই একই গান একই সুরে কেবল ঘুরিতেছিল।

হায়! মিলন হলো!
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো!

গানবাদ্য গল্পগুজবের পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে

নিমন্ত্রিতগণ যখন বাড়ী চলিয়া গেলেন, গৃহ নিস্তব্ধ নির্জ্জন হইয়া পড়িল—তখনও আমার কানে সেই গান বাজিতে লাগিল। রাতে ঘুমাইয়াও তাহা স্বপ্নে দেখিলাম। ছেলেবেলার সেই আটচালা ঘর, তাহাতে দিদির এই ড্রয়িংরুম—সমারোহে—ছোটু গাহিতেছে—তাহার গুণগুণানি সুরে নহে—সুস্বরে সুতানে পূর্ণ কণ্ঠে গাহিতেছে—আমার দিকে প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া গাহিতেছে—

সেই মিলন হোলো—
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো।

সেই মধুময় গীতধারায়, সেই প্রেমময় দৃষ্টি-প্রবাহে আমার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যুৎকম্পিত হইয়া উঠিল আর ঘুম ভাঙিয়া গেল—দেখিলাম, ভোর হইয়াছে।

বড় আশা ছিল, দ্বিতীয় হপ্তায় টেনিস পার্টির দিনে গানটি শুনিব, কিন্তু তিনি আর সে দিন আসিলেন না। রাত্রিকালে ডিনার টেবিলে আমি বলিলাম—"মিষ্টার ঘোষ যে আজ এলেন না?"

দিদি বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিও ঐ ভাবছিলুম—তিনি যে আজ এলেন না?"

ভগিনীপতি ঠাট্টার সুরে বলিলেন, "তাই ত, রমানাথ কি জানে, এ দিকে এমন প্রলয় উপস্থিত, তা হ'লে অবশ্যই আসত– তা ডাকব নাকি?"

ঠাট্টা আমাকে স্পর্শ করিল না, আমি সত্যই গায়কের প্রতি আকৃষ্ট হই নাই, আমার অনুরাগ গানের প্রতি; অতএব আমি তাঁহার ঠাট্টার না দমিয়া বেশ সহজ ভাবেই বলিলাম, "ডাক না, তিনি বেশ গাইতে পারেন—আর এক দিন শুন্‌তে ইচ্ছা আছে।"

আমার মনে কোন লুকান অভিপ্রায় ছিল না—কিন্তু তাঁহাদের মনে ছিল। তখন যদিও তাহা বুঝি নাই, পরে বুঝিয়াছি।—সুতরাং আমার কথাটা তাঁহারা লুফিয়া লইলেন। দিদি বলিলেন, "রমানাথ অনেকদিন 'কল' করেছেন, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত তাঁকে ডিনারে বলা হোল না, এক দিন খেতে নিমন্ত্রণ করা যাক।" ভগিনীপতি বলিলেন, "তথাস্তু! তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা। যে দিন ইচ্ছা বলিয়া পাঠাও।"

ডিনারের দিন তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমটা যেন একটু নিরাশ হইয়া পড়িলাম,—পূর্ব্বে একদিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি—একদিনেই যে তাঁহার মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, এমন নহে, বরঞ্চ ১০।১২ দিন চেহারাটা একদূর ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, তাঁহাকে মনে করিতে সেই স্বপ্নের চেহারাই মনে পড়িতেছিল, তাই চাক্ষুষ প্রভেদ প্রত্যক্ষ করিবামাত্র একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম। আমার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ যে দেবতার ন্যায় সুপুরুষ, এমন বলিতেছি না—সত্য কথা বলিতে সে মুখও আমার তেমন সুস্পষ্ট মনে ছিল না, মনে ছিল কেবল স্বপ্নের সেই দৃষ্টি।—আর এখন যাহাকে দেখিলাম, তিনি কিছু মন্দ দেখিতে না, দিব্যি নাক-মুখ, বেশ পরিপাটী করিয়া বড় কপালে চুল ফেরান, ঘন গোঁপের বেশ বঙ্কিম বাহার, সবশুদ্ধ বেশ ভালই দেখিতে। যদিও গোঁপের এ বাহার প্রথমে চোখে লাগে নাই– ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম—প্রথমে বরঞ্চ একটু বেশী ঘন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু আমার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের মত তাঁহার নয়নে সেই প্রাণস্পর্শী পরিপূর্ণ সরল—অথচ প্রেমময় দৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিলাম না; তাহার সন্ধান করিতে গিয়াই নিরাশ হইয়া পড়িলাম। কথাবার্ত্তাতে মাঝে কেমন একটু খট্‌কা লাগিতে লাগিল। তাঁহার টানাবোনা রসিকতা এক একবার যেন ভদ্রতার সীমানা ছাড়াইয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছিল।—অথচ স্পষ্ট করিয়া একরূপ মনে করিতেও ভরসা হইতেছিল না। ইংলণ্ডে best manners যিনি শিখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সুরুচি বা ভদ্রতার অভাব সম্ভবে? আমারি অমার্জ্জিত অশিক্ষিত রুচিবশতঃ তাহা ঠিক উপলব্ধি করিতেছি না।

তিনি আসিতেই দিদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যে বৃহস্পতিবারে এলেন না? আমরা শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভাবছিলুম, আপনি আস্‌বেন।"

তিনি বলিলেন, "মিষ্টার করের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। I refused them so many times before, that I had not the heart to do so again, so sorry—but did you really expect me? If I had only known it, I would have sacrificed a thousand—"

ভগিনীপতি বলিয়া উঠিলেন—I say R don't be so very eloquent it might make me jealous you know—"

তিনি বলিলেন, "সে দিন ডিনারের পর আপনাদের কি গান হ'ল? মিস্ রায় কি সুন্দর গাইতে পারেন?"

মিষ্টার ঘোষ একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, এইরূপ শোনা যায় বটে—অন্ততঃ তাঁহাদের ত রূপ বিশ্বাস। What a lovely colour! It suits the complexion beautifully."

আমার সাড়ীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ কথাটা বলা হইল। ডিনার-টেবিলে অবশ্য আমি তাঁহার পাশে বসিয়াছিলাম, কিন্তু মনে রাখিবার মত এমন কিছু বিশেষ কথা হয় নাই। ভগিনীপতিতে তাঁহাতে বেশী সময় পলিটিক্‌স লইয়াই তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল, মাঝে মাঝে আমার সহিত যা কথাবার্ত্তা, অধিকাংশই তাহা প্রশ্নোত্তর। আমি গাহিতে পারি কি না, কবিতা পড়ি কি না—কাহার কবিতা আমি বেশী ভালবাসি, কত দিন এখানে থাকিব, ইত্যাদি। আমি নিজে হইতে কথা কহিবার মধ্যে তাঁহার গানের প্রশংসা করিয়াছিলাম, আন্তরিক প্রশংসা, ইংরাজী কম্‌প্লিমেণ্ট নহে। বোধ করি, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা গান আমি বেশী জানি না, এবার দেখছি শিখতে হবে।"

তাঁহার সমস্ত কথার মধ্যে এই কথাটি আমার ভাল লাগিয়াছিল; মনে হইল, তিনি হৃদয়ের সহিত বলিতেছেন। খাবার পর আবার তিনি সেই গানটি গাহিলেন—

হায়! মিলন হোলো!
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো।
হাতে ক'রে মালাগাছি, সারা বেলা ব'সে আছি
কখন্ ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো,—
আসিবে সে বর-বেশে, মালা পরাইব হেসে,
বাজিবে সাহানা তানে বাঁশী রসালো!—
আসিল সাধের নিশা, তবু পূরিল না তৃষা—
কেমন কি ঘুমে আঁখি জড়িয়ে এল—
হায় মলিন হোল!

গানটি এইখানে শেষ হইল, তিনি থামিলেন, কিন্তু মনে হইল, এখনো যেন অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত রহিয়া গেল, কি যেন আরো বলায় ছিল, বলা হইল না; শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম, অথচ পরিতৃপ্ত হইলাম না! তিনি গান শেষ করিয়া নিকটে আসিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—"I wish I was a painter to paint you like this" তখন পূর্ব্বের মত আমার বিরক্তি বোধ হইল না—মনে হইল, তিনি যেন আর আমার অপরিচিত নহেন। সে সময় স্বপ্নের মূর্ত্তিতে তাঁহার মূর্ত্তিতে মিশ্রিত হইয়া আমি দেখিতেছিলাম—তাঁহাকে না কাহাকে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেশমেরাইজ করিলে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। আমি যেন সেইরূপ মন্ত্রপূত হইয়া পড়িলাম। তিনি যখন আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, তাঁহাকে যখন প্রথম দেখিতাম, তখন আমার বেশ সহজ অবস্থা, অন্য এক জন সাধারণ আলাপীর সহিত দেখা-শুনা কথাবার্ত্তায় যতটুকু আনন্দ, তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাতেও তদপেক্ষা অধিক কিছুই নহে। কিন্তু গানটি গাহিলেই সমস্ত বিপর্য্যয় হইয়া পড়িত। অন্ত সময় এমন কতবার পণ করিয়াছি—সে গান আর শোনা হইবে না, তাঁহাকে আর গাহিতে বলিব না, সময়কালে সে সঙ্কল্প কিছুতেই বাঁধিয়া রা পারিতাম না শুষ্ক পত্রের মত যেন আপনা ছুটিয়া আসিয়া পড়িত! গানটির কি যে মোহ জানি না, শুনিতে শুনিতে বাল্যের স্মৃতিধারা প্রবাহে উথলিয়া কুমারী-হৃদয়ের অতৃপ্ত যে কাঙ্ক্ষাকে স্ফীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। ধ্বনি সুরে তানে উঠিয়া পড়িয়া যতই মধুরতা করিত, ততই সে আকাঙ্ক্ষা তীব্র আকুলতর প্রবল স্রোতোচ্ছ্বাসে তাহার চিরপরিচিত অথচ নূতন কে জানে কোন্ অজানা প্রেমময় দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইত—তাহাতে বিলীন করিতে চাহিত। এই সুমধুর সুখে তীব্র অতৃপ্তির আতিশয্যে ক্রমশঃ যেন আপ হারাইয়া ফেলিতাম, সেই অপরিচিত মধুর সম্ভাষণে মুগ্ধ স্মৃতি দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া ক্রমে আবার মনে নয়নে পরিচিত মূর্ত্তিতে বিভাসিত হইয়া উঠিতেন; সুকলে-

অতীতে বর্ত্তমানে, স্মৃতি বাসনায় তখন একাকার হইয়া পড়িত—আমি জাগিয়া যেন স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতাম।

তিনি চলিয়া যাইবার পরেও সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কেমন মেঘাচ্ছন্ন থাকিতাম—স্বপ্নে জাগরণে ঐ একইরূপ ভাব আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিত; পরদিন নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে সে ভাব অল্পে অল্পে দূর হইয়া যাইত। তিন চারিদিন পরে, কখনও সপ্তাহ পরে আবার তিনি যখন আসিতেন, তখন আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ,—তখন আর সে ভাবের চিহ্নমাত্র নাই; তাঁহাকে দেখিলে পূর্ব্বভাবের স্মৃতিতে এমন লজ্জাবোধ হইত। কিন্তু আবার গান আরম্ভ করিলেই যে কে সেই। এ কি অপরূপ রহস্য, জানি না, সূর্য্যের উদয়াস্তে পৃথিবী যেমন দ্বিমূর্ত্তি ধারণ করে, উক্ত ভাবের উদয়াস্তে আমি সেইরূপ দুই আমি হইয়া পড়িতাম।

ক্রমশঃ আমার এই মন্ত্রপূত ভাব স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অর্থাৎ সময়ে অসময়ে সকল সময়েই আমার তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল; এইরূপ হইবার নূতন কারণ ঘটিল এই, চারিদিক হইতেই আমি শুনিতে লাগিলাম, বুঝিতে লাগিলাম, তিনি আমার স্বামী হইবেন, কোন বঙ্গবালার মনে এই বিশ্বাসের কিরূপ প্রবল প্রভাব, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক আছে কি? স্বামী যেমনই হৌন, তিনি রমণীর একমাত্র পূজ্য আরাধ্য দেবতা, প্রাণের প্রিয়তম, জীবনের সর্ব্বস্ব এই বাক্য, এই ভাব, এই সংস্কার আজন্মকাল হইতে আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে, সুতরাং বিশেষ কারণে স্পষ্ট বীতরাগ না থাকিলে এই বিশ্বাসই প্রেমাঙ্কুরিত করিবার যথেষ্ট কারণ।

কিছুদিন হইতে আমরা যেখানে যাই, কেবল ঐ কথা, যিনি আসেন, কেবল ঐ কথা। বয়স্যারা ঠাট্টাচ্ছলে আমার কাছে গোপনে ঐ প্রসঙ্গ তোলেন, বয়োজ্যেষ্ঠারা গম্ভীরভাবে দিদির কাছে আমার সাক্ষাতেই প্রকাশ্যে ঐ আলোচনা করেন, আর দিদি, ভগিনীপতি ত সুবিধা পাইলে যখন তখন ঐ কথা তুলিয়া, কখনো ঠাট্টা করিয়া, কখনো গম্ভীরভাবে আমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য-কল্পনায় আনন্দ প্রকাশ করেন। এ কল্পনা যে কখনো সত্যে পরিণত না হইয়া কল্পনাতেই অবসিত হইতে পারে, এ কথা কিন্তু কখনো তাঁহাদের মনে উদয় হয় না। কেনই বা হইবে? যাঁহাকে লইয়া এত কথা, এত আলোচনা, তিনি দিন দিন এই বিশ্বাস আমাদের মনে গভীররূপে বদ্ধমূল করিতেছেন, তাঁহার যাতায়াতও বাড়িতেছে, এবং কথাচ্ছলে, ভাবে-ভঙ্গীতে তাঁহার অনুরাগও দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, এখনো যে কেবল সুস্পষ্ট বাক্যে তিনি বিবাহ-প্রস্তাব করিতেছেন না, সে যেন শুধু আমাদের মনোগত অভিপ্রায় আরো স্পষ্টরূপে বুঝিবার অপেক্ষায়।

রমণী-হৃদয়ে প্রীতিতে যেমন প্রীতির উদ্রেক করে, এমন কি, অন্য কোন গুণে যদি হৃদয় অনুপূর্ব্ব না থাকে বা কোন কারণে কেহ নিতান্ত বিদ্বেষভাজন না হয়,—তাহা হইলে সে আমাকে প্রাণপণে ভালবাসে—এইরূপ বিশ্বাসস্থলে যদি প্রকৃত প্রেম দিবারও ক্ষমতা না থাকে, অন্ততঃ গভীর করুণাও তাহার স্থানাভিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রেমমূর্ত্তি ধারণ করে। আত্মদানে অন্যকে সুখী করিব নারী-প্রকৃতির এই যে সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছাপ্রবণতা, নারীপ্রেমের শিরায় মজ্জায় যে আকাঙ্ক্ষা শোণিতাকারে প্রবাহিত বর্ত্তমান, তাহার সফলতাতেই, তাহার বিশ্বাসেই রমণী-হৃদয় পরিপূর্ণ, বিকসিত, জীবনজন্ম সার্থক, চরিতার্থ; আবার এ বিশ্বাসেই সে ভ্রান্ত, কলঙ্কিত, মহাপাপী। প্রেমময়ী রমণী ইহার জন্য কতদূর আত্মত্যাগ করিতেছে: আর কতদূর না করিতে পারে?

তাঁহার প্রীতিময় ব্যবহারে, রূপে-গুণে আমার নয়নে তিনি সর্ব্বসুন্দর হইয়া উঠিলেন; আপনাকে এই সর্ব্বগুণধর সুপুরুষের সুখের কারণ ভাবিয়া আমি অতি উপাদেয় গর্ব্বময় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে লাগিলাম। বেশী দিন এরূপে দিন কাটিল না, ভাবে-ভঙ্গিতেই তাঁহার অনুরাগ আবদ্ধ রহিল না, এক দিন তিনি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। সেই প্রার্থিত প্রত্যাশিত দিন আসিল—কিন্তু?

বিকাল বেলা বাগানে ফুল তুলিতেছিলাম। বৃষ্টির পর চারিদিক সুন্দর সুদৃশ্য নবীন হইয়া উঠিয়াছে, আকাশের লাল আলো তরল মেঘের উপর, গাছ পাতা ফুলের কোমলতার উপর অতি মধুর উজ্জলতা বিস্তার করিয়াছে। আমি একটি গোলাপ

বোঁটাশুদ্ধ ছিঁড়িতে চেষ্টা করিয়াও ছিঁড়িতে পারিতেছিলাম না, সহসা হাত বোঁটাতেই রহিয়া গেল, কম্পাউণ্ডে গাড়ী-জুড়ি প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাতেই নয়ন আকৃষ্ট, আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া আমাকে বাগানে দেখিয়া নিকটে আসিলেন, গোলাপটি ছিঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, "কাহার জন্য ফুল তুলিতেছেন।" আমিও ফুল তুলিতে তুলিতে ভাবিতেছিলাম,—তখন ছোটুকে কেমন অসঙ্কোচে ফুল দিতাম, আর ইঁহাকে দিতে ইচ্ছা করিলেও কেন পারি না।" তাঁহার জিজ্ঞাসায় উত্তর করিলাম—"দিদির জন্য।"

একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইলাম। আর একটি সুন্দর গোলাপ ছিঁড়িয়া তিনি আমার হাতে দিতে দিতে আস্তে আস্তে আওড়াইলেন :

"A lamp is lit in eyean'
That souls, else lost on earth,
remember angels by."

তখন আমি লজ্জিতভাবে বলিলাম, -"ঘরে চলুন।"

তিনি বলিলেন, "চলুন না, আপনি গেলেই যাই; মনে আছে, আজ আপনি আগে গাইবেন বলেছেন?"

আমরা উপরে উঠিলাম, তখনো ভগিনীপতি বাড়ী ফেরেন নাই, দিদিও এদিকে আসেন নাই, আমি চাকরকে বলিলাম—"দিদিকে খবর দাও", বলিয়া তাঁহার সহিত ড্রইংরুমে বসিলাম! তিনি বলিলেন,—"আপনি পিয়ানোর কাছে বসুন, 'এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী' এই গানটি গান—"

আমি বলিলাম, "সে রাত্রের গান কি বিকালে গাওয়া যায়?" তিনি বলিলেন—"তবে যা ইচ্ছা গান– sing sweet bird b·auty sing—জানেন ত কবিতাটি—

To me there is but one place,
in the world
And that, where thou art; for
wherever I be
Thy love doth seek its way
into my heart,
As will a bird in to her secret nest,
Then sit and sing, sweet bird
of beauty sing."

আমি বলিলাম, "আপনি সেই গানটি গান, আমার ভারি শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

তিনি এ কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন— "সেলির একটি কবিতা আমার বড় সুন্দর লাগে, আপনি অবশ্য পড়েছেন?"

We—are we not med as notemes of
music are,
For one another though dissimillar,
Such difference without discord
as can make,
Those sweetest sounds in which
all spirits shake,
As trembling leaves in a
continuous air."

আমি কোন উত্তর করিলাম না, তিনি একটু পরে আবার বলিলেন,—"আগে ভাবতুম, ভাল কবিতা যাকে বলা যায়, more or less, সে সবই ফাঁকা—মিথ্যা, তার মধ্যে সত্য কিছু নেই, কেবল বাজে কল্পনা, এখন দেখছি ভুল। আপনার কি মনে হয়?"

আমি বলিলাম—'আমি অমন ক'রে ভেবে দেখি নি—পড়ি ভাল লাগে, শুধু এই জানি।

তিনি বলিলেন, "কিন্তু সত্য ব'লে না মনে হলে তার কি প্রকৃত রসটুকু উপভোগ করা যায়? আমি আগে নভেলে first sight এ love যেখানে পড়তুম, এমন খারাপ লাগতো—কেন না, তা নিতান্তই মিথ্যা অসম্ভব ব'লে মনে হোত, এখন দেখছি,

There are more things in heaven
and earth Horatio,
Than are dreamt of in your
philosophy,—

কে জানত ঐ মিথ্যা আমার জীবনের পক্ষে এক দিন পূর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়াবে?"

বলিয়া বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"To see her is to love her,
And love but her for ever.
For nature made her what she is.
And never made another.

আরো কি স্পষ্ট ক'রে বলবার আবশ্যক আছে?

To see you is to love you
And love but you for ever."

ভগিনীপতি এই সময় গৃহে আসায় তিনি হঠাৎ এইখানেই থামিয়া পড়িলেন।

ভগিনীপতি বলিলেন,"হ্যালো, কতক্ষণ, finishing stroke oh! Final proposal in

poetry is [illegible], Hurrah! Let me congratulate you both!"

তিনি যেন একটু সলজ্জভাবে গোঁপ ফিরাইয়া বলিলেন,—"I say you are very late in returning to-day. We were whiling away our time as best we could. By the bye did you win that murder case of yours? Have you got poor fellow off?"

ব্যারিষ্টারদিগের নিকট তাঁহাদিগের মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় গল্পের মত প্রীতিজনক গল্প আর নাই, উপস্থিত প্রশ্নে ভগিনীপতি পূর্ব্ববর্ত্তী কথা ভুলিয়া গেলেন। ঐ প্রসঙ্গে উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল; আমি এতক্ষণ যেন কেমন স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলাম—একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিবার অবসর পাইলাম। এই ত তিনি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মনোভাব বাক্যে প্রকাশ করিলেন, আমি কি নিতান্তই সুখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি? মনের মধ্যে মন দিয়া অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম,—না, তাহা ঠিক নহে, সর্ব্ব প্রথম তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া যেমন হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার এই অনুরাগ-বাক্যে আজও কেমন যেন সহসা সুমধুর সঙ্গীত-সুরে একটা বিষম বেসুরো স্বর কানে বাজিল, অমৃতভাণ্ডে একবিন্দু তীব্র বিষক্ষেপের ন্যায় সুখের মধ্যে প্রাণ যেন কেমন আকুল হইয়া উঠিল আশার কোণে কোণে নৈরাশ্যের ঘন ছায়া জমাট বাঁধিল,—মনে হইতে লাগিল যেন, যাহা চাহিয়াছিলাম, এ তাহা নহে; যাহা বুঝিয়াছিলাম, এ তাহা নহে।

আমি ভাবিতেছি তাঁহারা দুইজনে গল্প করিতেছেন, চাকর আসিয়া খবর দিল, এক জন মক্কেল আসিয়াছে, আর হাতে করিয়া একখানি 'কার্ড'-পাত্র সম্মুখে ধরিল। ভগিনীপতি তিনখানি টিকিট হাতে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন—"ডাক্তার ঘোষ, আমাদের উপর জুলুম করতে এসেছেন দেখছি। আচ্ছা, এইখানে আসতে বল।—মণি, তুমি যাও—তোমার দিদিকে ডেকে আন।"

আমি চলিয়া গেলাম, গৃহ পার হইয়াই প্রায় তখনি নূতন কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম, কৌতূহল-বশবর্ত্তী [illegible] ভাবিলাম—লোকটার চেহারাখানা কি রকম, [illegible] দেখিয়া যাওয়া যাক। দরজার আড়ালে [illegible] থাকিয়া নবাগতকে দেখিবার প্রয়াস করিলাম। আপনাকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া তাঁহাকে দেখিবার তেমন সুবিধা হইতেছিল না—এদিকে একবার, ওদিকে একবার ফেরাফেরি করিতে করিতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কানে যাইতে লাগিল। তখন দর্শন-কৌতূহল-বিরহিত হইয়া শ্রবণ-কৌতূহলে বাঁধা পড়িলাম। ভগিনীপতি ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াই মুহূর্ত্তের জন্য বিদায় লইয়া মক্কেলের সহিত দেখা করিতে গেলেন। দুই জনে একাকী হইবামাত্র ডাক্তার বলিলেন—

"By the way I met Miss K. just before leaving England. She seemed very anxious to know whether you had arrived safely and why you did not send her the money you had promised for her passage out to India. You know her people will have no nothing to do with her since her engagement to you, so the poor girl—"

আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, দেয়ালে ঠেস দিয়া আমি প্রাণপণে বলসংগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন—Nonsense, there was never any formalengagement between us, I thought that affairwas over and done with long ago. For goodness sake don't being that up before anybody here—all my friends would think I was vilian of the deepest dye

ডাক্তার। And what alse do you make yourself out to be? Do you think it is very honourable conduct to forsake a helpless girl who has trusted you implicitly? Before God you are man and wife"—

ইহার কিছু পর আর কিছুই জানি না, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:০:—

যখন জ্ঞান হইল, দুইটি সোৎসুক নয়নের সস্নেহ দৃষ্টি নয়নে স্থাপিত দেখিলাম। বুঝিলাম, আমার সেই মোহের অবস্থা—যে অবস্থায় আমি আত্মহারা হইয়া অতীতে বর্ত্তমানে মিশাইয়া ফেলি, বাল্যের স্মৃতিগঠিত যৌবনস্বপ্নে একে অন্যে ভ্রম করি,—

এ আমার সেই পর্য্যাবিষ্ট অবস্থা; তাই মিষ্টার ঘোষের নয়নে আমার বাল্যসখার স্নেহদৃষ্টি নিরীক্ষণ করিতেছি। কিন্তু তখনি সে ভ্রম ভাঙ্গিল, বুঝিলাম, ই'নি তিনি নহেন—ইনি ডাক্তার। আমাকে সজ্ঞান দেখিয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন "Thank God the danger is past, she is all right now."

দিদি আমার পাশেই বসিয়া ছিলেন, তিনি এক চামচ ঔষধ আমার মুখের কাছে ধরিয়া স্নেহকণ্ঠে বলিলেন,—"মণি, এইটুকু খেয়ে ফেল।"

আমি বলিলাম, "আমার হয়েছে কি,—ওষুধ খাব কেন?"

ভগিনীপতি বলিলেন,—"না, কিছুই হয় নি—ওষুধ না—সরবৎ দেওয়া যাচ্ছে—খেয়ে ফেল দেখি,—I say Doctor—রমানাথ একবার এখন দেখতে আসতে চায়, আসতে পারে কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "এখনও বোধ হয় কিছুক্ষণ disturb না করাই ভাল,—If she gets a little sound sleep her nervous system will recover its natural tone, এখন আমরাও যাই—আমারো আর এখানে থাকার আবশ্যক দেখিনে। আপনার স্ত্রী উঁহাকে এখন ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করুন। যদি বলেন, কা'ল আমি বরঞ্চ একবার এঁকে দেখতে আসব—আসতে পারি কি?"

ভগিনীপতি বলিলেন,—"নিশ্চয়ই। আজ আপনি না থাকলে কি বিপদেই পড়তে হোত—I don't know how to thank—"

আর শুনিতে পাইলাম না, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। এতক্ষণ যেন কি একটা অজ্ঞাত জলন্ত শোকভার আমার হৃদয়ে রুদ্ধ হইয়া ছিল, সহসা অশ্রুস্রোতে গলিয়া বাহির হইয়া উঠিল, আমি দুইহাতে দিদির কটিদেশ বেষ্টন করিয়া—তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলাম—"দিদি, আমি কি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি?" দিদি আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিলেন,—"লক্ষ্মীমণি, আর কথা ক'সনে—ডাক্তার ঘুমুতে বলেছে—চুপ ক'রে থাক—এখনি ঘুম আসবে।"

আমি থামিলাম, কিন্তু অশ্রুধারা থামিল না, শত ধারায় উথলিয়া উঠিতে লাগিল; অথচ এ দুঃখ যে কেন—কেন যে কাঁদিতেছি, তাহা কিছুই বুঝিলাম না; সুখ-দুঃখ কিছুরই অনুভূতি আমার তখন ছিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে—ছেলে মানুষের মত কাঁদিতে কাঁদিতে দিদির স্নেহোদরের মধ্যে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটিল, অথচ সুনিদ্রা নহে; ঘুমাইয়াও মনে হইতেছিল, যেন জাগিয়া ঘুমাইতেছি, মাথার মধ্যে কত রকম দৃশ্য, কত রকম ঘটনা ছায়াবাজির মত একটির পর একটি কেমন অবিশ্রান্ত গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এই যেন কি ছিল, কে নাই; এক জনের সহিত গল্প করিতেছিলাম—সে আর এক জন হইয়া পড়িল,—কাহার বাড়ীতে যেন নিমন্ত্রণে যাইব—সাজসজ্জা করিতেছি—কিছুতেই সজ্জা শেষ হইতেছে না, বাড়ীর বাহির হইয়াছি, গাড়ী খুঁজিতেছি, কিছুতেই খুঁজিয়া মিলিতেছে না, অবশেষে পায়ে চলিতেছি, পথ ফুরাইতেছে না, যদি বা পথ ফুরাইল, কাহার বাড়ী যাইতে কাহার বাড়ী আসিয়াছি,—এই রকম সব হিজিবিজি স্বপ্ন; বা শেষে স্বপ্নটি কেবল বেশ স্পষ্ট—এত স্পষ্ট যে, তাহা এখনো আমার জলন্তরূপে মনে আছে। স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমার বিবাহ হইতেছে, আমি আগ্রহদৃষ্টিতে বরের দিকে চাহিলাম, কিন্তু মনে হইল, এ সে নহে; নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে চক্ষু নত করিলাম, তাঁহার চরণে দৃষ্টি পড়িল—অমনি হৃদয় আনন্দে মগ্ন হইয়া উঠিল—আমি আহ্লাদের আবেগে বলিয়া উঠিলাম,—"এ সেই সেই!" ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, বেশ আলো হইয়াছে। এইরূপ স্বপ্নময় ঘুম সত্ত্বেও জাগিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম।

মনে পড়িল,—ডাক্তারের এক একটি কথা আবার যেন নূতন করিয়া আদ্যোপান্ত শুনিতে লাগিলাম। চারিদিকে বায়ুমণ্ডলে পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম।—আপনাকে আপনি ভিন্ন বলিয়া অনুভব করিলাম;—বুঝিলাম, কা'ল যাহা ছিল, আজ আর তাহা নাই—কা'ল যে আমি ছিলাম,—আজ সে আমি নহি। হৃদয়ে নৈরাশ্য বেদনা জাগিল। কিন্তু এ নৈরাশ্যে ঔপন্যাসিক করুণ কষ্টের দারুণতা, অসহনীয়তা উপলব্ধি করিলাম না; কিংবা সে যেমনই হোক, তবু আমার দেবতা—তবু তাঁহার চরণে হৃদয় বিকাইব, মনে এমনতর ভাবেরও উদয় হইল না। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রতারিত বোধ

করিয়া এ যেন প্রত্যাখ্যাত ভিক্ষুক দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় গর্ব্বাহত নিরাশলুব্ধ হইলাম, প্রতারকের উপর ভীষণ ক্রোধের উদয় হইল। কেবল তাহার উপর নহে, নিজের উপরেও ক্রুদ্ধ হইলাম—কি করিয়া আমি এমন লোককে দেবতা মনে করিয়াছিলাম! সঙ্গে সঙ্গে বিকটতর একটা আনন্দ জন্মিল—এই যে, সে ভ্রান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। তুলনায় ডাক্তারের প্রতি খুব শ্রদ্ধা জন্মিল—তাঁহার করুণ সহৃদয় ভাবে পুরুষোচিত মহত্ব দেখিতে লাগিলাম।

আমাকে সুস্থ দেখিয়া দুপরের পর দিদি অসুখের কথা পাড়িলেন। "অনেক দিন তোর হিষ্টিরিয়া হয় নি, ভেবেছিলুম, একেবারে সেরে গেছে, আবার রাত জেগে নভেল পড়েছিলি বুঝি? তোর সঙ্গে যদি কিছুতে পারা যায়! আচ্ছা, নিজের জন্য না হোক, আমাদের কষ্ট মনে ক'রেও কি সাবধান হ'তে নেই?"

আমি বলিলাম, "কই অসাবধান ত আমি মোটেই হই নি—"

দিদি। তবে হঠাৎ অমনতর হোস কেন? কা'ল যে ভাবনা গেছে—তা আর বলবার নয়। দরজার কাছে গিয়েই দেখি— তুই প'ড়ে। চেঁচিয়ে উঠতেই এ রা ওবর থেকে এসে পড়লেন। ভাগ্যিস ডাক্তার কাছে ছিল—তাই রক্ষে। আহা রমানাথ বেচারার যে মুখ শুখিয়ে গিয়েছিল, সে আর কি বলব! তার পর তোকে ত ঘরে উঠিয়ে আনা গেল, সে একবার দেখেই যেতে পারলে না, শুনলুম নাকি ভারী বিষণ্ণ হয়ে বাড়ী গেছে।"

আমি বলিলাম,—"ক্রুদ্ধ বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম, —"বিষণ্ণ হবে বাড়ী যেতে পারেন, কিন্তু সে আমার অসুখের জন্য নয়—নিজে ধরা পড়েছেন সেই জন্যে। দিদি, আমরা নিতান্তই ভুল বুঝেছি, প্রতারিত হয়েছি—"

বলিতে বলিতে নয়ন অশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল, অগ্নিময় ক্রোধাশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল। দিদি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—

"তোর কথা ত কিছুই বুঝতে পারছিনে—কা'ল কি তোকে ঐ ভাবের কথা কিছু বলেছে নাকি? কাঁদিসনে আবার অসুখ করতে পারে—স্থির হয়ে সব বল দেখি, কি হয়েছে।"

স্থির হইয়া না পারি, অস্থির ভাবেই খুলিয়া বলিলাম। দিদি শুনিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন—"তবু ভাল, এই ব্যাপার? আমার এমন ভয় হয়েছিল—যে, না জানি কি।"

আমি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম—"না জানি কি! এক জনের সঙ্গে বিবাহে প্রতিশ্রুত হয়ে অন্য জনের প্রেমের ভাণ—এ কি সামান্য ব্যাপার হোল?"

দিদি। "না, ভাণ হতেই পারে না, তোকে যে সে ভালবাসে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ও বিলাতের কথা ছেড়ে দে। প্রথমতঃ কথাটা কতদূর সত্যি মিথ্যে, তার ঠিক নেই। তার পর ধর, যদি কারো সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েই থাকে, কিন্তু বিয়ে ত আর হয় নি—তা হ'লে আর এত রাগের কারণ কি? সব দেশেই ত এমন কতশত enagement পড়েছে, আবার ভেঙ্গেছে; এই সে দিন যে আমার মামাতো দেওরের গায়েহলুদ হয়েও বিয়ে ফিরলো, আর এ তো বাঙ্গালী ইংরাজের engagement দু'জনের স্বভাব দু'জনের অবস্থার পার্থক্য একবার ভেবে দেখ দেখি। কোন একটা মোহের মুহূর্ত্তে দু'জনে আজন্ম একত্ব শপথ করতে পারে,—কিন্তু তার পর-মুহূর্ত্ত থেকেই অনুতাপ করবার কথা—বিয়ে করার যথার্থ উদ্দেশ্য যা পরস্পরের সুখ এ বিয়েতে আমার ত মনে হয় তার সম্ভাবনা একেবারে শূন্য। এ অবস্থায় আমি ত বলি, কথা রাখার চেয়ে ভাঙ্গাই ভাল। নিজের আহাম্মুকীতে যেন নিজেকেই সে অসুখী করলে, কিন্তু আর একজনের চিরজীবনের সুখাসুখও যখন—"

আমি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে শুনিতে পারিলাম না, বলিয়া উঠিলাম—"কিন্তু তার সুখদুঃখ ভেবেই কি এ বিয়ে ভাঙ্গা হয়েছে? যে ভ্রান্ত নারী সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে এখনো পূর্ণ বিশ্বাসভরে তার পথ চেয়ে আছে, সেই বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে গোপনে যে পুরুষ আর এক জনকে ভালবাসা জানায়, বিবাহ-প্রস্তাব করে- সে খুব সাধু পুরুষই বটে! দিদি, তুমি এখন প্রশান্তভাবে এ ঘটনা কি ক'রে যে দেখছ, আমি ত ভেবেই পাইনে।"

দিদি বলিলেন, "আমার ভিতরকার কথাটা কি জানিস, আমি অন্তর থেকে তাকে এতে দোষী ব'লে বিশ্বাস করতে পারছিনে। বিলাতের মেয়েদের কুহক ত প্রসিদ্ধ কথা, আমার মনে হচ্ছে, নেহাৎ

কোনরূপ একটা পাকে-চক্রে পড়ে বেচারার এমনতর বিভ্রাট ঘটেছিল। 'তাকে জিজ্ঞাসা করলেই এর এমন একটা সদুত্তর পাওয়া যাবে যে, তখন সে মেয়ের চেয়ে তার উপরেই বেশী মায়া করবে!"

আমি। তুমি বুঝি ভেবেছ, এ সব কথা আমি তার কাছে তুলতে যাব?

দিদি। তোর তুলতে হবে না, সে নিজেই তুলবে, সে জন্য ভাবনা নেই, না হয় আমরা জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু যার সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে গেছে—তার সঙ্গে বুঝি আর এ কথা তোলা যায় না?

আমি। বিয়ে স্থির এখনো হয় নি, আমার মোটেই ইচ্ছা নেই।

দিদি বিস্ময়ে রাগে বলিলেন, "তুই ক্ষেপেছিস্ নাকি, এ সামান্য কারণে বিয়ে বন্ধ হবে! ও কথা মনেও আনিস নে, তা হ'লে সমাজে কি কলঙ্কের সীমা থাকবে? সে পুরুষমানুষ, তার কি, তোর সঙ্গে না হ'লে এখনি অন্য আর এক জন দেখে মেয়ে দেবে, আর তোর নামে এ থেকে এত কথা উঠবে যে, পরে বিয়ে হওয়াই ভার হবে।"

আমি। নাই বা বিয়ে হ'ল, আমি ত সে জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নই।

দিদি। তা ছাড়া এটাও ভেবে দেখ, তুই যে এমন ক'রে নিজের চিরজীবনের সর্ব্বনাশ করতে চাচ্ছিস্, সে কি কোন একটা ন্যায়ের অনুরোধে? তুই যে জন্য তাকে দোষী করছিস্—এক্ষে তোরও ঠিক সেই একই রকম অন্যায় করা হচ্ছে না? যে তোকে প্রাণপণে ভালবাসে, মিথ্যা কারণে তাকে কি তুই চির-অসুখী করতে চাচ্ছিস নে?

আমি। মিথ্যা কারণ!

দিদি। নিশ্চয়ই। আমি বেশ জানি, তার কাছে আসল ঘটনা শুনলে বুঝতে পারবি—তেমন দোষ নেই। অন্ততঃ তার এতে কি বলার আছে, সেটা শোন—শুনে তার পর যা হয় স্থির করিস। খুনী যে, তারও বক্তব্য না শুনে বিচার হয় না, আর যে তোকে এত ভাল বাসে, তার পক্ষে তুই একটা কথা না শুনে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছিস? তোর দেখছি নিতান্তই কঠিন প্রাণ।

আমি নিরুত্তর হইয়া গেলাম। কি করিয়া আমার মনের ভাব তাঁহাকে বুঝাইব; তিনি সাংসারিক চক্ষে এ ঘটনা দেখিতেছেন, তাঁহার অভিজ্ঞ হৃদয় বলিতেছে, "সংসারে এরূপ ঘটিয়াই থাকে। দোষগুণে মানুষ, অতএব দেবতা চাহিলে তোমাকে নিরাশা সার করিতে হইবে। তুমি শুধু দেখ, সে নিতান্ত ঘৃণ্য দোষ করিয়াছে কি না? যদি না করিয়া থাকে, তবেই সে ক্ষমা পাইবার পাত্র।" আমার কিন্তু নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, নয়নে আর টিটানিয়ার প্রেমদৃষ্টি নাই, যাহার বলে কুরূপ সুরূপ হইবে, পাপে তাপে, দোষে মলিনতায়, কাঁদিয়া তবু তাহাকে আমারি ভাবিতে পারিব। এখন আমার নিরপেক্ষ বিচারসক্ষম নবীন হৃদয় উচ্চতর কল্পনাপূর্ণ উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আদর্শে মাত্র জাগ্রত। মনে এখন, যে আমার ক্ষমার পাত্র, সে আমার প্রণয়ী আমার স্বামী হইবার যোগ্য নহে; আমার স্বামীতে আমি সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান্ গৌরবমণি দেখিতে চাই। সংসার যেমনই হোক, পৃথিবীতে সে আমাকে স্বর্গ দেখাইবে, আমি তাহাতে দেবতা পাইব। অন্যে শুনিলে ইহা বৃথা কল্পনা বলিয়া উপহাস করিবে—কিন্তু আমার অনভিজ্ঞ হৃদয়ে ইহা আকাশ-কুসুম নহে; প্রকৃত সত্য, কিন্তু এ সত্য আমি অন্যকে কি করিয়া বুঝাইব? কেবল তাহাই নহে, আমার স্বামীর বর্ত্তমানটুকু লইয়াই আমি সন্তুষ্ট নহি, অতীতে, বর্ত্তমানে, ভবিষ্যতে তাঁহার সমস্ত জীবনে আমি আপনাকে বিরাজিত দেখিতে চাই, তাঁহার জীবনের কোন ভাগ যে আমাছাড়া ছিল বা কখনো তাহার সম্ভাবনা আছে, আমার সর্ব্বগ্রাসী প্রেমাকাঙ্ক্ষা এ চিন্তা সহ্য করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমার হৃদয় পুরুষের ন্যায়, পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমন আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।

আমার এ আকাঙ্ক্ষায় সহানুভূতি কে করিবে? আমি কি করিয়া বুঝাইব যে, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারি, বিবাহ করিতে পারি—তিনি আমার স্বামী হইতে পারেন। কিন্তু আমার হৃদয়ের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে স্থান দিতে গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা ক্রমক্রমে, মোহভঙ্গে পরিত্যক্ত বিসর্জ্জিত ভগ্ন অঙ্গহীন মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করিলে হৃদয়ের শোভা হইবে না, জীবন পর্য্যন্ত তাহাতে বিকৃত বিরূপ হইয়া

পড়িবে। রমণীতে এরূপ পৌরুষিক হৃদয়ভাবের কি সহানুভূতি আছে? তাই নিরুত্তর হইয়া গেলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিদি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল, তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়া নিজেই সে কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"ডাক্তার আমাকে যা বলছিল,—তুমি তা শুনেছিলে—না?" এই প্রথম আমাকে তিনি 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কালিকার বিবাহ-প্রস্তাবের পর আর আপনি বলিয়া সম্ভাষণ বোধ করি তাঁহার সঙ্গত মনে হইল না। অথবা এইরূপ সম্বোধনে এখন অধিকার জন্মিয়াছে বিবেচনা করিলেন। আমি নীরবে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম, শুনিয়াছি। তিনি তখন বলিলেন, "তুমি বোধ হয় ভেবে নিয়েছ, ভারী একটা মহামারী কাণ্ড ক'রে বসেছি, I am so sorry. কিন্তু আসলে তেমন কিছুই নয়—flirtation মাত্র; বিলাতে ত এমন আখ্‌সারই হয়ে থাকে—"

আমি ক্রোধ চাপিয়া সহজে গম্ভীরভাবে বলিলাম, "কিন্তু ডাক্তারের কথায় ত উল্টোই মনে হ'ল।

Oh! the meddling fellow—He is a puritanic hypocrite of the first water! অন্যের সম্বন্ধে একটা কথা পেলে হয়—তিলকে তাল ক'রে তোলে।"

আমি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলাম না, বলিলাম, "এক জন পরিত্যক্ত অসহায় রমণীর পক্ষ গ্রহণ করে যে, সে হিপক্রিট, তবে যে, বিশ্বস্ত-হৃদয় রমণীকে ফাঁকি দেয়, তাহাকে অভিধানে কি নামে সম্বোধন করে—বোধ করি Honorable man!"

কথাটা বোধ করি, অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ হইয়াছিল, বলিয়াই আমি অনুতপ্ত হইলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন তাহার পর বলিলেন,—"আমি ফাঁকি দিই নি, যদি বিবাহ করতুম, তা হ'লেই বরঞ্চ ফাঁকি দেওয়া হ'ত। কেন না, আমি তাকে কোন কালেই ভালবাসতে পারতুম না।"

"তবে engaged কেন হলেন?"

"ঠিক engaged হই নি, তবে—একটা ভুল বোঝা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে আমার দোষ নয়। বলতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যখন তুমি এতদূর শুনেছ, না বল্লেও উপায় নেই।"

বলা বাহুল্য, তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে সেই ইংরাজ-ললনারই উপর বর্ত্তমান সমাজপ্রথার দোষ অধিক পৌঁছায়। সেই তাঁহাকে প্রথমে অনুরাগ দেখাইয়াছিল—তাঁহাকে তাহাদের বাড়ীতে ক্রমাগত যাইতে বলিত, না গেলে দুঃখ করিত, কোথাও যাইবার আবশ্যক হইলে তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিত ইত্যাদি। এক জন পুরুষের পক্ষে এরূপ আহ্বান উপেক্ষা করা নিতান্ত অসৌজন্যের কাজ, তিনি তাই এইরূপে তাহার ফাঁদে পড়িয়া গেলেন, অবশেষে যখন বুঝিলেন, তাহার প্রত্যাশা বড় অধিক, সে বিবাহ আশা করে, তখন ক্রমশঃ সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার কথার এই সারমর্ম্ম। জানি না, এই বিবরণের জন্য সকলে সেই মুগ্ধা অভিযুক্তা রমণীকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আমার কিন্তু এ কথায় তাঁহার উপর বরঞ্চ মমতা হইল এবং অভিযোগীর উপর যে বড় শ্রদ্ধা বাড়িল—তাহাও নহে।

আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি তাকে ভুল বুঝতে দিলেন কেন? আপনার পক্ষে যা flirtation, তার পক্ষে তা জীবন্ত অনুরাগ, আপনার খেলা তার মৃত্যু, এরূপ স্থলে বিবাহই আপনার উচিত কার্য্য।"

"তুমি কি মনে কর দৈবাৎ একটা অন্যায় করেছি বলেই সেই অন্যায়কে চিরস্থায়ী করা কর্ত্তব্য? আমি যদি তাকে বিবাহ করি, কেবল আমার কষ্ট নয় আমার ভাই, বোন, পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজনের চিরকষ্ট, দেশের সহিত আজন্ম-বিচ্ছেদ এবং এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বহন করব যার জন্য, তারো চিরকষ্ট, কেন না, তার প্রতি আমার এমন ভালবাসা নেই, যাতে তাকে সুখী করতে পারি। এ অবস্থায় তুমি কি আমাকে বিবাহের পরামর্শ দিতে?"

কথাটা ঠিক বলিয়া মনে হইল, বলিলাম—"কিন্তু তবে সে কেন এখনো বিবাহের প্রত্যাশা করে?—অন্ততঃ তাকে পরিষ্কার ক'রে মনের ভাব জানিয়ে বুঝি দেওয়া উচিত ছিল।"

"আমি ত মনে করেছিলুম, যথেষ্ট স্পষ্ট ক'রে মনের ভাব জানতে দেওয়া হয়েছে, তবে এখনো যদি ভুলভ্রান্তি থাকে, আমাদের বিবাহের খবর পেলেই তা ভেঙ্গে যাবে।"

কথাটা বড় খারাপ লাগিল, বাস্তবিক সে যদি ইঁহাকে ভালবাসে, তার বিবাহের আশা করে, তাহা হইলে এই খবরে তাহার কিরূপ হৃদয়দাহ হইবে! তাহার ভালবাসা আমার আগে, তাহার অধিকার আমার আগে, আমি কোন্ প্রাণে তাহার এরূপ যন্ত্রণার কারণ হইব! আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "আপনি ন্যায়-অন্যায় কি করেছেন জানি নে, তার বিচারক ভগবান্, আমরা নই, তবে যে রমণী আপনাকে এতদূর ভালবাসে, তাহার সুখের পথে আমি কাঁটা হব না, নিশ্চয় জানবেন।"

তিনি যেন বজ্রাহত হইয়া খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। আমার কাছ হইতে এরূপ কথা শুনিবেন, ইহা তাঁহার কল্পনার অতীত। কিছু পরে বলিলেন, "তুমি আমাকে ছলনার অভিযোগ দিচ্ছ, আমি আর যাকেই ছলনা ক'রে থাকি, তোমাকে করি নি। কিন্তু তুমি আমাকে ছলনা করেছ, তুমি আমাকে না ভালবেসেও ভালবাস, এইরূপ বুঝতে দিয়েছ। যদি সত্য সত্য আমাকে ভালবাসতে, তা হ'লে কখনই এই সামান্য অপরাধে বিবাহ ভাঙ্গতে চাইতে না, আমার অবস্থা বুঝে বরঞ্চ মমতা করতে। Oh my god—have I live her this!"

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করিয়া রহিলাম,—যখন দিদি আসিলেন, তখন তাঁর সহিত দুএকটা কথা কহিবার পর তিনি বলিলেন, "আজ রাত্রেই একটা মোকদ্দমায় মফঃস্বলে যেতে হচ্ছে; হয় ত হপ্তাখানেক সেখানে থাকতে হবে। আশা করি, চিঠিপত্র পাব।"

বলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বিদায়-গ্রহণ উপলক্ষে আমার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে আমাকে বলিলেন —অতি ব্যথিত করুণকণ্ঠে বলিলেন, "কি আর বলব, my life and death are in your hands—এই বুঝে বিবাহ ভাঙ্গবার কথা মনে করো।"

ইহার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—•—

দিদি বলিয়াছিলেন, তাঁহার স্বপক্ষের বক্তব্য শুনিলে আমার রাগ থাকিবে না, ফলে বিপরীত ঘটিল। নিজের দোষক্ষালন অভিপ্রায়ে তিনি যাহা কিছু বলিতে লাগিলেন, তাহাতেই উত্তরোত্তর ধাপে ধাপে আমার রাগটা ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমেই রাগ ধরিল, বিলাতের ঘটনাকে নিতান্ত তুচ্ছতাচ্ছীল্যভাবে সামান্য Flirtation মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করায় রাগটা আরো জ্বলিল, ডাক্তারকে গালি দিতে শুনিয়া, অবশেষে ক্রোধের যেখানে যতটুকু বাকি ছিল, সর্ব্বাংশে বেশ হুহু করিয়া ধরিয়া উঠিল। যখন বলিলেন, তিনি আমাকে ছলনা করেন নাই, আমি তাঁহাকে ছলনা করিয়াছি, না ভালবাসিয়াও ভালবাসা জানাইয়াছি, নহিলে এত সামান্য কথায় তাঁহাকে এতদূর অপরাধী করিতাম না। যেন ভালবাসিলে লোকে ন্যায়ান্যায় জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, অন্যায়কে—দোষকে পূজা করাই যেন ভালবাসা! আমি তাঁহাকে যেরূপ ভাল লোক মনে করিয়া ভালবাসিয়াছিলাম —তিনি যে তাহা নহেন, সে যেন আমারি দোষ! তিনি যে আপনাকে আমার আদর্শরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে আমারি ছলনা বটে! কি চমৎকার যুক্তি-চাতুরী! আমার এতদূর ক্রোধ হইল যে, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গকণাও বাহিরে আসিয়া পড়িলে যেন সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারিত। অথচ এই প্রজ্বলন্ত মহাক্রোধও তাঁহার বিদায়কালের সেই কাতর করুণ উক্তিতে মুহূর্ত্তে অতি সহজে ভস্মাকারে নির্ব্বাপিত নিষ্ফল হইয়া পড়িল! রমণী সব পারে—যথার্থ প্রেম উপেক্ষা করিতে পারে না, বিধাতা বুঝি এইখানেই স্ত্রীপুরুষের স্বভাবগত বিশেষ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যথিত স্বরে, তাঁহার মর্ম্মোত্থিত বাক্যে, তাঁহার গভীর প্রেম অন্তরে উপলব্ধি করিলাম, হৃদয়ের স্তরে স্তরে তাহাতে করুণাতান বিকম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার নৈরাশ্য-ব্যথা আমি নিজের মত করিয়াই অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁহার যে কথায় পূর্ব্বে ক্রোধাভিভূত হইয়াছিলাম,

সেই কথা মনে উদয় হইয়া নিজের প্রতি সন্দেহ আনয়ন করিল,—সত্যই কি তবে আমিই ইঁহাকে ছলনা করিয়াছি, না ভালবাসিয়া ও ভালবাসা জানাইয়া ইঁহার চিরজীবনের সুখদুঃখ আপনাতে ন্যস্ত করিয়াছি ?

প্রাণভরা করুণাপূর্ণ অনুতাপ বেদনা লইয়া আমি নীরবে বসিয়া, দিদি আমার দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিতেছেন, এই সময় ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, "ডাক্তার আসিয়াছেন।" এই সংবাদে সহজেই ভিন্নমনা হইয়া পড়িলাম— চিন্তাবেগ শমিত হইল,ডাক্তার যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, স্পষ্ট আনন্দ অনুভব করিলাম।

ডাক্তার আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া পরে সকালে আসিতে না পারার কারণ জানাইয়া তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ-পূর্ব্বক আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দিদি বলিলেন, "ভালই আছে, রাত্রে ঘুমও বেশ হয়েছে—আর বোধ হয় ওষুদের আবশ্যক নেই

পশ্চিমের জানালা দিয়া আমার কৌচের উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল, ইতিমধ্যে তিনি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার নিকটে একখানি চৌকিতে আসিয়া বসিলেন, বসিয়া আমার হাত দেখিয়া বলিলেন, "না, এখনো বেশ সবল বোধ হচ্ছে না—টনিকটা বন্ধ করবেন না।"

আমি বলিলাম, "না, অমন বিশ্রী ওষুদ আমি আর খাব না।"

ভগিনীপতি কোথা হইতে আসিয়া বলিলেন, —"কার সঙ্গে অভিমান আবদার হচ্ছে ? ডাক্তারের সঙ্গে না ওষুধের সঙ্গে।

আমি লজ্জিত হইলাম, তাই ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, "এ বুঝি আবদার হোল ? একবার ওষুধটা খাও দেখি ?"

ভগিনীপতি বলিলেন, "তাতে যদি তোমাদের আবদার কিছু কমে, তা হ'লে একশিশি কেন, যত শিশি বল খাচ্ছি। I say doctor এমন পজিটিভ প্রমাণ থাকতে মেয়ে পুরুষের intellectual superiority সম্বন্ধে এখনো এত বাগ্‌বিতণ্ডা চলে কেন, তা ত বুঝতে পারিনে !"

দিদি বলিলেন,—"পজিটিভ প্রমাণটা কি, আর কোন্ পক্ষে শুনি ?"

ভগিনীপতি বলিলেন,—"মেয়েরা যদি আর কারো সঙ্গে অভিমান করতে না পায়, তখন ভাগ্যের সঙ্গে অভিমান করতে বসে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস—অটল অচল অদৃষ্টকেও তারা চোখের তাপে গলিয়ে একেবারে জল ক'রে ফেলবে।"

দিদি বলিলেন, "অদৃষ্ট যদি এমনই অটল অচল হয়, তা হ'লে তার সঙ্গে যারা লড়াই করতে যায়, তারাই বা কি মহাবুদ্ধিমান্ ?"

ডাক্তার বলিলেন,—"বেশ বলেছেন, আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার সঙ্গে একমত।"

ভগিনীপতি বলিলেন,—"তুমি শুদ্ধ দলে মিশলে —তবে দেখছি, আর এখানে পোষাল না আমার, আমি চললুম, নীচে মক্কেল এসে ব'সে আছে। যাবার সময় দেখা ক'রে যেও হে।" ভগিনীপতি চলিয়া গেলেন, ডাক্তার বলিলেন, "আচ্ছা, ওষুধটা যদি আপনি খেতে না পারেন, একটা সুস্বাদু টনিক লিখে দিচ্চি

এই সরল সহানুভূতি আমার বড় ভাল লাগিল, আমি আনন্দ-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলাম।

এস্থলে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। যাহারা স্ত্রীলোকের আবদার সহ্য করিতে না পারিয়া খড়্গহস্তে তাহার দমন করিয়া থাকেন, মুহূর্ত্তের জন্য যদি কেবল তাঁহারা দিব্যহৃদয় লাভ করিয়া অনুভব করিতে পারেন, সামান্য নির্দ্দোষ ছোটখাট অভিমানগুলির সম্মান রক্ষায় অতি সহজে তাঁহারা নিজের এবং পরের কিরূপ অপরিমিত গভীর সুখের কারণ হইতে পারিতেন, কেবল একটুখানি সহানুভূতির অভাবে এই সুখের স্থলে কত অসুখ বৃদ্ধি করিতেছেন, কত কোমল হৃদয় নিষ্পেষিত কঠোর করিয়া তুলিতেছেন, —তাহা হইলে জানি না তাঁহাদের সুখ বাড়িত কিংবা দুঃখ বাড়িত, তবে সংসারের রূপ এবং স্ত্রীলোকের ভাগ্য যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৃহের এককোণে টেবিলে লিখিবার সরঞ্জাম ছিল, ডাক্তার নূতন একটি প্রেস্‌ক্রিপসন্ লিখিয়া দিদির হাতে দিয়া বলিলেন, "আর বোধ হয় আমার আসার আবশ্যক নেই।"

দিদি বলিলেন,—"এখন ত ভালই আছে, আর অসুখ না করলেই বাঁচা যায়।" ডাক্তারের

আসিবার কথার উত্তরে আর কোন কথাই বলিলেন না, আমার সেটা নিতান্ত অভদ্রতা বলিয়া মনে হইল; দিদির উপর মনে মনে একটু রাগ হইল, কেন, তিনি কি বলিতে পারিতেন না, মাঝে মাঝে খোঁজখবর লইয়া যাইবেন, অথবা কখনো কোন দিন সুবিধামত দেখা করিতে আসিলে সুখী হইব—এমনতর কোন একটা ভদ্রতার কথা? কিন্তু রাগটা মনেই চাপিয়া লইলাম! দিদির কথার উত্তরে ডাক্তার বলিলেন, "আশা করি, এখন ভালই থাকবেন।" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় গৃহকোণে যে ছোট টিপাইটির উপর একটি ফুলদানীতে কতকগুলি সুগন্ধি ফুল সাজান ছিল, সেই টিপাইটি আমার কাছে আনিয়া রাখিয়া বলিলেন—"ফুলের গন্ধ nervous systemএর পক্ষে খুব উপকারী"—বলিয়া আর একবার good bye বলিয়া চলিয়া গেলেন; আমার সহসা বাল্যকালের সেই আটচালা ঘর মনে পড়িল—ছোটুকে আমি যে ফুলগুলি দিতাম, সে সযত্নে একটি ভাঙ্গা গ্লাসে পড়ার টেবিলের উপর কেমন সাজাইয়া রাখিত, আমি মাঝে মাঝে তাহার উপর ঝুঁকিয়া ফুলগুলির গন্ধ, লইতাম; শুঁকিয়া বলিতাম, "বাঃ, কেমন গন্ধ আমি বাড়ীতে যে সাজাই, তার ত কই এমন গন্ধ হয় না," ছোটু হাসিয়া সগর্ব্বে মাথা নাড়িত। সে ঘটনার সঙ্গে আজিকার এ ঘটনার বিশেষ যে কিছু সাদৃশ্য ছিল, এমন নহে; তথাপি আমার মনে হইল,—এ যেন ছোটু আমাকে তাহার সেই ফুলদানী আনিয়া দিল। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম,—"আপনি কি ছোটু?" সহসা আত্মস্থ সচেতন হইলাম, যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিলাম, ততক্ষণ তিনি দ্বার পার হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার সহসা মনে হইল, আমি কি ইঁহাকে ভালবাসিতেছি? মিষ্টার ঘোষের গান শুনিয়া যে মোহ জন্মিত, ইঁহাকে দেখিয়াও কি সেইরূপ মোহের উদয় হইতেছে না? এ কিরূপ চাপল্য, কিরূপ হীনতা! এই দুদিন আগে যাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, তাঁহাকে ভুলিলাম? আমার প্রতি যাঁহার ভালবাসা অটল অচল, তাঁহাকে ভুলিলাম? আর কি জন্য? কাহার জন্য? যাহাকে জীবনে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, একদিনের মাত্র যাহার সহিত সাক্ষাৎ, তাহার জন্য? এই জন্যই কি তাঁহাকে দোষী করিয়াছিলাম? নিজের ভালবাসা গিয়াছে বলিয়াই কি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা গিয়াছে? তাঁহার কথাই তবে সত্য? আমি তাঁহাকে ছলনা করিতেছি, তিনি নহেন। নহিলে যথার্থ ভালবাসিলে এ ঘটনায় আমার দুঃখ হইত, অভিমান হইত, কিন্তু এরূপ ক্রোধ হইত না, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার ভাব আসিত না।

আমার অন্ধ নয়ন যেন খুলিয়া গেল, আমি সত্যলোক দেখিতে পাইলাম, নিজের দোষ অতি তীব্রভাবে অনুভব করিলাম; অনুতাপে হৃদয় দাহ হইতে লাগিল। দিদি ডাক্তারকে আসিতে না বলায় রাগ হইয়াছিল, এখন তাহাতে খুসী হইলাম; ভাবিলাম, তাঁহার সহিত আর কখনও দেখা করিব না; যাঁহাকে একবার স্বামী মনে করিয়াছি—তিনিই আমার স্বামী হইবেন। তাঁহাকে বিবাহ করিব—কিন্তু প্রতারণা করিব না; আমার মনের ভাব খুলিয়া বলিব, যদি ইহাতেও তিনি আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন, আমি তাঁহারি। সমস্ত শুনিয়াও অবশ্যই তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন, তাঁহার প্রেম অটল অচল, আমি যাহাই হই, তিনি দেবতা, তাঁহার প্রেমে তিনি পতিত—আমাকে উদ্ধার করিবেন।

দিদি যখন সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার সঙ্গে কি কথা হ'ল?" তখন বিবাহ করিতে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প। আমি বলিলাম, "বুঝেছি, তাকে বিয়ে না ক'রে কোন দোষ করেন নি।"

"তাকে যে খুব ভালবাসে, তাও বুঝেছিস?"

"বুঝেছি।"

"এখন বিয়েতে আপত্তি আছে কি?"

বলিলাম "না।"

দিদি ভারী খুসী হইয়া বলিলেন, "এক হপ্তা পরে সে আসবে—না?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:*:—

ময়মনসিংহ' হইতে একখানি পত্র পাইলাম। চিঠিখানি একান্তই প্রীতি ও মিনতিপূর্ণ। পড়িয়া যেমন আর্দ্র হইলাম, তেমনি আত্মগ্লানি অনুভব করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, এখানি ইংরাজী পত্র; ইঙ্গবঙ্গ যুবা--যাঁহার জীবনই ইংরাজী অনুকরণ, তাঁহার প্রণয়পত্র যে মাতৃভাষায় লিখিত হইবে—বোধ করি, আমি খুলিয়া না বলিলেও, এমন আজগুবি ভুল কেহ করিতেন না।

আমি অবশ্য ইংরাজীতেই উত্তর লিখিতে বসিলাম। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সুশিক্ষিতনামা কোন বঙ্গবালা হইতে যে আমার ইংরাজী ব্যুৎপত্তি প্রতিপত্তি কিছু কম, তাহা নহে, আমিও লোরেটা কন্‌ভেণ্টে শিক্ষালাভ করিয়াছি, বাবাকে, জ্যেঠাই-মাকে ও পিসীমাকে ছাড়া আর কাহাকেও চিঠিপত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিয়া থাকি; সখীদিগের সহিত কথাবার্ত্তাও অনেক সময়ে ইংরাজীতেই চলে, আর এ পর্য্যন্ত যে কত শত ইংরাজী কবিতা উপন্যাস মস্তিষ্কজাত করিয়াছি, তাহার ত ঠিক-ঠিকানাই নাই। সত্য কথা বলিতে কি, দেশের ভাষা হইতে এই পরদেশী ভাষাটাকে অধিকতর আয়ত্তীভূত করিয়া লইয়াছি বলিয়াই, বরঞ্চ এতদিন মনে মনে একটা গর্ব্ব অনুভব করিতাম, কিন্তু এ চিঠি লিখিতে বসিয়া সে ভুল আমার ভাঙ্গিল! এ ধরণের পত্র লিখিবার প্রয়াস এই আমার প্রথম। এক একটি মনোমত শব্দের চিন্তায়, ভাব ও ভাষায় সুন্দর সঙ্গতিতে এক একটি সুললিত পদবিন্যাসের প্রয়াসে উৎকণ্ঠিত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলাম। চিঠিখানি কতবার লিখিলাম, কতবার ছিঁড়িলাম, তাহার ঠিক নাই। যেখানির ভাব ঠিক হয়—তাহার ভাষা ঠিক হয় না, যাহার বা ভাষা পছন্দ হয়—তাহাতে আমার মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দৈবক্রমে কোনখানিতে ভাব ও ভাষায় একরূপ নির্দ্দোষ সমন্বয় হইলেও তখন ভাবনা জন্মে, ইহা ঔপন্যাসিক রসযুক্ত সুরচনা হইয়াছে কি না! এমন কি, একটা in এবং to শব্দের স্থানান্তর সংঘটন-সম্বন্ধে বহুযত্নে, বহু সময় ধরিয়া লিখিত প্রায়—সমাপ্ত পত্রখানিও মুহূর্ত্তে শতছিন্ন হইয়া পড়ে,—এ অবস্থায় কি চিঠি শেষ হয়? এই চিঠি লিখিতে বসিয়া প্রথম আমি মাতৃভাষার সহজ গৌরব উপলব্ধি করিলাম। দশ এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রীতিমত যা বাঙ্গালা শিখিয়াছিলাম, তাহার পর কলিকাতা আসিয়া লোরেটোতে ভর্ত্তি হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা চর্চ্চার মধ্যে প্রধানতঃ কথা কহা, দ্বিতীয়তঃ মাঝে মাঝে ভাল উপন্যাস কবিতা পাইলে যা পড়িয়া থাকি; তাহার সংখ্যাও ত নখাগ্রে গণনা করা যায়। কিন্তু তথাপি আমি যদি এ চিঠি বাঙ্গালাতে লিখিতাম, তাহা হইলে কি কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, ভাববাচ্যের সুপ্রয়োগ নিরূপণে, বিশেষ প্রতিশব্দ নিচয়ের সূক্ষ্ম ভাবার্থভেদ বিচারে, --সমাপক অসমাপক ক্রিয়ার স্থিতিগতির বৈচিত্র্য নির্দ্ধারণে অথবা সামান্য একটা অব্যয় শব্দের যথা সন্নিবেশ-চিন্তায় মস্তিষ্ক এতদূর আলোড়িত বিলোড়িত করিতাম! এক কথায় চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ভুলিয়া সুরচনার উদ্দেশ্যে এতটা বিব্রত হইয়া পড়িতাম—অথবা শব্দ, ভাষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাহা বলিবার আছে, বিনাড়ম্বরে সহজ-ভাবে সেইটুকু বলিয়া লইয়া চিঠিখানি ডাকে ফেলিয়া দিয়াই যথেষ্ট সন্তোষলাভ করিতাম? বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালা ভুল করিলে তাহাতে আমাদের লজ্জা করে না—কিন্তু ইংরাজীর একটা সামান্য ভুলে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই! বিপদে পড়িলেই মধুসূদনকে মনে পড়ে; সেই দিন আমার জ্ঞান জন্মিল, এই ইংরাজী পত্রখানির জন্য যতটা পরিশ্রম করিলাম, তাহা নিতান্তই বৃথা হইল; কিন্তু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য এতটা পরিশ্রম করিলে আমি বঙ্গদেশের মধ্যে এক জন সুলেখক হইতে পারিতাম না কি? সেই জ্ঞানের ফল আজ পাঠককে উপহার দিতেছি, তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন।

কিন্তু তাহাও বলি—নিতান্তই কি ভাষারই দোষ! মনের দোষ কি ইহাতে কিছুই ছিল না? লোকের যখন বিশেষ কোন হৃদয়ের কথা বলার না থাকে, সে তখন বেশ অসঙ্কোচে অনর্গল বলিয়া বা লিখিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য সত্যই বলিবার কথা বিশেষ কিছু থাকিলেই তাহা তখন বলা দায় হইয়া উঠে, তখনই সে কথা কি ভাবে প্রকাশ

করিব, কিরূপ আকৃতিতে তাহা সুস্পষ্ট অথচ নিখুঁত হইবে—এই চিন্তায়, এই সঙ্কোচে, প্রকাশে শত-সহস্র বাধা আসিয়া পড়ে। তাই একবার মনে হয়—ইংরাজীতে না লিখিয়া বাঙ্গালাতে লিখিলেই কি তাঁহার হাতে পত্রখানি পৌঁছিত ? কে জানে!

সপ্তাহ কাটিতে চলিল, তাঁহার আসিবার সময় হইয়া আসিল ; দিস্তা-দিস্তা কাগজ নষ্ট করিলাম, তবু আমার চিঠি শেষ হইল না। বিরক্ত হইয়া লেখা বন্ধ করিলাম—মনকে বুঝাইলাম, তিনি শীঘ্রই আসিবেন, আর লেখার সময়ই বা কৈ, আবশ্যকই বা কি ? দেখা হইলে মুখেই সব বলিব, চিঠিতে কি অত কথা বলা যায় ? কেন লিখি নাই, কারণ শুনিলে তিনিও ইহাতে কিছু মনে করিবেন না।

এক সপ্তাহ মাত্র তাঁহার মফঃস্বলে থাকিবার কথা—দশ বার দিন হইল, তবু তিনি ফিরিলেন না। দিদি একদিন রাত্রে ডিনার পার্টি হইতে ফিরিয়া পরদিন সকালে আমার সহিত প্রথম দেখা হইবামাত্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার চিঠিপত্র পেয়েছিস ?"

কি জানি, প্রসঙ্গক্রমে যদি দিদি জানিতে পারেন যে, সে চিঠির এখনো উত্তর দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে, একে নিজের মনের জ্বালায় জ্বলিতেছি, তাহার উপর কর্ত্তব্য-ক্রটির উপদেশে ক্ষত স্থান লবণ-জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে, এই ভয়ে আমি কথাটা কোন রকমে এড়াইয়া অন্য কথা পাড়িবার অভিপ্রায়ে বলিলাম,—"গানটান কা'ল কেমন হোল ?"

দিদি বলিলেন—"গাইয়ে লোক কাল তেমন কেউ ছিল না। কুসুমরা সব এখনো ময়মনসিংয়ে—গান জমে কি ক'রে বল ? চঞ্চল একবার টিম টিম ক'রে গাইলে, আমিও গেয়েছিলুম ; কিন্তু মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—মোটেই ভাল ক'রে গাইতে পারলুম না—"

"ডিনার পার্টিতে গিয়ে মন আবার খারাপ হোল কেন ?"

"কি গুজব উঠেচে জানিস, তোর সঙ্গে রমানাথের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, কুসুমের সঙ্গে তার বিয়ে। ময়মনসিংয়ে নাকি তাদের বাড়ীতেই সে ছিল।"

"সেই জন্তেই আর কি গুজবটা উঠেচে। লোকদের ত খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, পরচর্চ্চার একটা সুযোগ পেলে হয়। ত্রেতাযুগে বাল্মীকি রাম-নাম হ'তে রামায়ণ সৃষ্টি করেছিলেন—এ যুগে সে ক্ষমতাটুকু ত কারো নেই,—তাই অহর্নিশি তার চেষ্টাটাই চলেছে। একটা গুজব শুনে তুমি অত মুসড়ে গেলে কেন ?"

"কথাটা নিতান্ত গুজব ব'লে মনে হচ্ছে না,—চঞ্চলের মা'র কাছে সব শুনলুম। তারা নাকি মেয়েকে ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দেবে।"

চঞ্চলের মা কুসুমের কাকীমা। যাতৃ দুই জনের মধ্যে প্রীতি-সম্ভাব কিছুমাত্র নাই,—আত্মীয়তা স্থলে কলহ-বিবাদ হইলে যাহা ঘটিয়া থাকে, কাহারো গুণ কেহ দেখিতে পান না, তিল দোষ পাইলে তাল করিয়া তুলিয়া তাহার সমালোচনায় উভয়ে পরমানন্দ লাভ করেন। আমি বলিলাম,—"তিনি যখন বলেছেন, তখন ত কথাটার মধ্যে কোন সত্য না থাকারই বেশী সম্ভাবনা।"

"কিন্তু শুনেছি, রমানাথ পরশু এসেছে—কা'ল এখানে এল না কেন ? আগে হোলে কি তা করৃত ?"

আমার মনে এখনো তাঁহার ভালবাসার প্রতি পূর্ণবিশ্বাস, তাঁহার বিদায়কালের কাতরোক্তি তখনো মনে সুস্পষ্ট বাজিতেছে, তাঁহার পত্রের প্রীতিময় বাক্য তখনো হৃদয় অনুকম্পিত ব্যথিত করিতেছে, আমি কি বাহিরের সামান্য একটা গুজবে বা একদিন তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সে মহা বিশ্বাস হারাই ? আমি বলিলাম, "দিদি, তুমি যেন কি ? কাল আসতে পারেন নি, আজ আসবেন এখন, তাতে আর এতই হয়েছে কি ? কিছুদিন আগে তাঁর সৌজন্যে তোমার এতটা গভীর বিশ্বাস ছিল—আর সামান্য একটা গুজবে সমস্ত হারিয়ে ফেল্লে। যদি তাঁর ভালবাসা মিথ্যা না হয়, তা হ'লে এ গুজব সত্য হ'তে পারে না। আর গুজবটা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে ত তাঁর ছলনা হ'তে মুক্তি পাওয়া গেল। তাতে দুঃখ করার কি আছে বল ?"

দিদি চুপ করিয়া গেলেন। ভক্ত ঐশ্বরিক প্রেমে বিশ্বাস করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, আমি তাঁহার প্রেমে বিশ্বাস করিয়া যেন সেইরূপ আনন্দপূর্ণ

হইলাম। যিনি ভুক্তভোগী, তিনিই মাত্র জানেন—এ ভক্তি-বিশ্বাস জগতে কিরূপ অমূল্যধন, এ বিশ্বাস কি পরমানন্দ! অপ্রেম হৃদয়ে ইহাতে প্রেম ফুটায়; সপ্রেম হৃদয় ইহাতে চির-প্রেমময় হইয়া উঠে, আর এই বিশ্বাসের অভাবে প্রজ্বলন্ত প্রেমও ক্রমে নিস্তেজ, নির্ব্বাপিত, শীতল হইয়া পড়ে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:*:—

ডিনারে রাত জাগিয়া দিদি তাঁহার ঘরে দিবা-নিদ্রায় মগ্না ছিলেন, আমি ড্রয়িংরুমে জানালার পাশে ইজিচেয়ারে বসিয়া নভেল পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু কিছুতেই তাহাতে মন বসিতেছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে পরীক্ষার রাশি রাশি পাঠের মধ্যেও ফাঁকি দিয়া যখন নভেল শেষ করিতাম—তখন মনে হইত, সারা জীবন যদি উপন্যাসের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবনের পরম ও চরম সুখ লাভ হয়--আমি আর সংসারে অন্য কিছু চাহি না। কত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের সুখের কল্পনা পরিবর্ত্তিত হয়! এক বৎসরও তাহার পর অতীত হয় নাই!

চোখের উপর খোলা কেতাব—যন্ত্রের মত হরফ-গুলি নিঃশব্দে আওড়াইয়া যাইতেছি, অথচ খানিক পরে, আত্মস্থ হইয়া দেখিতেছি, এক অক্ষরও তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই—আসলে পড়িতেছি না, ভাবিতেছি, কিন্তু কি ভাবিতেছি, তাহারও একটা ঠিক-ঠিকানা নাই; অস্পষ্ট অসংযত বিশৃঙ্খল ভাবনা—মনের মধ্যে একটা কেমন অশান্ত বিদ্রোহী বাসনা, উপস্থিতের উপর বিতৃষ্ণা, অনুপস্থিতের জন্য আগ্রহ, কিন্তু সে অনুপস্থিত যে কি, তাহার আকৃতি কিরূপ, স্থিতিই বা কোথায়, তাহা সে ভাবনার মধ্যেই নাই। মাঝে মাঝে এক একবার পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টি পড়িতেছিল—উদার শুভ্র সৌন্দর্য্যদৃশ্যের মধ্যে আমার উদাসচিত্ত স্বপ্নের মত যেন, সহসা আবার তাহা হইতে যেন জাগিয়া উঠিয়া পুস্তকে চক্ষু ফিরাইতেছিলাম। ঠুং ঠুং করিয়া চারিটা বাজিল, আকাশে চাহিয়া দেখিলাম, সুন্দর লাল মেঘের শোভা; সমুদ্র মনে পড়িল, এই প্রশান্ত সুরঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া কটকে যাইবার পথে ঝটিকা-তরঙ্গিত যে ভীম সমুদ্র দেখিয়াছিলাম, তাহাই মনে পড়িল, কে জানে এ দৃশ্যের সহিত তাহার কি যোগ? অমনি বহুপূর্ব্বে পঠিত একখানি উপন্যাসের কয়েক লাইনও মনে পড়িয়া গেল—"In hertain places and certain periods the aspect of the sea is dangerous—fatal; as at times is the glance of a woman," যখন পড়িতেছিলাম,তুলনাটা বেশ ভাল লাগিয়াছিল, তাই বোধ হয়, স্মৃতির কোণে ইহা সুপ্ত ছিল—আজ সহসা জাগিয়া উঠিল। যদিও বইখানির নাম কিংবা তখন ইহার কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছিলাম, তাহার কিছুই এখন মনে পড়িল না। ভাবিলাম, সমুদ্রের সহিত যে দৃষ্টির তুলনা হয়, তাহা অবশ্য ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি হইবে, স্ত্রীলোকের সক্রোধ দৃষ্টি কি পুরুষের নিকট এই ভয়জনক? আমি ত পুরুষ নই, সে ভাবটা ঠিক আত্মস্থ করিতে পারিলাম না, কেবল পুরুষের কাপুরুষতা ভাবিয়া মনে মনে একটু হাসির উদ্রেক হইল। কই, আমি ত পুরুষের এমন ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি ক্রুদ্ধভাব কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে আমাকে ভয়কম্পিত অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তোলে। আমাকে ত লোকে এত কোমলস্বভাব বলিয়া জানে, বাস্তবিকই আমি অল্পেতেই আর্দ্র হই, পরদুঃখ দেখিতে পারি না, বিশেষতঃ ভালবাসা স্থলে সহজেই নিজের প্রবল ইচ্ছাও বিসর্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু ক্রোধে কি আমাকে বশ করিতে পারে? সে দিন যদি তিনি আমার কথায় রাগ করিয়া রূঢ়বাক্যে আমাকে অভিসম্পাত দিতেন, প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া শাসাইতেন, তাহা হইলে কি তাহার বেদনা আমি অনুভব করিতাম, না তাহা নিবারণের জন্যই এত ব্যাকুল হইতাম? সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা অভক্তিরই উদ্রেক হইত, প্রেমের আশঙ্কাই প্রবল আশঙ্কা। যে ভালবাসে, যাহাকে ভালবাসি—তাহাকে ব্যথা দিয়ে প্রাণে যেমন বাজে, এমন আর কিসে? ক্রুদ্ধদৃষ্টি নহে, প্রেমময় করুণদৃষ্টিই প্রকৃত পক্ষে fatal-dangerous তাঁহার বিদায়কালে সেই সকরুণ দৃষ্টি মনে জাগিল। লেখকও যে শেষ অর্থে এ তুলনা ব্যবহার

করিয়াছেন, তাহাতে আমার আর তখন সন্দেহ রহিল না। সময়ে সময়ে জোয়ার আসিয়া শুষ্ক তীরস্থিত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যেমন সহসা ভাসাইয়া লইয়া যায়—এই সকরুণ দৃষ্টিও সেইরূপ নিঃশব্দে হৃদয় অধিকার করে—তখন লোকে বিপদ জানিয়া শুনিয়াও আর ফিরিতে পারে না, অধিকাংশ সময় ফিরিতে চাহেও না, ইচ্ছা করিয়া তাহাকে আপনাকে ভাসাইয়া দেয়, সেই জন্যই ইহা অধিক ভয়জনক।

জুতার শব্দে চিন্তাভঙ্গ হইল, চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম, তিনি। তাহার ভাব তেমন সহাস্য নহে, গম্ভীর বিষণ্ণ ভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া নীরবে হাত বাড়াইয়া দিলেন, নীরবে সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া নিকটের একখানি চৌকিতে বসিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমিও দামিয়া গেলাম, বুঝিলাম, চিঠি না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, অথচ, তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখিলে আমি যেরূপ সহজভাবে সব খুলিয়া বলিতে পারিতাম, এখন তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় কি শত ইচ্ছাতেও কথা ফোটে!

কিছু পরে তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার চিঠি পেয়েছিলেন আশা করি?" সম্বোধনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার এই অনাত্মীয় ভাব, অননুতপ্ত শীতল-কঠিন ভাষা, আমার হৃদয়কে কেমন তুষারজমাট করিয়া আনিতে লাগিল; আমিও অস্বাভাবিক রুদ্ধ-গম্ভীর স্বরে বলিলাম—"পেয়েছি, শীঘ্র আসবেন ব'লে উত্তর দিই নি।"

"উত্তর কি এখন প্রত্যাশা করতে পারি?"

"অবশ্যই পারেন।" আমিও ত বলিবার জন্য প্রস্তুত, কিরূপে সমস্ত খুলিয়া বলিব, এতদিন ধরিয়া অনবরত মনে মনে তাহার রিহার্‌সেল দিয়া আসিতেছি, অথচ এখন বলিতে গিয়া দেখিলাম, বলা কত কঠিন! কি যে বলিব—কি কথা হইতে আরম্ভ করিব, কিছুই মনে করিতে পারিলাম না, মাথার মধ্যে কথার রাশি এলোমেলো ভাবে সবেগে ঘুরপাক খাইতে লাগিল। ঘূর্ণ মস্তিষ্ক রুদ্ধাবেগ লইয়া আমি বলিলাম, "আমি—আমি কি বল্‌ব আপনার দোষ।—"

তিনি বলিলেন, "এখনো সেই ভাব,—সেই উত্তর—আমারই দোষ!"

আমি যদিও তাহা বলিতে যাই নাই—বলিতে গিয়াছিলাম, আপনার দোষ নাই—আমার দোষ ইত্যাদি; কিন্তু কথাটা এইখানেই তিনি ধরিয়া লইয়া উত্তর করিলেন। উল্লিখিত কথার পর বলিলেন, "দোষ আমারি তবে হ'ক, কিন্তু এ দোষ জেনেও কি আমাকে বিবাহ করতে পারবেন? আমি নিতান্তই স্বার্থপর হয়ে এ কথা বলছি মনে করবেন না। এ বিবাহ ভেঙ্গে গেলে আপনার পক্ষেও কিরূপ ক্ষতি, তা বিবেচনা করবেন। আমি ভালবাসি, না বিবাহ হ'লে আমার কষ্ট হবে, এরূপ ভেবে মতামত স্থির করবেন না, নিজের মঙ্গলামঙ্গল ভেবে যা ভাল, তাই স্থির করুন।"

কথাটা খুবই নিঃস্বার্থ ভাবের কথা, কিন্তু আমার সমস্ত প্রকৃতি ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যে কারণে আমি তাঁহার সমস্ত দোষ ভুলিয়াছিলাম,—সে কারণ ইহার মধ্যে কোথা? এই আশপাশ-আঁটা বুদ্ধি-বিবেচনা-যুক্ত কথার মধ্যে প্রেমোচ্ছ্বাস ব্যাকুলতা কই? তবে যে গুজব শুনা গিয়াছে, তাহা কি সত্য? কয়েক হাজার সামান্য রৌপ্য-মুদ্রা তাঁহার প্রেম জয় করিয়াছে? আমার নিদ্রিত গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল, আমি অসঙ্কোচে সুস্পষ্ট-স্বরে বলিলাম, "আমার ক্ষতির জন্যে আমি ভাবি নে—আপনারো ভাববার আবশ্যক নেই,—সুবিধার জন্য আমি বিবাহ করতে চাই নে—আপনার সুখ যখন এর উপর নির্ভর কচ্ছে না—তখন আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করি।"

তিনি শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "তবে তাই হোক।"

নবম পরিচ্ছেদ

—:০:—

দিদি সব শুনিয়া আমার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন,—আমাকে দোষ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"এখন বোঝা যাচ্ছে, কুসুমের সঙ্গে তার বিয়ের গুজব উঠেছে কেন, তোরই দোষে দেখছি তা ঘটেছে। আমি কি ক'রে জানব—ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড হয়েছে। আমি ভাবছি—ভালয় ভালয় সব গোলযোগ মিটে গেল—বাঁচা গেল। মিটমাট যে শুধু তোর মনে মনে, তা ত আর বুঝি নি তখন; সে বেচারাই বা কি ক'রে তা বুঝবে বল? প্রথমে

ত তাকে স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিলি বিয়ে করবিনে, তার পরে সে তার জীবন-মরণ মিনতি জানালে যখন, তখনও একটি কথা কইলিনে, মফঃস্বলে গিয়েও সাধ্যসাধনা ক'রে চিঠি লিখলে, চিঠির এক লাইন উত্তর পর্য্যন্ত দিলিনে, এতে মানুষ কি ভাবে বল দেখি? তার ত মানুষের প্রাণ—না সে পাথর? এত উপেক্ষার পর তবুও যে সে আবার এ বাড়ীতে এসে তোর সঙ্গে দেখা ক'রে বিয়ের সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেছে, এতে আমি ত তাকে খুবই ভাল বলি, তার ভদ্রতা সৌজন্যের পরিচয় এতে খুবই পাওয়া যাচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "তা হ'তে পারে—কিন্তু যে রকম ক'রে তিনি মত জিজ্ঞাসা করেছেন, তাতে ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যাচ্চে কি?"

"ভালবাসার অভাব আমি ত এতে কিছুই দেখছিনে। হাজার ভালবাসলেও যদি জানা যায়, সে আমাকে চায় না—তা হ'লে যার একটু আত্মসম্মানজ্ঞান আছে সে কি আর প্রেমের দোহাই দিয়ে কথা কইতে পারে?"

"কিন্তু তিনি যখন বল্লেন—এ বিয়ে না হ'লে আপনার কিরূপ ক্ষতি, তাই বিবেচনা ক'রেই বিয়ে করা না করা স্থির করুন,—আমি ভালবাসি—বা না বিয়ে হ'লে আমার কষ্ট হবে, এরূপ ভাববেন না—তখন কি আমি বলব নাকি—হ্যাঁ, আপনি ভাল বাসুন বা না বাসুন, তাতে কিছু আসে যায় না, আমার মঙ্গলের জন্যই আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত! তাঁরই আত্মসম্মানজ্ঞান আছে—আর আমার কিছুমাত্র নেই!"

"তুই-ই তার প্রতি অন্যায় করেছিস্, তার মনে আঘাত দিয়েছিস্, সে জন্য তুই যদি নিজের ভুল, নিজের দোষ স্বীকার ক'রে তার কষ্ট দূর করতে যেতিস্, তা হ'লে তাতে কি ক'রে যে তোর আত্মসম্মানের হানি হোত, তা ত আমি বুঝতে পারিনে। তবে সত্যি যদি একেবারে অভিপ্রায়েই সে তোকে অমন ক'রে ব'লে থাকে, তা হ'লেও তাকে সে কথা স্পষ্ট ক'রে বলবার অবসর দেওয়া উচিত ছিল। এখন দাঁড়াচ্ছে এই,—তোর ইচ্ছা নেই ব'লেই বিয়েটা ভাঙতে সে বাধ্য হোল; দোষটা সমস্ত এক তরফেরই।"

আমার দিক্‌টা দিদির কিছুতে চোখ পড়িল না। তিনি কেবল দেখিতে লাগিলেন,—আমিই তাঁহাকে অন্যায়রূপে উপেক্ষা করিয়া অকারণে আমার নিজেরই সুখসৌভাগ্য বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি! সুপাত্রে ন্যস্ত হওয়াই কন্যাজীবনের চরম সৌভাগ্য, পরম সার্থকতা। গুণবান্ স্বামীর সোহাগে যে সোহাগিনী—তাহার নিকট অন্য আকাঙ্ক্ষনীয় প্রার্থনীয় বিষয় আর কি আছে? স্বামীর সোহাগের শত দুঃখও দুঃখের নহে আর ইহার অভাবে তাহার জীবন জন্ম নিতান্তই দুঃখময় নিরর্থক বলিয়া অনুভূত। দিদি তাঁহার এই স্ত্রী-স্বভাবসুলভ দৃষ্টি দিয়া এখন কেবল এক পক্ষই দেখিতেছেন,—তিনি আমার কিরূপ উপযুক্ত পাত্র, তিনি আমাকে কিরূপ ভালবাসেন, তাঁহাকে বিবাহ করিলে আমি কিরূপ রূপবান্ গুণবান্ স্বামীর প্রেমে সুখী হইতে পারিতাম, আর আমাদের মিথ্যা ছেলেমানুষী সেন্টিমেন্টের চাপল্যে তাঁহাকে এবং তাঁহার সেই অমূল্য প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কিরূপ ঈর্ষণীয় অবসর হারাইতেছি। এ অবস্থায় আমার মনোভাবের গাম্ভীর্য্য কি করিয়া প্রকাশ করি,—কি করিয়া দিদিকে বুঝাই, তাঁহার ওরূপ করিয়া বলার পর আমার আর ভুল-স্বীকারের পথ ছিল না, তখন দোষ স্বীকার করিলে আমার হীনতাই প্রকাশ পাইত। দিদির স্নেহ হইতেই যদিও এই কঠোরতা—এই নির্ম্মমতার জন্ম, কিন্তু আমি কি তখন সেই স্নেহ, সেই মমতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম,—না তাহা করিলেও তাহাতে আমার ব্যথা লাগিত না? দিদির এই সহানুভূতিহীন দোষারোপে আমার প্রকাশের শক্তি পর্য্যন্ত কমিয়া আসিতে লাগিল, অশ্রুজলে অবরুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃই ভাষার শক্তি—ভাষার স্বর ক্ষীণতর হইয়া পড়িতে লাগিল।

আমাদের দুজনের বাগ্‌বিতণ্ডা শেষ না হইতে হইতে ভগিনীপতি আসিয়া বিস্ময়-ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "কুমু! what is this?" বলিয়া একখানা খোলা চিঠি দিদির কোলের উপর ফেলিয়া দিলেন! দিদি নীরবে চিঠিখানা পড়িয়া আমাকে দিলেন। অক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম—তাঁহার চিঠি। পড়িয়া দেখিলাম, যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের বিবাহভঙ্গের কথা এবং আমার ইচ্ছাক্রমেই এরূপ হইয়াছে, তাঁহাকে যেন দোষী না করা হয়,—এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ।

চিঠি পড়া আমার তখনও শেষ হয় নাই—ভগিনীপতি বলিয়া উঠিলেন—"Blackguard! Rascal! Scoundrel মিস্ করকে বিয়ে কর্ত্তে চায়—তাই এই সব excuse! I will bring a suit against him I will upon honour!"

দিদি বলিলেন, "তা পার কই, যা বলেছে, তা ত আর মিথ্যা বলে নি; মণির কথাতেই ত বিয়ে ভেঙ্গেছে।"

"মণির কথাতেই বিয়ে ভেঙ্গেছে? You mean মণির ইচ্ছাতে? বিলাতে সেই engagement ব্যাপার নিয়ে? তুমি ত বলেছিলে সে সব মিটমাট হয়ে গেছে! Is she mad or what new freak of hears is this now?"

"আমি তাই ভেবেছিলুম যে, মিটমাট হয়ে গেছে, কিন্তু এখন দেখছি ঠিক মেটেনি।"

"Oh Frailty thy name is woman!'—কথাটা দেখছি খুবই ঠিক! সামান্য অপরাধে এত কেন? এই ত তোমাদের শিক্ষার উদারতা! স্বাধীনতার ফল! I dont know what to do, I think I shall go mad."

এইরূপ তিরস্কার, এইরূপ অপবাদ নীরবে আত্মসাৎ করিতে আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, আমার দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু সমস্ত অবস্থা জানিলে ভগিনীপতিও কি এ দোষ অমার্জ্জনীয় ভাবিতেন; তাঁহার পুরুষের দৃষ্টিতেও কি ইহার মার্জ্জনীয় দিক্ প্রকাশিত হইত না? কিন্তু কি করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলি? দিদিকে বলা আর তাঁহাকে বলা ত আর এক কথা নহে। তথাপি আমি প্রাণপণে বলসংগ্রহ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলাম, "আমি কি কর্ব্ব! তিনি যখন বল্লেন—বিবাহ না করলে আপনার ক্ষতি হবে কি না, কেবল তাই বিবেচনা ক'রেই স্থির করুন, বিবাহ করবেন কি না—তখন আমি আর কি বল্ব? তিনি যদি এর চেয়ে একটুখানি কোমলভাবে, একটুখানি হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা আমাকে জানাতেন, তা হ'লে আমি কি অগ্রাহ্য করতে পারতুম?"

ভগিনীপতি বদ্ধভ্রুকুটি হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি, আপনার ক্ষতি হবে কি না ভেবে স্থির করুন! If this a proposed! I see there is a trick in it!"

দিদি বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আসল ব্যাপার আগে শোন! মফঃস্বলে যাবার আগে সে নিতান্তই অনুনয়-বিনয় ক'রে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল, তাতে একটা আশার কথা শোনে নি। মফঃস্বল থেকেও সাধ্যসাধনা ক'রে চিঠি লিখেছিল; কিন্তু তারও এক লাইন উত্তর পর্য্যন্ত পায় নি। এর পরে মানুষ আবার কি ক'রে তবুও feeling দেখায় বল? তারও ত সহ্যের একটা সীমানা আছে। আমি বলি, তুমি তাকে স্পষ্ট ক'রে তার মনের ভাব জিজ্ঞাসা কর,—যদি বাস্তবিক তার এড়াবার ইচ্ছা হয়—তাও বুঝবে—আর যদি উভয়তঃ ভুল বোঝার জন্য এরূপ ঘটে থাকে, তাও সহজে মিটে যাবে—"

আমি আস্তে আস্তে সজলনেত্রে দিদিকে বলিলাম, "দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তাঁর কাছে আর এ কথা পাড়তে বলো না; এ কি কেনা-বেচা যে, আপনার সুবিধা বুঝে ক্রমশঃ দর কমাতে হবে? যদি তিনি সত্যি ভালবাসেন ত তিনিই আবার বল্‌বেন। বারণ করো—তাঁকে কোন কথা বল্‌তে।"

ভগিনীপতি চিন্তিতচিত্তে গৃহে পদচারণ করিতেছিলেন; আমার কথায় দিদি কোন কথা কহিবার আগেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, Well! আমি কি করব, ঠিক বুঝতে পারছিনে! I am disgusted with the whole thing I must say দেখা যাক, সে আপনা হ'তে আর কিছু বলে কিনা; এ দিকে আমিও তার সম্বন্ধে যতটা পারি সব information নেব এখন। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কা'ল টেনিসে আসতে বলেছি, বিলাতের ব্যাপারটাও তাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে—তা হ'লে লোকটার ভাব অনেকটা ঠিক ধর্‌তে পারব। কিন্তু কথা হচ্ছে আর একটা, কা'ল বারলাইব্রেরীতে ঢুকব কি ক'রে?"

দিদি বলিলেন, "আমি ভাবছি বাবার জন্যে। তাঁর কানে কথাটা উঠলে তাঁর না জানি কিরূপ কষ্ট হবে।"

আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম, এত ভাবনার মধ্যে সেই ভাবনাতেই আমাকে অধিকতর কাতর করিয়া তুলিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

—*—

চারিদিকেই অশান্তি, অসুখ, নিরানন্দ ভাব। দিদি স্তব্ধ, গম্ভীর, ভগিনীপতি অকারণ ক্রুদ্ধ, ভৃত্যদিগের প্রতি অযথা ভর্ৎসনাপরায়ণ, দাসদাসীগণ শশব্যস্ত, ত্রস্ত, ভীত, এমন কি, বাড়ীর গাছপালা, দরজা প্রভৃতি অচেতন জড়পদার্থগুলা পর্য্যন্ত যেন তাহাদের স্বাভাবিক প্রিয়দর্শনতা-শূন্য, সমস্ত বায়ুমণ্ডলে কেমন যেন একটা স্তব্ধ অস্বস্তি, বিষাদবিকম্পিত। আমিই ইহার কারণ, আমার মনে কি অন্ধকার গুরুভার! এমন দিনে আবার পিসীমা তাঁহার কন্যা প্রমোদাকে লইয়া এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনে আসিলেন। মনের ভাব মনে চাপিয়া আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদের মনোরঞ্জনে তৎপর হইলাম। প্রমোদা প্রশ্নে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল, "কি হইয়াছে? এত রোগা কেন? এমন বিমর্ষ শুক্‌নো কেন? তিনি মফঃস্বলে গিয়াছেন বলিয়া বুঝি? শীঘ্রই আসিবেন, সে জন্য এতটা কেন? বিবাহ ত হইবেই, একটু কি সবুর সয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এখন আর সেকাল নেই, অন্যান্য অনেক আচার অনুষ্ঠানের ন্যায় সখীদিগের নিকট মন খুলিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করিবার প্রথাও নিতান্ত পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, এ কালের মেয়েদের মনের দুঃখ সহজে মুখে ফুটিতে চাহে না; বিশেষতঃ এমনতর দুঃখ, ইহা ত কিছুতেই প্রকাশের নহে, আমি মনের কথা মনে রাখিয়া কাষ্ঠহাসি এবং বাক্‌চাতুরীতে তাঁহাকে ক্রমশঃ নিরুত্তর করিলাম।

বেলা কাটিল, টেনিসের দল সমাগত হইলেন, বাহিরের ও বাড়ীর লোকে মিলিয়া আমরা সবশুদ্ধ দশজনে বাগানে সমবেত হইলাম। যদিও একটি মাত্র কোর্ট, কিন্তু লোক অধিক না হওয়ায় তাহাতে খেলার তেমন অসুবিধা হইল না। পিসীমা খেলেন না—আমিও শারীরিক অবসন্নতার দোহাই দিয়া প্রথম হইতেই দর্শক-শ্রেণীভুক্ত, অন্যেরা একদলের বিশ্রামে অপরদল খেলিতে লাগিলেন।

ডাক্তারও আসিয়াছিলেন, খেলার অবসরে নিকটে আসিয়া বসিলেন, স্বাভাবিক মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনাকে ভারী দুর্ব্বল মনে হচ্ছে! আপনার দিদি বলছিলেন, আপনি ভারী careless, স্বাস্থ্যের দিকে আপনার মোটেই নজর নেই, নভেল পেলে খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে যান।"

আমি বলিলাম, "কই! আজকাল ত পড়া-শুনা একরকম ছেড়ে দিয়েছি বল্লেই হয়।"

প্রমোদা আমার কাছে বসিয়া ছিল, সে বলিল, "পড়াশুনা ছেড়েছে কি না, জানি না, তবে খাওয়া-দাওয়া যে ছেড়েছে, তার সাক্ষী আমি দিতে পারি। ডাক্তার মহাশয় ওকে একটা ওষুধ দিন না।"

ডাক্তার বলিলেন, "gladly! আজই একটা প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে দেব এখন, কিন্তু খাবেন ত?"

আমি গল্প করিতেছিলাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি ছিল টেনিস খেলার দিকে, ডাক্তারের প্রশ্নে আমি একটু হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তাঁহার দৃষ্টি স্নেহপূর্ণ, অতি মধুর, তাহাতে আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত ভরিয়া গেল, ব্যথিত অন্তরদেশ হইতে ধীরে ধীরে, সুখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিল, হৃদয়ের পাষাণভার দ্রব হইয়া অশ্রুতে উথলিয়া উঠিতে চাহিল, কণ্ঠাগ্রে এই কথাগুলি আসিয়া আবার মিলাইয়া পড়িল, "আপনার ওষুধে কি আমার মনের অসুখ তাড়াতে পারবেন?"

মনের কথা মনে, চোখের জল চোখে চাপিয়া নতমুখী হইলাম। এই সময় তাঁহার ডাক পড়িল। "I say Doctor,—come on. You are wanted here to make up a new sect."

তিনি ইহাতে কোন উত্তর না করিয়া আমাকে বলিলেন, "আরবারে আপনাকে যে টনিক দিয়েছিলুম, তাতে কি উপকার হয়েছিল? কত দিন"—

ভগিনীপতি আবার ডাকিলেন, "I say come on"—চঞ্চল নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি আসবেন না? আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।" তিনি একটু যেন থতমত খাইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—

"I am really making you all wait? Oh it is too bad of me."

বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন। প্রমোদা বলিল, "ডাক্তার খুব ভাল লোক;—ভাল না?" আমি কোন উত্তর করিলাম না। তীব্র রোগা-বসানে দুর্ব্বল দেহমনে নবস্বাস্থ্যের সঞ্চারে আবার

জগতের দিকে চাহিয়া, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহাদর অনুভব করিয়া যে অবসাদময় স্বপ্নময় সুখ, তাহার আস্বাদ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই আমার তখনকার মনের অবস্থা অনুভব করিতে পারিবেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

—*—

অন্য সকলে চলিয়া গেলে ভগিনীপতি ডাক্তারকে ডিনারে থাকিতে বলিলেন। সন্ধ্যার পর আমরা গৃহকর্ম্ম সারিয়া ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি একাকী টেবিলের নিকট বসিয়া আমার সেই পরিত্যক্ত নভেলখানি লইয়া পড়িতেছেন। আমরা একেবারে নিকটে আসিতে তাঁহার যেন হুঁস হইল, বইখানি বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দিদি বলিলেন, "বসুন। এমন অজ্ঞান হয়ে কি পড়ছিলেন? মিডলমার্চ্চ? আমরা এসে ত আপনার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গালুম না?"

আমরা উপবিষ্ট হইলে ডাক্তারও বসিলেন, বসিয়া ঈষৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার সুকোমল, পাণ্ডুবর্ণ, বালোপম, মসৃণ চিবুক ও কপোল-প্রান্তস্থ কর্ণমূল-বিলুণ্ঠিত আকুঞ্চিত বিরল শ্মশ্রুগুচ্ছে বামহস্তের অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিতে করিতে, সূক্ষ্ম স্বর্ণরজ্জু-গ্রথিত আইগ্লাসের মধ্য হইতেই আমাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "মাপ করবেন, সত্যিই এ একটা আমার ভারী Weakness; জর্জ্জ এলিয়েটের নভেল একখানি হাতের কাছে পেলে আর লোভ সামলাতে পারি নে। দেখুন না, এই বইখানা কতবার পড়েছি—তার ঠিক নেই,—তবুও এখন মনে হচ্ছিল,—যেন নতুন বই পড়ছি, নতুন জ্ঞান—নতুন আনন্দের মধ্যে ডুবে আছি। আপনি অবশ্য পড়েছেন বইখানি?"

দিদি। পড়েছিলুম অনেকদিন আগে; মন্দ লাগেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে যে লম্বা-লম্বা লেক্‌চার—সেইগুলোতে কেমন যেন প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

ডাক্তার। হ্যাঁ, তাতে গল্পের interest তেমন নেই বটে, কিন্তু লেখকের Ideal তা থেকে বেশ স্পষ্ট মনে বসে। বলতে কি, জর্জ্জ এলিয়েটের একটি লাইনও আমার বাদ দিতে ইচ্ছা করে না, অনাবশ্যক বা অপ্রীতিকর ব'লে মনে হয় না, যে পাতই ওল্টাই, যেখানে থেকেই পড়ি—পড়তে পড়তে একটা অনন্ত সহানুভূতির ভাবে হৃদয় যেন সতেজ হয়ে উঠে—পৃথিবীর জীবনসমষ্টির মধ্যে নিজেকে অতি ক্ষুদ্রবল মনে হয়—এবং সেই মহা-সমষ্টিতে আপনার সুখদুঃখ বিসর্জ্জন দিয়ে সুখী হ'তে ইচ্ছা করে।

দিদি। আপনি কি বলেন! মিডলমার্চ্চের হিরোইন ত দুবার বিয়ে করেছিল? আত্মত্যাগের কি চূড়ান্ত আদর্শই তাতে দেখালে!

ডাক্তারের ওষ্ঠাধরে একটু যেন হাসির রেখা দিতে না দিতে মিলাইয়া পড়িল, তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনারা হয় ত ভুলে যান, নভেলিষ্ট আর নীতিশিক্ষক এক নন। তিনিও নীতিশিক্ষা দেন বটে—কিন্তু তাঁর প্রণালী স্বতন্ত্র, তিনি চিত্রকর। বিশ্বের অভঙ্গ অব্যর্থ নিয়মের মধ্যে, সমাজের ভঙ্গপ্রবণ ক্ষণিক নিয়মের মধ্যে নিয়তির এবং স্বভাব-চক্রের গতিতে চরিত্রভেদে মানুষ কিরূপ বিচিত্র মূর্ত্তিতে ফুটে ওঠে—তাই ছবির মত এঁকে দেখানই নভেলিষ্টের কাজ। জর্জ্জ এলিয়েট মানুষের মনুষ্যত্ব ছুঁতে চান না, তাকে জড় বা দেবতা করিতে চান না। সহানুভূতিতে, ভালবাসাতে সেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে চান মাত্র। ডরথিয়া ideal রাজ্যেই বাস করে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই অসাধারণ; সত্য জগতের সংস্রবে এরূপ স্বভাবের লোক কিরূপ ভুল করে, লেখক তার ছবিতে তাই দেখিয়েছেন। তার জীবনের এই failureএর মধ্যেও কি খুব একটা pathos নেই?

দিদি। তার উপর মমতা হয় বটে, কিন্তু ভারি রাগ ধরে—আবার শেষে ও অমন একটা অপদার্থকে ভালবাসলে?

আমি বলিলাম,—"কেউ কেউ বলেন, ডরথিয়া, ম্যাগি, নাকি লেখিকার চরিত্রের ছায়া?"

ডাক্তার বলিলেন,—"এইরূপ শোনা যায় বটে। তাঁর জীবনের উচ্চতম আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শে তিনি যেমন বিফল—"

ভগিনীপতি আসিয়া পড়ায় কথাটা থামিয়া গেল। দিদি বলিলেন, "এত দেরী যে!"

ভগিনীপতি বলিলেন,—"মকেলটাকে আর

কিছুতে তাড়াতে পারি নে! discussion চলেছে যে—তর্ক এগিয়েছে? Oh! she is a great creater we must admit that, I am sorry to say."

ডাক্তার। What a reluctant admission? Does not you man's nature take delight in glorifying such genius in a woman? What a grand intelect she had combined with the sympathetic heart and subject instinct of true woman! মানুষের সামান্য অসামান্য প্রত্যেক কার্য্যটি, তার অন্তর স্বভাবের কিরূপ নিগূঢ় উদ্ভেদ, কিরূপ সূক্ষ্মতম ভাব থেকে প্রসূত, তিনি যেমন তা চুলচিরে দেখিয়েছেন, এমন কোন পুরুষ নভেলিষ্টে পেরেছেন কি?"

ভগিনীপতি। There I quite disagree. Do you mean to say she is as great a genius as Shakespeare, or even modern—

ভগিনীপতির কথা শেষ করিতে না দিয়াই ডাক্তার খুব সতেজে বলিলেন—

"Of course, why not? Though as first I spoke of novelists only,- yet if you choose to bring in Shakespear s name I have not the slightest hesitation in pronouncing her to be as great in her sphere, as Shakespeare is in his."

এমনতর আস্পর্দ্ধাপূর্ণ মূর্খামির কথায় ভগিনীপতিকে নিতান্তই বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

What a monstrous proposition? Quite blasphar mous to my mind. I never heard of such a ridiculous comparison! She is no more a Shakespeare than you are my dear fellow—however cleverly she might have written her novels."

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"Of course she isn't—how could she possibly be Shakespeare! Did I really say such a foolish thing? what I meant to say, and would go on repeating till the end of my life is this that the genius shown in the works of George Eliot is in no way inferior to that of any renowned poet or novelist of England, dead or alive."

ভগিনীপতি। But it comes to the same thing. Well, prove in what way she is as great a creative genius as Shakespeare?

ডাক্তার বলিলেন,—"But the burden of proof lies on you my friend."

এই সময় ডিনারের ঘণ্টা পড়িল, আমরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম! তাঁহাদের বাগ্‌যুদ্ধ যে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়—এই ভাবিয়া আমরা মহাভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম।—দিদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তর্কটা এখন রেখে দিলে হয় না—ডিনারের ঘণ্টা পড়েছে।"

তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কিন্তু ক্ষুধে পাইলে সে যেমন মানুষকে ছাড়িতে চাহে না, তর্ক পাইলে মানুষ তেমনি তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। উঠিয়া দাঁড়াইয়াও ভগিনীপতি বলিলেন,—"You must give me good reasons my dear fellow, or else you must admit that she was not a Shakespeare."

ডাক্তার বলিলেন,—"All right, that I heasily admit. As she was a woman and called George Eliot she could not be a man or Shakespeare either?"

ভগিনীপতি হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"The premises being granted the conclusion must follows as he night the day, that her genious also could not be on a bar with Shakespeare's. Now let us shake hands in the name of Shakespeare who was the principal cause of this never-ending discussion which has nowever ended happily to the satisfaction of all parties. Vivela Shakespeare the great man!"

ডাক্তার ভগিনীপতির হাত সজোরে ঝাঁকাইয়া বলিলেন,—"Vivela George Eliot the great woman!"

ভগিনীপতি। All right? I have no grudge against her you will see. Three cheers for Shakespeare—Three cheers for George to Eliot!"

ডাক্তার। And viceversa. Three cheers for Shakespeare?

দুজনে মিলিয়া ইহার পর একসঙ্গে 'হুরে হুরে' করিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—

"আর আমাদের লেখকেরা বুঝি বাকি থাকিবেন?

দিদি। তা ত বটেই। বঙ্কিমচন্দ্রের জয় সর্ব্বাগ্রে। ভগিনী সুর করিয়া গাহিলেন—

"জয় every ladyর জয়, জয় every gentlemanএর জয়, জয় জয় ভারতের জয়।"

কে জানিত, রুদ্ররস এমন হাস্যরসে পরিণত হইবে, তাঁহাদের উক্ত গানের কোরসে আমাদের ক্ষীণ হাসির কোরস তেমন ফুটিল না, কিন্তু আমরা হাসিতে হাসিতে ভোজনগৃহে সমাগত হইলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

সে তর্কের ঐখানেই সমাপ্তি। টেবিলে বসিয়া অন্য নানা কথা—বেশীর ভাগ বিলাতের গল্পই চলিল। প্রথমে উঠিল, ইংলণ্ডের শীতের কথা, তাহা হইতে বরফে স্কেট করার বর্ণনা। শুনিয়া দিদি বলিলেন—"আমাদের নিতান্তই কৃপার পাত্র মনে করবেন না, এ দেশে ব'সেও আমরা জমাট বরফ দেখেছি। সেই নইনিতালে—কেমন মণি ?"

দিদি ডাক্তারের গল্পের উত্তরে এ কথা বলিলেন—আমিও তাঁহার উত্তরস্বরূপ বলিলাম—"কিন্তু আপনি যে রকম বলছেন, এ সে রকম নয়—এ শুধু বরফের একটা প্রকাণ্ড স্তূপ। দুই পাহাড়ের মাঝখানে, শীতের সময় বরফ পড়েছিল, তারি খানিকটা মাটী চাপা প'ড়ে গরমি কালেও আর কি গলতে পার নি। একটা পাশ শুধু গলে গিয়ে মস্ত একটা বাড়ীর মত দেখতে হয়েছে—সে দিকটা যেন তার খোলা দরজা। এক জায়গায় নীচে থেকে বরফ গলে সুন্দর বরফের সেতু হয়ে আছে।"

দিদি। জায়গাটি কি নিরিবিলি ! কেবল ঝরনার শব্দ ধ'রে ধ'রে আমরা সেখানে পৌঁছেছিলুম।

আমি। বাস্তবিক জায়গাটি বড় সুন্দর। লতা পাতা, ফুল, পাহাড়, ঝরণা, নদী, বরফ প্রভৃতি প্রকৃতির যত কিছু সুন্দর বস্তু—সব যেন একত্র জোট বেঁধে লোকচক্ষু এড়াবার অভিপ্রায়ে সেই একটুখানি অপ্রশস্ত স্থানে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে আপনাদের সৌন্দর্য্য ছড়াচ্ছে। সেই নিভৃত সবুজ পাহাড়ের কুঞ্জে শাদা বরফের ঘরবাড়ী যখন সহসা চ'খে পড়ে—মনে হয়, এ কোন পরীর রাজ্যে এসে পড়লুম।

দিদি। ঠিক বলেছিস ! মণি কিন্তু বেশ বলে। আমি এমন বর্ণনা ক'রে বলতে পারিনে !

এই অযাচিত অকাল-প্রশংসায় লজ্জিত বিরক্ত হইয়া আমি চুপ হইয়া গেলাম,—ভগিনীপতি দিদিকে বলিলেন—"তোমার আর কি আমারি মত দশা। যা দেখেছ, তা এক রকম ভুলে ব'সে আছ, তা বর্ণনা করবে কি বল ?"

দিদি। আমার মনে ত আর দিনরাত মক্কেলের ভাবনা জাগছে না যে, অন্য সব ভুলে ব'সে থাকব ?

ভগিনীপতি। আচ্ছা, বল দেখি, তবে বরফটা কেমন দেখতে ?

দিদি। না, তা কি বলতে পারি ? কিন্তু তোমাকে ত আর আমি পরীক্ষা দিতে বসিনি।

ভগিনীপতি। তবে আমিই পরীক্ষা দিই। কি চমৎকার সাদা ধবধবে ! The sublines, beautifulest, grandest—

দিদি। আর চালাকি করতে হবে না।

ডাক্তার বলিলেন—"২৪ ঘণ্টা হাতে পেয়েও তোমার যে আশ মেটে না দেখছি হে, এই আধ-ঘণ্টা কাউটুকুও দখল করতে চাও। সমস্ত গল্পটা নিতান্তই যে একচেটে ক'রে নিচ্ছ।"

ভগিনীপতি। I beg you pardon I shall keed as quiet as a dummy.

দিদি। সেই ভাল। তুমি চুপ ক'রে থাক, আমরা গল্প করি। বরফটা জানেন, দেখতে আমাদের খাবার বরফের মত মোটেই নয়। বাইরেটা ঠিক যেন তার চুণের গুঁড়ো জমাট বাঁধা—আর ঘরের ভিতরের দেয়ালগুলো মোমের মত চমৎকার মোলায়েম আর একটু কাল কাল। মাটীর সঙ্গে মিশেছে কি না।

ভগিনীপতি। গিন্নীদের আবার তখন খেয়াল হোল—বরফ খানিকটা ভেঙ্গে বাড়ী আনতে হবে।

দিদি। তুমি আর জানো—তবে সে কথা আবার তোল কেন ? আমরা দুবোনে ভাঙতে চেষ্টা করলুম, তা পারব কেন। হাতে কেবল চুণের মত গুঁড়ো উঠে আসতে লাগলো।

ডাক্তার। আমি থাকলে নিশ্চয়ই আপনাদের হুকুম তামিল করতুম—বরফ খানিকটা ভেঙ্গে সঙ্গে আনতুম।

দিদি। (ভগিনীপতিকে) দেখ্‌লে। এঁর কাছে শেখো, মেয়েদের কেমন ক'রে প্রসন্ন কর্ত্তে হয়।

ভগিনীপতি। Good Gods! ওঁর কাছে আমি শিখতে যাব! আমি কি আর আমার সময় ওসব করিনি? বিয়ের আগে হাতে কত কাঁটা বিঁধিয়ে গোলাপ ফুল তুলে দিয়েছি—এরই মধ্যেই সে সব ভুলে গেছ?

দিদি। (সলজ্জে) আচ্ছা বেশ, থাম থাম। (ডাক্তারের প্রতি) তার পর আপনি গল্প করুন। বাস্তবিক নদীনালা বরফে জমাট বেঁধে মাটীর মত শক্ত হয়েছে,—তার উপর দলে দলে সব সুন্দর-সুন্দরীরা পরীর মত স্কেট করছে—সে না জানি কি চমৎকার দেখতে! আপনি বোধ হয় দেখে খুবই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন?

ভগিনীপতি। কি দেখে! স্কেটিং না বরফ,—না সুন্দর-সুন্দরী?

দিদি। সমস্তই। কিন্তু তোমাকে ত আর জিজ্ঞাসা করছিনে।

ডাক্তার। হ্যাঁ, মুগ্ধ হয়েছিলুম বোধ হয়,—হবারি ত কথা।—তবে সে দেশের ভিতরের সৌন্দর্য্য আমাকে এতই মোহিত করেছিল যে, বাইরের কোন দৃশ্য আর তেমন আশ্চর্য্য মনে হয়নি। সেখানে কি অনন্ত স্বাধীনতা, কি অদম্য উদ্দাম উৎসাহ! আমাদের দেশের মত অলস বিশ্রাম যেন তারা জানে না। এক জন দশ জনের কাজও করে, দশ জনের আমোদও করে। আমার কলেজের প্রায় প্রত্যেক ছোকরাকেই দেখতুম—যথাসময়ে লেকচার শোনে—surgical operation শেখে,—পালায় পালায় dutyতে থাকে, রাত জেগে পড়াশুনাও করে,—আবার ফুটবল, হকি, বোটরেস—সকল রকম খেলাতেই যোগ দেয়; ডিনার পার্টি, বল্, থিয়েটার ঘুরতেও বাকি রাখে না। আমি ত তাদের energy দেখে প্রথম প্রথম অবাক্ হয়ে যেতুম।

ভগিনীপতি। নইলে আর ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ার তফাৎ হবে কেন বল?

ডাক্তার। সে দেশে সব কাজেরই এমন একটা সুচারু শৃঙ্খলা যে, তাতে ক'রে কাজও ঢের সহজ হয়ে আসে; আর বেশী কাজও করা যায়। জীবনগুলো সে দেশে যেন ঠিক ঘড়ির কাঁটার চালে চলে। নিমন্ত্রণ খেতেই যাও,—দেখাশুনা করতেই যাও, সব তাতেই যেন ট্রেণ ধরতে যাচ্ছ—এমনি ভাবে সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। কোন একটা engagement থাকলে প্রথম প্রথম আমি এমন অস্থির হয়ে পড়তুম, late হবার ভয়ে হয় ত বা আধঘণ্টা আগে থাকতেই হাজির হয়ে দরজার কাছে পাচালি ক'রে বেড়াচ্ছি।

আমি। বিলাতের গল্প শুনলে আমার এমন সে দেশে যেতে ইচ্ছা করে।

ডাক্তার। আমার ত মনে হয়, শিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ সকলেরি একবার ক'রে অন্ততঃ সে দেশে যাওয়া উচিত। সেখানকার সেই মুক্ত স্বাধীন বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করলেও আমাদের মত নির্জীব জীব নতুন জীবন পায়, তারও যেন জীর্ণ-সংস্কার হয়। সে সব idea এ দেশে ব'সে কল্পনাতেও পোষণ করতেও লজ্জা বোধ হয়, সে দেশে ব'সে সেই সবই সত্য সাধনার বিষয় ব'লে মনে হোত। এখন বলতেও লজ্জা করে, কিন্তু আমারই তখন মনে হোত, আমি একলাই যেন দশটাকে ওলট-পালট করতে পারি। এ দেশের বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলাকে ছুটো কথার জোরে —বারুদের মত তোড়ে ওড়াতে পারি। এখন দেখছি, নিজের বিশ্বাস রক্ষা করাই কত কঠিন—তা আবার দেশশুদ্ধ reform করব!

ভগিনীপতি। বিধাতা আমাদের মেরেছেন—তার উপায় কি? ইংলণ্ডের মত ক্লাইমেট যদি ইণ্ডিয়ার হোত, তা হ'লে আর আমাদের এমন দশা হয়?

দিদি। না, এমন কালোরূপ নিয়েই জন্মাই? শোনা যায়, এক কালে নাকি আমরাও সুন্দর ছিলুম —যখন প্রথমে পঞ্চনদ পার হয়ে এ দেশে বাস করতে আসি! বাস্তবিক যখন সামনের মাঠটায় ইংরাজের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পুতুলের মত মুখগুলি দেখি—তখন আর চোখ ফিরাতে ইচ্ছা হয় না। ভগবান্ আমাদের জাতকে কেন অমন সুন্দর করলেন না? তারা যেখানে থাকে, যেন তারা কোটায়!

ভগিনীপতি। এত দুঃখ কেন? কালো রূপেও ত ভুবন মজেছে। তোমাদের—

দিদি। সুন্দররূপে আরো মজে!

ভগিনীপতি। তা বলা যায় না। কি বল হে? সে সুর্ব্বোয় দেশ থেকেও ত বিনা কোকার জাজা ফিরে এসেছ, এখন দেখ, এ দেশে এসে টাজার

আলোতে স্থির থাক কি না ? আমার দশা ত দেখতেই পাচ্ছ।

দিদি। তা নয় গো তা নয়। সূর্য্যের আলোতে ঝলসে উঠলেই তখন চাঁদের আলোতে ঠাণ্ডা হ'তে আসে। নইলে কি আর দেশকে মনে পড়ে ? বাস্তবিক সে দেশে যেতে যেতেই সবাই কি ক'রে তার নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজন সব ভুলে যায়—আমার ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়।

ভগিনীপতি। আমার কি মনে হয় জান ? সে দেশের এত charm সত্ত্বেও তবুও যে তারা একেবারে দেশ ভোলে না, তবুও যে বাঙ্গালী থাকে, —দেশে ফেরে, বিয়ে না ক'রে ফেরে, আর ফিরেই বিয়ে করে—এইটেই বেশী আশ্চর্য্য !

দিদি। তা যাও না, তোমাকে ত কেউ বারণ করে নি, কেউ ত পা বেঁধে রাখেনি।

ভগিনীপতি। এই এই ! জানছেন কি না, তা হবার যো নেই—একেবারে শিকলী বাঁধা।

তাঁহাদের মানাভিমান চলিল,—আমি বলিলাম, —"তার পর আপনার আর কি ভাল লাগত সে দেশে ?"

ডাক্তার। সব চেয়ে আমার কি ভাল লাগত শুনবেন ? সে দেশের স্ত্রীলোকদের।

ভগিনীপতি। সৌন্দর্য্য ! God heavens ! আমি যে আর এক রকম বোঝাচ্ছি।

দিদি। আপনি ত দিব্যি ! আমাদের মুখের উপর ও কথাটা বলতেও বাধলো না আপনার ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"মাপ করবেন,—কিন্তু ও কথাটা আমি বলিনি—আপনার স্বামী বলেছেন। আমি বলছিলুম—আমার সব চেয়ে ভাল লাগত সে দেশের মেয়েদের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভর ভাব। দিন দিন সে দেশে স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র বাড়ছে—এমন কি, পলিটিক্সে পর্য্যন্ত তাহারা হস্তক্ষেপ করেছে। পুরুষেরা এ জন্য বিরক্তি প্রকাশ ক'রে ঠাট্টা-তামাসা করে—অথচ আসলে এজন্য সম্মানের চক্ষেই দেখে, তাদের হাতের কলের পুতুলের মত নাচে। দেশের উপর—প্রতি জীবনের উপর স্ত্রীলোকের কিরূপ influence এবং এই influence সমাজের পক্ষে কিরূপ আবশ্যক, কিরূপ হিতকর, এর অভাবে আমরা এ দেশে কিরূপ পশুজীবন বহন করি,—সে দেশে না গেলে তা বোঝা যায় না।

আমি। কিন্তু আমাদের দেশের লোক ত আর এ দেশে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেশে না ; আর সেখানে গিয়ে সম্পূর্ণ নূতন রকম অবস্থায় পড়ে, প্রথমটা তাদের কি রকম অবস্থা হয় না জানি ?

ডাক্তার। অন্যের কি হয় জানিনে। আমার কথা আমি বলিতে পারি। আমার বড় শোচনীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। যে সামান্য ভাসতে পারে—তাকে যদি সরু দড়িতে বেঁধে মাঝগঙ্গায় ছেড়ে দেওয়া হয়, তাতে সে যেমন হাবু-ডুবু খেতে খেতে তীরে ওঠে—এও আর কি অনেকটা সেই রকম ব্যাপার।

দিদি হাসিয়া বলিলেন,—"কি রকম ?"

ডাক্তার। না জানি তাদের চাল-চলন, ধরণ-ধারণ, আদব-কায়দা, এমন কি, ভাষা পর্য্যন্ত আমরা শিখেছি বইএর ভাষা,—ফিলজফি পড়েছি, সায়েন্স পড়েছি, হিষ্ট্রী পড়েছি, সে সম্বন্ধে কথা উঠলে বরঞ্চ একঘণ্টা বকে যেতে পারি ; কিন্তু ছোট ছোট সেণ্টেন্সে, প্রশ্নের উপর উত্তরে, কথার উপর কথা ঘুরিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে রসিকতা ক'রে গল্প চালান, তা ত শিখিনি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে nervons এমন awkward feel করতুম। কি কথা কব, ভেবেই পেতুম না। শুধু তাই নয়; এত দিন দেশে মিস্নারী দেখে দেখে সামান্য একটা অ্যাক্সেণ্টের বিশুদ্ধতা ধরে এত হেজাম ক'রে যে ইংরাজী উচ্চারণ শিখেছি—তাতে দেখি লাভ হয়েছে এই যে, ইংরাজী মুখের উচ্চারণ ভাল ক'রে সব বুঝতেই পারিনে। আর এক জ্বালা থেকে থেকে শুনতে পাই—'তুমি অমুককে cut করেছ সে তোমাকে রাস্তায় nod করছিল—তুমি টুপি ওঠাও নি ? Good heavens ! কে আমাকে কখন্ nod করলে। আমি ত কিছুই দেখিনি। প্রতিদিন এই রকম excuse করতে করতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। আসল কথা, একে রাস্তায় কোন দিক্ না দেখে চলাই আমার অভ্যাস—তার পর সাদা মুখগুলো সবই এমন একসা ব'লে মনে হয় যে, বিশেষ আলাপ-পরিচয় না থাকলে এক আধ বারের দেখা-সাক্ষাতে মুখ চিনে নেওয়াই শক্ত। অন্য রকম বিপদও আবার আছে। দোকানে এক পেনির একটা বো কিনতে গিয়ে, ঘরে ফিরে এসে টাকা মিলিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি, এক পেনির জায়গায় অনুরোধের দায়ে

ও পাউণ্ড খুইয়ে এসেছি। বেশ gracefully 'না' বলতে শেখাটা সেখানে বিশেষ আবশ্যক। নইলে আর বিপদের শেষ নেই। এই রকম প্রতিপদে কত পড়ে উঠে—তবে যে সে দেশের মাটীতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছি—তা কি আর কহতব্য ?

দিদি। শেষ আর কি, সব বিষয়েই খুব পাকা হয়ে উঠেছিলেন ?

ডাক্তার। তা ঠিক্ বলতে পারিনে,—আমার বাঙ্গালী বন্ধুরা শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বলতেন—নেহাত কাঁচা।

ভগিনীপতি। তুমি সেখানে রমানাথকে কতদিন থেকে জানতে ?

ডাক্তার। তিনি দেশে ফেরার অল্পদিন আগে মাত্র, আমাদের একটি বন্ধুর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

ভগিনীপতি। সত্য কি সে engaged হয়েছিল ?

ডাক্তার একটু থতমত খাইয়া বলিলেন - "সেই রকম শুনেছিলুম বটে—কিন্তু আমি নিশ্চয়—But I am afraid it is not a fit subject for the dinner table!"

ভগিনীপতি তাঁহার সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন, "Yor are right, let us keep it for some other time. I have certain reasons of-course for asking you about him."

সে কথা থামিল— আমি বাঁচিলাম।

সে দিন আকাশে পূর্ণচাঁদ,— জ্যোৎস্নায় দিগ্‌-দিগন্ত ভাসিয়া যাইতেছিল—আহারান্তে আমরা তাই ছাদে বসিলাম; দিদি বলিলেন,— "ইংলণ্ডে ত আপনার সবই ভাল,—কিন্তু এমন চাঁদের আলো পেতেন ?"

ডাক্তার। সেটা rare ছিল বটে,—সেই জন্তই বোধ হয়—যখন জ্যোৎস্না ফুটিত, বড় যেমন বেশী সৌন্দর্য্য ছড়াত।

দিদি। আপনি দেখছি- একেবারে মজে গেছেন। ইংলণ্ডের সুন্দরীরাই ভাল আমরা জানতুম, আবার চাঁদের আলোও এ দেশের চেয়ে বেশী সুন্দর ? আপনি যে সেই চাঁদের দেশে থেকে, তার অনন্ত আকর্ষণ এড়িয়ে ফিরেছেন—এ একটা পরমাশ্চর্য্য ব'লে মনে হচ্ছে।

তিনি তাঁহার কপোল-প্রান্তের শ্মশ্রুগুচ্ছে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন,— "জানেন যে, সংসারে আশ্চর্য্যই বেশী ঘটে। যেখানে সম্ভাবনা যত প্রবল, সেখানে দেখবেন, প্রায়ই নৈরাশ্য, আর সেখানে আপনি least সম্ভাবনা আছে ভাবছেন, least প্রত্যাশা করেছেন—সেই-খানেই দেখবেন তা ঘটছে।"

বলিতে বলিতে তিনি যেন চকিত নয়নে আমার দিকে চাহিলেন, জ্যোৎস্নাবাহিত সেই নীরব দৃষ্টি হইতে কি এক অশ্রুত মধুর রব ধ্বনিত হইল, তাহার পুলক-কম্পনে হৃদয়ের অন্তঃপুর স্তরে-স্তরে কম্পিত, আলোড়িত করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস উথলিত করিয়া তুলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যেমন হইয়া থাকে, ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর তাঁহাকে লইয়া আমাদের মধ্যে সমালোচনা চলিতে লাগিল। দিদি বলিলেন—"লোকটাকে লাগল মন্দ না।"

ভগিনীপতি বলিলেন—"Yes – he's not a bad fellow—hasn't got much common sense though—too much of a woman worshipper I should say."

দিদি। সে ত ভালই।

ভগিনীপতি। মন্দ কে বলছে ? Poor fellow, I pity him—he's quite lost in admiration of the fair six. Fancy an intelligent and educated man like him firmly believing in the possibility of a woman's ever coming up to the Shakespeare in intellectual power!

দিদি। সেটা কি এমনি অসম্ভব ব্যাপার ?

ভগিনীপতি। And what is work still—feeling no hesitation whatever in expressing this outrageous opinion of his before others and making fool of himself, The man has absolutely no sense of the indicrous.

আমি বলিলাম,—"তাঁর যে strength of conviction খুব আছে—এতে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"You are right it shows his sincerity and to tell you the truth, I like him all the better for this out spoken foolish enthusiasm of his."

দিদি। লোকটা বেশ সহৃদয়।

ভগিনীপতি। He has the manners of a perfect gentleman—

তাহার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা, মণির সঙ্গে তার বিয়ে হ'লে কেমন হয়?

দিদি। সে ত engaged।

ভগিনীপতি। Good gods! কে বল্লে! আমি ত ভেবেছিলুম, he was rather saw—never mind what, but— কে বল্লে?

দিদি। চঞ্চলের মা বলছিলেন।

ভগিনীপতি। এরই মধ্যে পাকড়া কল্লে কে? কথাটা ত গুজবও হ'তে পারে?—

দিদি। না, ডাক্তারের মায়ের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, গুজব হবার নয়। তবে পাত্রীটি যে কে, তা আর আমি জিজ্ঞাসা করিনি, অন্য কথা এসে পড়লো, আর জেনেই বা আমার লাভ কি বল?

ভগিনীপতি। Bad luck everywhere oh! তবে চল এখন শুতে যাওয়া যাক, স্বপ্নে এই happy pairকে congratulate করা যাবে এখন।

কি ভাগ্য, ইহা রাত্রিকাল; তাই আমার সহসা পরিবর্ত্তিত বিবর্ণ মূর্ত্তি ইঁহারা দেখিতে পাইলেন না।

শয়নগৃহে আসিয়া জানালার ধারে কৌচে বসিলাম। বিছানায় যাইতে ইচ্ছা হইল না। নয়নপথে মুক্তাকাশখণ্ডে শ্বেত কৃষ্ণ মেঘের উপর দিয়া স্তরে স্তরে, তরঙ্গে-তরঙ্গে, তর-তর বেগে পূর্ণ শশধর ভাসিয়া যাইতেছিল; তাহার দিকে চাহিয়া আমার সন্ধ্যার সেই মুখ মনে জাগিতে লাগিল; আর ব্যথিত অশ্রুধারা হৃদয় ভেদ করিয়া নয়নে উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

সবই কি আমার কল্পনা। ইহার নয়নে যে সুমধুর দৃষ্টি দেখিলাম, ইহার সাধারণ কথার মধ্যে যে অসাধারণ হৃদয়-কথা পড়িলাম, তাহার মধ্যে কি সত্য কিছুই নাই? সমস্তই কি আমার মনের ছায়া—আমার মনের ভাব মাত্র? সন্দেহ নাই। আমি কে? আমি কি নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত অযোগ্য, মুহূর্ত্তের জন্যই বা কিরূপে অতদূর আত্মহারা হইলাম? এ দুরাশা কেন মনে উঠিল? তাহা কখনো নহে; কখনো হইবারও নহে,—সমস্তই আমার ভ্রম। আমার কল্পনা।

বাহিরে তেমনি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না; অন্তরে তেমনি মধুর দৃষ্টি, কেবল সন্ধ্যার সেই আনন্দের পরিবর্ত্তে সমস্তই এখন নিরানন্দ, বিষাদ, ম্লান; হৃদয়ের নবজাগ্রত মধুর বসন্ত মুহূর্ত্তে মরুবিলীন।—

তাঁহাকে মনে পড়িল। যাঁহার ভালবাসা উপেক্ষা করিয়াছি, তাঁহাকে মনে পড়িল। শুনিতে পাই, সংসার কর্ম্মফলে চলিতেছে, ইহাও কি কর্ম্মফল? তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছি, তাই এ কষ্ট। কিন্তু আমি কি তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া কষ্ট দিয়াছি? অবস্থাচক্রের উপর কি আমার হাত আছে? তাহা হইতে আমার হৃদয় যে দূরে পড়িয়াছে, সে কি আমার দোষে? সহস্র চেষ্টাতেও কি আর সে প্রেম ফিরাইতে পারি? না আবার ইচ্ছাক্রমেই এই নবপ্রেম আমার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে? সাধ্য থাকিলে এই মুহূর্ত্তে কি ইহা বিলোপ করিতাম না? যে কর্ম্মের উপর আধিপত্য নাই, তাহারও ফল আছে? সে জন্যও মানুষ দায়ী! তাহার নিমিত্ত এই ভয়ানক শাস্তি! তবে মানুষকে এত ক্ষুদ্র, এত তুচ্ছ, এত দুর্ব্বল করিয়া গড়িয়াছ কেন প্রভু! দুর্ব্বল অসহায়ের প্রতি তোমার করুণা কোথায় তবে? অবশ্যই আছে! কেবল কর্ম্মফলে সংসার চলিলে এতদিন ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। আমিই বা আজ কোথায় থাকিতাম! যে করুণায় বাল্যে, কৈশোরে অসংখ্য রোগশোক দুঃখ-তাপের অবসান করিয়া জীবনে সুখশান্তি বিধান করিয়াছে, হে নাথ, করুণাময় তোমার সেই অনন্ত করুণা-বারিবর্ষণে—"

প্রার্থনা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল; কি ভিক্ষা করিতে যাইতেছি! ঈশ্বরের করুণা আহ্বান করিয়া যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে পাইতে চাহি! আমার সুখের জন্য, অন্যের সুখে অভিসম্পাত প্রার্থনা করিতেছি। প্রার্থনার সহজ উচ্ছ্বাস সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল, করপুট শিথিল হইয়া পড়িল, আমি সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া অধীর বেদনায় মনে মনে কহিলাম,—"তোমার করুণা! প্রভু, তোমার

করুণা! আমার মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট, যে দুঃখ বিধান করিতে চাহ, আমি যেন ধীরভাবে তাহা সহ্য করিতে পারি; করুণা করিয়া এই বল দাও নাথ!" কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে সেই অবস্থাতেই কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম, জানি না। যখন জাগিয়া উঠিলাম, তখন পূর্ব্বরাত্রের সেই বেদনাময় অনুভূতি লইয়াই জাগিয়া উঠিলাম। সেই ছবি, সেই দৃষ্টি মনোনেত্রে দেখিতে দেখিতেই জাগিয়া উঠিলাম

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

একই রকমে দিন কাটিতে লাগিল। প্রতিদান পাইবার আশা নাই, ভরসা নাই, ইচ্ছাও নাই। নিরাশার মধ্যেও তথাপি অন্তঃশীলা আশা প্রবাহিতা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাসনা বিদ্রোহী, মনের বিরুদ্ধে মন সংগ্রামরত, নিজের সহিত অনবরত যুদ্ধে হৃদয় রক্তাক্তক্ষত—বিক্ষত। এমন অবস্থায় তোমরা কেহ কি কখনো পড়িয়াছ? জানি না, কিন্তু মনে হয়, এ বিশাল সংসারে এ জ্বালা শুধু আমিই জানি।

ভাবিতে গেলে মহা বিস্ময়ের মধ্যে মগ্ন হইয়া পড়ি!—কেবল দুই চারি দিনের দেখা, কেবল দুই চারিটা কথাবার্ত্তা। তাহাতেই কিরূপে আমাকে এমনতর পাগল করিয়া তুলিল; সেই ক্ষণিক মিলনের মধ্যে জগতের যত কিছু সৌন্দর্য্য-মধুরতা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, যত কিছু হলাহলভরা অভাব, বেদনার অভিজ্ঞানে জীবনের অভিজ্ঞতা যেন সম্পূর্ণ। তাঁহাকেও ত ভালবাসিয়াছিলাম; কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে এ রকমের অনুভব নহে। সে শুধু গানের মোহ, স্মৃতির ব্যথা; এমন মর্ম্ম-বিজড়িত আকুল আকাঙ্ক্ষাময় আহ্বান নহে। সে শুধু বিশ্বাসের-উচ্ছ্বাস, প্রীতির অনুভবে মর্ম্মান্তিক সহানুভূতি তাই যখন বিশ্বাস ফুরাইল, যখন মনে হইল, তাঁহা ভালবাসা সত্য নহে, তখন সে ভালবাসা ফুরাইল। কিন্তু এ সন্দেহে, এ অবিশ্বাসে সে ক্রোধ কোথা? সে বিরক্তি কোথা? সে বিতৃষ্ণাই বা কোথা? নৈরাশ্যসিঞ্চনে এ প্রেম আরও কেবল মনে দৃঢ়-বদ্ধমূল হইয়া বসিতে লাগিল।

প্রাণের মধ্যে সারাদিন কি যে আগুন জ্বলিতেছে, কাজে-কর্ম্মে,গল্পে,কথায় তাহার নিবৃত্তি নাই। যতই ভাবি আর না আর না, ততই ইহাকে ভাবি, ভুলিতে চেষ্টা করিয়া দর্শন তৃষায় আরও ব্যাকুল হইতে থাকি, বায়ুর শব্দে নিরাশ-মনে বাতুল আশা জাগাইয়া তোলে—মোহভঙ্গে দগ্ধ হৃদয়ে বেদনাধ্বনি ওঠে—একবার—একবার কি আর দেখা পাইব না। আর কিছু না—যদি শুধু মাঝে-মাঝে দেখা পাইতাম। হৃদয়ভাগিনী নহে—যদি সামান্য বন্ধুত্বভাগিনীও হইতে পারিতাম! তাহা হইলেই কি আমার জীবন-জন্ম সার্থক হইত না? কোথায় সে গর্ব্বিত অপমান বোধ!

এইরূপ দাবানল হৃদয়ে বহিয়া দিন কাটে। ভবিষ্যতে কি হইবে, কে জানে, কালে ইহার শান্তি আছে কি না, জানি না, কিন্তু পুড়িতে পুড়িতে জ্বলিতে জ্বলিতে এখন মনে হয়—এমনি নিরাশাময় আশা, বেদনাময় আকুলতায় জীবন জ্বলিয়া-পুড়িয়া যখন ভস্মসাৎ হইবে, তখনি মাত্র ইহার শান্তি। সুদীর্ঘ জীবনের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠি। ইহাই কি প্রেম? যে তৃষ্ণায় তৃপ্তি নাই, যে আকাঙ্ক্ষায় নিবৃত্তি নাই, যে আশায় সফলতা নাই, তাহাই কি প্রেম? কে জানে।

ইহার তিন চারিদিন পরে চঞ্চলের সহিত দেখা। তাহাদের বাড়ীতেই দেখা। আমাদের দু'জনে খুব ভাব। বেশী না হউক, অন্ততঃপক্ষে সপ্তাহে একবার করিয়া, দিনান্ত ধরিয়া, আমরা দুজনে একত্র কাটাই। কোনবার বা সে আমাদের বাড়ী আসে, কোনবার বা আমি তাহাদের বাড়ী যাই। তাহার নজর এড়াইতে পারিলাম না; আমাকে দেখিবামাত্র, আমার শুষ্ক বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য করিয়া সমবেদনার স্বরে চঞ্চল বলিয়া উঠিল—"আর তুমি কি না বল, সে জন্য তোমার কিছুই আসে যায় না; এ কি চেহারা হয়েছে? আমার তার উপর এমন রাগ ধরছে! কিক'রে যে কাকারা দিদির সঙ্গে তা বিয়ে—"

"দিলেই বা!"

"আচ্ছা, ঠিক বলছ, তুমি তাকে আর ভালবাস না। বিয়ে ভেঙ্গে গেছে ব'লে দুঃখিত হওনি?"

"তুমি কি মনে কর, তোমাকে আমি অতিকিছু বলব! কোন কথা তোমাকে বলতে না পারি

কিন্তু যা বলব, তা বেঠিক বলব না,—এ বেশ জেনো।"

চঞ্চল খুসী হইয়া আমার গাল টিপিয়া বলিল, "সই লো, আমার তোকে কিন্তু ভাই বড় কেমন কেমন দেখাচ্ছে। তা এতটা একজনকে বিশ্বাস করেছিলি,—সে বিশ্বাসটা ভাঙলো, সে জন্যও ত কষ্ট হয় ?"

"হয়েছিল অবিশ্যি, তা ত জানই। কিন্তু তাই ব'লে যদি ভাব, আমি সেই কষ্টে এখনো মারা যাচ্ছি—তা হ'লে—"

"আমি হ'লে ত যেতুম। আমি যদি বিলাত থেকে এক হপ্তা চিঠি না পাই, এমন ভয় হয়, কি বলব !"

"তোর যে বিয়ে হয়ে গেছে, তোর স্বামী ভুলেও তোর ভোলার পথ বন্ধ, আর ভোলাটাই আমাদের পক্ষে যুক্তি, কেন না, তাতেই আমাদের মুক্তি।"

চঞ্চলও হাসিল, হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা ঠিক! দিদিও (কুসুম) ত দেখছি বেশ আছে! আমি নিজের ভাব থেকেই দেখছি উলটো বুঝে মরি। শুনেছ অবিশ্যি, দিদির বিয়েও ভেঙ্গে গেছে ?"

"না। ভাঙলো কেন ?

"তা ত জানিনে। তাঁরা ত আর আমাদের কাছে কিছু প্রকাশ করেন না। বাইরে বাইরে অমনি শুনছি যে, হবে না নাকি। বোধ করি, রমানাথই ভেঙেছে, কেন না, দিদির শুনেছি ইচ্ছা ছিল। লোকটা যা হ'ক, গুণপণা আছে—নইলে দিদি পর্য্যন্ত ভোলে ?"

আমি একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম,—একটা অনুতাপ গ্লানি হৃদয়ে বহিয়া গেল! এ বিবাহে তিনি অসম্মত হইলেন কেন ? আমি কি তাহাতে লিপ্ত ?

চঞ্চল বলিল—কি ভাবছ ?

আমি বলিলাম—"তোমার দিদি কি সত্য তাঁকে ভালবেসেছিলেন ? আমার তাঁর জন্যে বড় মায়া করছে, সাধ্য থাকলে কোন রকমে বিয়েটা ঘটাতুম!"

"তোমাকে কে মায়া করে ঠিক নেই—তুমি মায়া করছ দিদিকে! আমি ত তার বড় একটা দরকার দেখছিনে। আত্মাদর দিদির যথেষ্ট আছে —নিজের মূল্য সে বেশ বোঝে, কেনই বা না বুঝবে ? রূপগুণের কিছু কসুর নেই, তার উপর টাকা। যে বিয়ে করবে, রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব এক সঙ্গে পাবে। কত লোক তার জন্য হা-হুতাশ ক'রে মরছে, তার ত ঠিক নেই। যদি দুঃখ করতে হয়, তাদেরই জন্য বরঞ্চ কর। দিদির যদি সামান্য একটুকু আঁচড় লেগে থাকে ত এতদিনে তার দাগ বেশ মিলিয়ে পড়েছে!"

"তা কি ক'রে জানলে ? যারা সহজে ভালবাসায় পড়ে না, তারা ভালবাসলে বরঞ্চ সহজে না ভোলারই কথা!"

"হ্যাঁ, যদি তেমন ভালবেসে থাকে। কিন্তু সে রকমটা ত মনে হয় না। লোকটা একটু চটুকে রকম, কথাবার্ত্তায় খানিকটা চমক লাগাতে পারে—কিন্তু তার উপর যে কারো গভীর ভালবাসা হবে, তা ত আমি মনে করতে পারিনে। নিদেন আমার হ'লে ত হোত না, আর দেখা যাচ্ছে, তোমারো হয়নি। তা হ'লে দিদিরই কি হবে ?"

"বস্! খুব ত লজিক দেখছি।"

"ইংরাজী নভেলে প্রায়ই ত দেখা যায়, first love অনেক সময়েই অনভিজ্ঞ হৃদয়ে একটা শুধু উচ্ছ্বাস, তেমন গভীর ভালবাসা নয়। দিদিরও এটা খুব সম্ভব সেই রকম একটা ফেনা উঠে জল-বুদবুদের মত আবার মিলিয়ে পড়েছে। যথার্থ ভালবাসা হৃদয়ের একটা শিক্ষা, সেটা শুধু আবেগ নয়; তার উপযুক্ত পাত্রও চাই। হ্যাঁ, ডাক্তারকে কেউ ভালবাসছে শুনলে সেটা বোঝা যায় বটে। আজকাল ত আমরা দিদিকে এই কথা নিয়ে ঠাট্টা করি, তিনি কি না ঘরাউ ডাক্তার হয়েছেন। আর মনে হয়, ডাক্তার বেশ একটু ধরা পড়েছে—"

আমার হৃৎপিণ্ডে শোণিত বেগে বহিল; মনে হইল, মুখে চোখে তাহা উছলিয়া উঠিতেছে, বুঝি বা এখনি ধরা পড়ি; কিন্তু চঞ্চল লক্ষ্য করিল না—বলিয়া উঠিল, "এই যে দিদি, অনেক দিন বাঁচবে, নাম করতে করতে হাজির।"

অনেক দিন পরে কুসুমের সহিত দেখা। মনে হইল, সে যেন পরিবর্ত্তিত। তাহার নয়নে সেই বিদ্যুদ্দাম প্রস্ফুরণ চাপল্যের যেন অভাব; অধরে আত্মম্ভরীময় সদা প্রস্ফুটিত হাস্যরেখা যেন নিমীলিত। আমার মায়া করিতে লাগিল। পাছে সে ভাবে, আমি তাহার প্রতি অপ্রসন্ন, আর সেরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণও বর্ত্তমান, "এই যে কুসুম! অনেক দিন পরে দেখা!"

কুসুম একটু চাপা ভাবে উত্তর করিল—

"হ্যাঁ, কত দিন ভেবেছি, দেখা করতে যাব, কিছুতেই কেমন ঘটে ওঠেনি। তোমরাই কোন্ আমাদের বাড়ী আস?"

ইহার উত্তর যোগাইল না, বলিলাম, "আমি দেশে যাচ্ছি।"

চঞ্চল বলিয়া উঠিল, "মনের দুঃখে বনবাস আর কি!"

আমি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম; ছি! কুসুম কি ভাবছে? চঞ্চলও বলিয়া বোধ হয় বুঝিল, কথাটা কুসুমের মনে লাগিতে পারে। তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িল, বলিল, "তার পর দিদি, ডাক্তারের খবর কি?"

কুসুম বলিল, "তার খবর আমি কি জানি! মণি সম্ভবতঃ বলতে পারে; ওদের ওখানে না প্রায়ই যান? কেন, মনের দুঃখ কিসের? মণির মত সৌভাগ্য আমাদের হ'লে আমরা ত বেঁচে যেতুম।"

উদ্দেশ্য অবশ্য ঠাট্টা, কিন্তু ইহার মধ্য হইতে সত্যের আভাষ প্রকাশ পাইল। বলিতে বলিতে কুসুমের চাপা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সে নিশ্বাসে ঈষৎ যেন ঈর্ষামাখা নৈরাশ্য-বেদনা ব্যক্ত হইল, বুঝিলাম, কুসুম ভালবাসে, সত্যই ভালবাসে; কিন্তু কাহাকে? তাঁহাকে না ইঁহাকে? মিষ্টার ঘোষকে —না ডাক্তারকে?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—*—

কাহাকে? তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? চঞ্চল কি জানে? তার সব অনুমান বই ত নয়! মিষ্টার ঘোষ যে এমন সুবিধার বিবাহ আপনা হইতে ছাড়িবেন, তাহা হইতেই পারে না; কেন ছাড়িবেন, তাহার যখন কোন কারণই নাই। কুসুমই এ বিবাহে অসম্মত হইয়াছে। যতক্ষণ চন্দ্রোদয় না হয়, ততক্ষণ নক্ষত্র দীপ্তিশালী, চন্দ্র উঠিলে কি আর তারার আলো চোখে লাগে? ডাক্তারের সহিত পরিচিত হইয়াই কুসুম মন পরিবর্তন করিয়াছে— কুসুমের সহিতই ডাক্তার engaged, নহিলে ইহার নাম শুনিবামাত্র কুসুম ওরূপ বিহ্বলতা প্রকাশ করে কেন! বেচারা রমানাথ! তাঁহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল।

স্তব্ধ নিশায় শয্যাশায়ী একাকী আমি নির্বোধে চিন্তামগ্ন হইয়া এইরূপ মীমাংসা করিতে করিতে আর একটি কথা সেই সঙ্গে বারংবার এই ভাবিতে-ছিলাম—"কুসুম কি ভাগ্যবতী! ইহার মধ্যে কি ঈর্ষা লুকান ছিল? নিশ্চয়ই। লোকে বলে, এমন স্থানে ঈর্ষা না হইয়া যায় না—আমি কি আর সৃষ্টি-ছাড়া; তবে এ ঈর্ষা নিতান্তই নিরীহ ঈর্ষা, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা-উত্থিত নৈরাশ্য-বেদনা;—আকুল দীর্ঘ-নিশ্বাসে মাত্র তাহার বিকাশ ও তাহাতেই তাহার অবসান, বিকৃত বিরূপ বিদ্বেষপূর্ণ অভিশাপ ইহাতে ছিল না। থাকিবার কথাও নহে।—যেখানে অধি-কারে, উপভোগে কেহ অপহারক, সেখানে সেই অপহারকের প্রতি ক্রোধে বিদ্বেষ স্বাভাবিক। কিন্তু কুসুম আমার কাছে কি দোষে দোষী? আমা হইতে আমার প্রিয়তমের স্নেহও সে ছিন্ন করে নাই, আমার আত্মীয়তা অধিকারও তাহা হইাত সে হরণ ক'রে নাই;- সৌভাগ্যক্রমে সে না হয় তাঁহার প্রণয়িনী হইয়াছে, যদি তাহা না হইত—যদি কুসুমকে তিনি না ভালবাসিতেন তাহা হইলেই যে আমি ভালবাসা পাইতাম, এমন আশাও আমার মনে নাই। তবে তাহার উপর ক্রোধ বিদ্বেষ জন্মিবে, কেন? বরঞ্চ বিপরীত। দ্বেষের পরিবর্তে এই ঈর্ষ্যার আঘাতে আমার হৃদয়ে একটি গুপ্ত প্রীতিদ্বার সহসা খুলিয়া গেল। সত্য কথা বলিতে হইলে ইতিপূর্ব্বেই আমি কুসুমের প্রতি সখ্যভাব অনুভব করি নাই। কিন্তু যখনি মনে হইল, কুসুম আমার প্রিয়তমের প্রিয় হইয়া উঠিল,—তাহার যে সকল গুণরাশি এতদিন আমার অন্ধ-নয়নে অপ্রকাশিত ছিল—পরম প্রীতিভাজন বন্ধুর মত সহসা সেই সবে আমি সাতি-শয় আকৃষ্ট হইয়া উঠিলাম এবং এই নবসখ্যভাবে আমাকে এতদূর অধীর, এতদূর বিহ্বল করিয়া তুলিল যে, তখনই তাহাকে সখিত্বের ডোরে বাঁধিয়া তাহার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখি-বার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। এমন কি, মনের আবেগে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলাম, কিন্তু ডেক্সের কাছাকাছি আসিয়া সহসা মন পরিবর্ত্তিত হইল, মনে হইল, ছি! কুসুম কি ভাবিবে? আর

কিই বা লিখিব! আস্তে আস্তে আবার ফিরিয়া গিয়া বিছানায় ঢুকিলাম।

পরদিন সকালে দিদি বলিলেন, "সে আসবে জানিস ?" আমার হৃৎপিণ্ড বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে ?"

"কাল টেনিসে।—মুখে তুই কিছু বলিসনে, কিন্তু দিন দিন যে রকম শুকিয়ে যাচ্ছিস, দেখলে চোখে জল আসে।"

ভারী লজ্জা হইল, ছি—ছি—দিদিও ধরিয়া ফেলিয়াছেন। "হাঁ, শুকিয়ে যাচ্ছি! তোমার যেমন কথা!"

দিদি বলিলেন—"আর এতটা কষ্ট কেন—না সামান্য একটু ভুল বোঝার জন্যে!"

আমি সহসা আকাশ হইতে পড়িলাম,—বুঝিলাম, ডাক্তারের কথা বলিতেছেন না।

দিদি বলিলেন—"সে যে তোমাকে ভালবাসে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ওনার সঙ্গে দেখা হ'তে নিজেই সে কথা তুলে বলেছে যে, তোর ব্যবহারে তার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে; যদিও অন্য পার্টিরা তাকে বিয়ের জন্য বিশেষ ধরে পড়েছেন—কিন্তু এখনো সে তাদের কথা দেয়নি; এখনো যদি তোর মত হয় ত সে সমস্ত sacrifice কর্‌তে প্রস্তুত। কা'ল আসবে, দেখিস যেন আবার হেঙ্গামা বাধিয়ে বসিস্ নে। তুই ভালবাসিস, সেও ভালবাসে, মাঝে থেকে এক ক্যাকড়া।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি এখন নিজের হৃদয় বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি, তাহাকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব, তবে বিবাহ করিব কি করিয়া? আমি বলিলাম, "আমার জন্য তাঁহাকে কোন রকম sacrifice কর্‌তে হবে না। দিদি, আবার কেন এ হেঙ্গামা বাধাও? আমি দেখা করিতে পারব না!"

দিদি বলিলেন, "তুই এমন কথা ধরতে পারিস? Sacrifice বলেছে, অমনি অভিমান!"

"অভিমান আবার কোথায় পেলে। ভালবাসা-স্থলেই মানাভিমান! ভালবাসাতেই আত্মবিসর্জন করেও আত্মবিসর্জন নিয়ে সুখ। যেমন ভালবাসা থাকলে তিনিও এটা sacrifice ভাবে দেখতেন না, আর আমারো তা গ্রহণ কর্‌তে কুণ্ঠা হতো না।—যাকে ভালবাসিনে, তার উপর মানাভিমানই বা কি—আর তার sacrificeই বা নিতে যাব কেন?"

দিদি তবুও মনে করিলেন—ইহা আমার অভিমানের কথা। হাসিয়া বলিলেন,—"তোর সঙ্গে বাবু আমি তর্কে পারব না—সে ত কাল আসছেই, এসে তর্কভঞ্জন মানভঞ্জন সবই করবে এখন।"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "দিদি, তুমি খুবই ভুল বুঝছ। অভিমান ক'রে আমি এরূপ বলছিনে। তাঁর এ কথায় আমার বরঞ্চ আহ্লাদই হয়েছে—মন থেকে একটা দারুণ ভার নেমে গেছে। আমি যাঁকে ভালবাস্‌তে পারছিনে, তিনি আমাকে ভালবাসছেন—আমি তাঁর কষ্টের কারণ—এটা মনে করতে কি খুব সুখ নাকি?"

দিদি রাগিয়া বলিলেন, "তোর মত আত্মম্ভরী লোক যদি আর দুটি আছে? সেই যে ধ'রে বসেছিস, সে ভালবাসে না—এ আর কিছুতে ছাড়বিনে। যা হ'ক, কা'ল ত সে আসছে, দেখা ত' হোক, তার পর যা হয় হবে—"

আমি কাতর হইয়া বলিলাম,—"আমি দেখা করতে পারব না দিদি,—ব'লো, আমার অসুখ করেছে।"

"অসুখ করেছে! উনি এ দিকে তাকে আস্‌তে বলে এসেছেন,—ভাবে গতিতে প্রকাশ করেছেন যে, তোর আর এ বিয়েতে কোন আপত্তি হবে না, আর তুই এখন বলছিস দেখা করবিনে।

আমি কি করব? দেখা হলেই যে আমাকে আবার সেই কথাই বল্‌তে হবে। আমি যে কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি হতে পারছিনে দিদি!"

"আমাদের অপমান, লোক হাসিহাসি এ সবই ভাল, তবু বিয়েতে রাজি হ'তে পারবিনে অথচ তার দোষ কিছুই নেই! এর কোন মানে আছে?"

"আমি তাকে ভালবাসতে পারব না।"

"এই দুদিন আগে এত ভালবাসা, আর ভালবাস্‌তে পারবিনে। সে কি কখনও হয়! এখন ও রকম মনে হচ্ছে, বিয়ে হলেই ঠিক ভালবাসা হবে।"

আমি নিতান্ত মোরিয়া হইয়া বলিলাম, "দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি দেখা করতে পারব না, আমি তখন বুঝিনি, এখন বুঝছি, তাঁর সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমিও সুখী হব না, তিনিও না।"

"তবে তোর যা ইচ্ছা করিস, যা ইচ্ছা বলিস। এমন একগুঁয়ে মেয়েও ত আমি কখনো দেখি নি।" বলিয়া দিদি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জীবনে কত মহাবিপদে পড়িয়াছি, কিন্তু কখনও আমাকে এই সামান্য বিপদের মত এত কাতর, এত অভিভূত করে নাই। যেন ভীষণ অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া, দেহে তীক্ষ্ণ শাণিতাস্ত্র বর্ষণ চলিতেছে, আত্মরক্ষার কিছুমাত্র উপায় নাই, হস্ত উঠাইতে, মস্তক তুলিতে শতধার কৃপাণ তাহার তীক্ষ্ণতা আরো ভীষণরূপে অনুভব করাইয়া দিতেছে। আমি যন্ত্রণা-জর্জ্জর কাতর প্রাণে সর্ব্বান্তঃকরণে কেবল ডাকিতেছি, মাতঃ পৃথিবি, বিদীর্ণ হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। সে কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না, জগৎমাতার সিংহাসন বিকম্পিত করিয়া তাঁহার করুণা আনয়ন করিল। তখনো আমি সে চৌকিতে সেইরূপ মুহ্যমান ভাবে বসিয়া আছি, চাকর আসিয়া খবর দিল, বাবা আসিয়াছেন। বাবার আসিবার কথা ছিল বটে, তিনি লিখিয়াছেন, আমাকে আসিয়া লইয়া যাইবেন, তবে এত শীঘ্র আসিবেন, তাহা আমরা মনে করি নাই।

দিদির ঘরে প্রবেশ করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম, অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিতে সাহস হইল না, দেখিলাম, অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ক্রোধ-বিকম্পিত উগ্রস্বরে দিদির সহিত কথা কহিতেছেন; বুঝিলাম, অবশ্য আমাকে লইয়াই তাঁহাদের বাগ-বিতণ্ডা; কম্পিত কলেবরে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাঁহারা আমার আগমন লক্ষ্য না করিয়াই পূর্ব্বের ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন।

বাবা বলিলেন, "সে শোনাবার মত কথা কি যে বলব? আমি যে শুনে পাগল হয়ে যাইনি, তা আমারি আশ্চর্য্য মনে হচ্চে। তুমি বল্‌ছ, মণির ইচ্ছা ছিল না, তাই বিবাহ ভাঙতে হয়েছে। বাজার-ময়, সে নাকি বলেছে, কন্যার শোভন-শীলতা, নম্রতার অভাব দেখেই তাকে সরে পড়তে হয়েছে। বেশী আর কি বল্‌ব।"

দিদি। মিথ্যা কথা।

বাবা। মিথ্যা কথা, তা কি আমাকে বল্‌তে হবে? মণির মত স্বাভাবিক বিনয়, নম্রতা, লজ্জা কটা মেয়ের আছে?

দিদি। না, তা বল্‌ছিনে। পাত্র কখনই এরূপ বলে নি, মিথ্যা গুজব; এখনো সে বিয়ে কর্‌তে রাজি, যদি ওরূপ তার মনের ভাব হবে, তা হ'লে কি—

বাবা। বিয়ে কর্‌তে রাজি! অমন পাত্রে আমি মেয়ে দেব!

দিদি। কিন্তু আপনি স্থির হয়ে একটু ভেবে দেখুন, তাতেই লোকলজ্জা কলঙ্ক সমস্ত দূর হবে।

বাবা। লজ্জা কলঙ্ক যা হবার হয়েছে, তার চেয়ে বেশী আর কি হবে? হ'লেও সবই সহ্য করব, তবু অমন চণ্ডালের হাতে মেয়ে সমর্পণ করব না।

দিদি। কিন্তু আপনি পরের কথা শুনে অন্যায় করছেন। সে কখনই অমন দুর্জ্জন নয়, অমন ক'রে সে বলেনি।

বাবার রাগ তাহাতে উপশমিত হইল না। তিনি তেলনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—"scoundrel, নিশ্চয়ই বলেছে! মণি যে তাকে বিবাহ কর্‌তে নারাজ, সেটা বল্‌তে যে তার নিজের মানহানি হয়! কিছুতেই আমি তাকে কন্যাদান করব না। মণিকে আজই রাত্রে সঙ্গে নিয়ে যাব। নিজে দেখে শুনে যে পাত্র পছন্দ করব, তাকেই মেয়ে দেব। তোমাদের মত ইংরাজী কোর্টসিপ আর না।"

দিদি অনেক করিয়া তাঁহাকে দুই এক দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন, বাবা কিছুতেই রাজি হইলেন না, সেই রাত্রেই আমরা ঢাকা-যাত্রা করিলাম, গাড়ীতে উঠিয়া আমি যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, পিতার স্নেহের মধ্যে আপনাকে পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিয়া অনেক দিনের পর অতি অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ সে সুখভোগ অদৃষ্টে ঘটিল না। কে জানে, সংসারের এ কি দানব-নিয়ম! কাহারও অভিমুখ, তাহাকে এ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে দেখিলাম না। স্টীমারে বাবা বলিলেন, "ছোটুকে তোমার মনে পড়ে কি?"

"পড়ে বই কি।"

"তাঁর মায়ের ভারী ইচ্ছা, তোমাকে পুত্রবধূ করেন। আমারো অত্যন্ত ইচ্ছা, ইহাকে জামাতা

করি, এমন সুপাত্র সচরাচর পাওয়া যায় না ; ভগবান্ যদি বিমুখ না হন, তোমার যদি ভাগ্যবল পুণ্যবল থাকে, তা হ'লে ঢাকায় গিয়ে যত শীঘ্র হয়, এই শুভবিবাহ সম্পন্ন করার ইচ্ছা আছে।"

যে আশা, যে কল্পনা অনেক দিন ধরিয়া হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখকর স্বপ্নরাজ্য নির্ম্মাণ করিত, আজ তাহাই সত্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনায় সহসা বজ্রাঘাতে যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বাড়ীতে পা দিবামাত্র জ্যেঠাইমার আমার প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ—"ওমা, কি হবে গো ! মেয়ে যে পেল্লায় বড় হয়ে উঠেছে ! আর এখনো আয়বড় ! লোকে দেখলে বল্‌বে কি ! ছিছি ঠাকুরপো, তোমার মুখে অন্নজল রোচে কি ক'রে গা।"

বাবা ব্যস্তসমস্ত পলায়নপর হইয়া বলিলেন—"শীগগিরই হবে—শীগগিরই হবে, সবই এক রকম ঠিক, সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই।"

সব ভাল করিয়া শুনা গেল কি না গেল, তিনি কোন রকমে কথাগুলো মুখের বাহির করিয়া চলিয়া গেলেন।

জ্যেঠাইমা ইহাতে আরো অসন্তুষ্ট হইয়া আপন মনে গজগজ করিতে লাগিলেন—"না, আমার কোন ভাবনা নেই, তোমারি যত ভাবনা ? এই যে পাঁচজন মেয়েছেলে এখনি এখানে আসবে, মণিকে দেখে নানা কথা বলবে, তুমি ত আর শুন্‌তে আসবে না ; আমারি লজ্জায় বাক্‌রোধ হবে।"

জ্যেঠাইমার ভয় দেখিলাম, নিতান্ত অকারণ নহে। সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি শুনিয়া আমাদের যত কেহ আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবাসী মহিলাগণ পালায় পালায় প্রতিদিন দল বাঁধিয়া আমাকে দেখিতে আসেন ; আসিয়া, আশ্চর্য্য ! প্রতিজনে ঠিক একই রকম ভাবায়, পাখীর শেখা বুলির মত আমার অকাল কৌমার্য্যে বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশেষে বাবার মূঢ়তার নিন্দাবাদে প্রচুর পরিতৃপ্তি সঙ্গে লইয়া গৃহে ফেরেন। এমন কি, এই সমবেত জল্পনায় জ্যেঠাইমার যথার্থ দুঃখের তীব্রতাও ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল ; সারগ্রাহিণী সুন্দরীবর্গের শিক্ষাগুণে মরালের অনুকরণে, তিনিও এই অনিবার্য্য দুঃখকর ঘটনার মধ্য হইতে নিন্দাবাদের সুখটুকু ছাঁকিয়া উপভোগ করতে লাগিলেন। আমারি জীবন কেবল ইহাতে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি ভাবিয়া দেখিলাম, বিবাহের অপেক্ষা,—যাহাকে ভালবাসি না, তাহার পত্নী হওয়া অপেক্ষা এই অশান্তি অসুখও চিরসহনীয় চির-বরণীয়। বিবাহের কথা মনে করিতেই সমস্ত স্নায়ুপ্রণালী এমনি বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে।

দিন যায়। বাহিরের লোকের তীব্র সমালোচনা, জ্যেঠাইমার বাবাকে ভর্ৎসনা, বাবার তাহাকে প্রশান্ত আশ্বাস-প্রদান, এই রকমে প্রতিদিন একই ভাবে কাটে। বিবাহের নূতন কোন কথা বা ছোটুর কোন উল্লেখ আর শুনিতে পাই না, সেই জন্য এই অশান্তি অসুখ স্বত্বেও দিনে দিনে আমি আশ্বস্ত হইতে লাগিলাম, আমার মন হইতে অল্পে অল্পে আশঙ্কার ভাব তিরোহিত হইতে লাগিল ; ক্রমশঃ এতদূর স্বচ্ছন্দভাব অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার মনের নিভৃত চিন্তাগুলি মনোমধ্যে আবার বেশ জমাইয়া গুছাইয়া লইয়া তাহার উপভোগে রত হইলাম। লোকে নিজের দুঃখ ভুলিতে পারিলে পরের দুঃখে সহানুভূতি করিতে অবসর পায় ! আমি আত্মস্থ হইয়া জ্যেঠাইমার ও পাড়াপ্রতিবাসীর কঠোর মন্তব্যগুলিকে অন্যভাবে দেখিতে শিখিতেছি ; তাঁহাদের তীব্রোক্তিতে তাঁহাদের আজন্মকালের মত বিশ্বাসজাত আকুলতা বুঝিয়া ক্রোধ ও বিরক্তির পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির ভাবে তাহা সহিয়া লইয়া একটা প্রশান্ত নিরাশার ক্রোড়ে যখন আপনার আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি, তখন বাবা একদিন আহার কালে বলিলেন,—"ছোটু দু এক দিনের মধ্যেই এখানে আসছেন। তিনি এলেই বিবাহের দিন স্থির হবে।"

জ্যেঠাইমা আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "বর নিজেই আগে আসচে ? তুমি যে বলেছিলে, বরের মা আসবে ? তা বুঝি এল না ! আজকাল এই রকমই হয়েছে, ছেলে নিজে না মেয়ে দেখলে হয় না ! দেখুক, কিন্তু আর দেরী না—এই মাসের মধ্যেই বিয়ে দেওয়া চাই।"

বাবা বলিলেন, "আমারো তাই ইচ্ছা।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আমাতে আর আমি নাই। মনের মধ্যে প্রলয়-ঝটিকা প্রবাহিত। বাবা আহারান্তে বাহিরে গেলেন। আমার আজন্ম-শিক্ষিত ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ এই বিপ্লব-আবেগে তৃণের মত যেন উড়িয়া গেল, আমি উত্তেজিত আলোড়িত মস্তকে গৃহে আসিয়া বাবাকে পত্র লিখিলাম—

"শ্রীচরণেষু

বাবা আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই; ইহা বালিকার খেয়াল মনে করিবেন না। আমি খুব ভাল করিয়া হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিতেছি, বিবাহে আমার সুখ নাই। ইংলণ্ডে ত এমন অনেকেই অবিবাহিতা থাকেন। থাকিয়া দেশের জন্ত কাজ করেন, আমিও দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চাই। আমি বেশ জানি, তাহাতেই আমার একমাত্র সুখ। বিবাহ দিয়া আমাকে অসুখী করিবেন না।

আপনার স্নেহের
মৃণালিনী।"

বাবা আফিসে যাইবার পূর্ব্বেই চাকরের হাতে চিঠিখানি তাঁহাকে পাঠাইয়া উৎকণ্ঠিত কম্পিত চিত্তে ইহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছু পরে পদশব্দ হইল, বুঝিলাম, বাবা নিজেই আসিতেছেন—লুপ্ত লজ্জা সহসা ফিরিয়া আসিল, মনে হইল কি করিয়া তাঁহাকে মুখ দেখাইব! তিনি ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি নত মুখে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ বাবা নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তোমার দেখছি ভারি একটা ভুল সংস্কার জন্মেছে, বিবাহ করলে কি দেশের কাজ করা যায় না! আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা, অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের পক্ষেই বরঞ্চ এসব কাজে বাধা বিঘ্ন অধিক। বিবাহে যে তুমি সুখী হবে, তোমার জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য, সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হবে, তাতে আমার সন্দেহ মাত্র নেই। স্ত্রীলোকের ঐহিক, পারমার্থিক, সকল প্রকার মঙ্গলের জন্যই বিবাহ শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত পথ। তুমি অনভিজ্ঞ অজ্ঞান বালিকা, তোমার কথায় কাজ ক'রে আমি তোমার অমঙ্গলের কারণ হতে পারিনে। এত দিন যোগ্য পাত্রের অভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমার বিবাহ দিতে পারিনি; এখন ঈশ্বরেচ্ছায় সুপাত্র মিলেছে, তোমারও সৌভাগ্য, আমারো সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্যে আপনাকে ধন্য মনে করে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করে আনন্দ হৃদয়ে তোমার পতিদেবতাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হও।"

বাবা এইরূপ বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, তাঁহার সঙ্কল্প অটল—আরো বুঝিলাম, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার ক্ষমতা নাই; আমি মর্ম্মে মর্ম্মে দুর্ব্বল বঙ্গনারী, আজ্ঞাবর্ত্তী দুহিতা। জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি—কিন্তু ইহার পরে বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আত্ম-জলাঞ্জলি ভিন্ন আমার উপায়ান্তর নাই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত অথচ কিছুই চোখে পড়িতেছে না, মস্তিষ্ক চিন্তাতরঙ্গে আলোড়িত, অথচ কি ভাবিতেছি, কিছুই জানি না। মন স্থানহিসাবেও অতি দূরে, সময় হিসাবেও অতি দূরে, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতেছি কি, না করিতেছি! মাঝে মাঝে কেবল সচেতন বেদনার অনুভূতি, দেহবন্ধন হইতে পলায়নের জন্য একটা নিষ্ফল ব্যাকুলতা, অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিবার জন্য নিদারুণ প্রয়াস, একহস্তে দৃঢ় লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য বৃথা চেষ্টায় প্রাণান্ত পরিশ্রান্তি, অক্ষম কষ্ট ও অসহায় ক্রোধ! ছোটু, যাহাকে এত ভালবাসিয়াছি, এত বন্ধু মনে করিয়াছি—সেই আমার কষ্টের কারণ! সহসা ভাবিতে প্রাণের মধ্যে দৈববাণী শুনিলাম,—"তাহা কিছুতেই হইতে পারে না, চিরদিন সে তোমার বন্ধু ছিল—চিরদিন বন্ধু থাকিবে, এই বিপদে সেই তোমাকে উদ্ধার করিবে।—" অন্ধকার সমুদ্রে মুহূর্ত্তে যেন দিশা উন্মুক্ত হইয়া গেল; তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতে সঙ্কল্প করিলাম। বুঝিলাম, তাহাতেই আমার একমাত্র আশাভরসা। পুরাকালের স্বর্ণপ্রস্তুত উপায়চিন্তামিশ্র রসায়নবিদের মত এই আবিষ্কারের আনন্দ

আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের পক্ষে অপরিমিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—কিন্তু কাহাকে ইহার ভাগ দিব? এখানে আমার সাথী কে?

একটু পরে একজন চাকর আমার হাতে একখানি কার্ড আনিয়া দিল। কি আশ্চর্য্য! ডাক্তার যে! আনন্দে নহে, বিস্ময়ে আমার হৃৎকম্পন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। আমি কলের পুতুলের মত চাকরকে বলিলাম—"আসিতে বল।"

সে চলিয়া গেলে তখন মনে হইল, আমার কি এখন তাহার সহিত দেখা করা উচিত! কিন্তু উচিত অনুচিত ভাবিয়া আদেশ-পরিবর্ত্তনের তখন আর অবসর ছিল না। প্রায় তখনি ডাক্তার আসিয়া পড়িলেন। এইখানে বলা আবশ্যক, আমি এতক্ষণ ড্রয়িং-রুমেই ছিলাম। অন্তঃপুরের গোলমাল ছাড়াইয়া দুপুরবেলা প্রায়ই আমি এই বিজন গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করি। বাবা না থাকিলে এখানে বাহিরের লোক কেহই প্রায় আসেন না, কদাচ কেহ আসিলেও আমি আগে খবর পাই।

ডাক্তার আসিয়া প্রথম অভিবাদনের পর বলিলেন, —"আপনাকে ভারী রোগা দেখাচ্ছে—আপনার কি এখনো অসুখ যাচ্ছে?"

অসাধারণ সহানুভূতির কথা নহে, যে কোন আলাপী আমাকে এখন দেখিতেন—সম্ভবতঃ ইহাই বলিতেন; তবে এ কথায় আমি এতদূর বিচলিত হইলাম কেন? বহুকষ্টে অশ্রু সংযত করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আপনি এখানে যে? কোথা থেকে আসছেন?"

তিনি বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আমি এখানে আসব, তা আপনি জানতেন না? মিষ্টার মজুমদারকে ত (আমার বাবা) আগেই লিখেছি।"

হাসি পাইল, বাবা যেন সব কথা আমাকে বলিতে যাইবেন! বলিলাম, "কই না, আমি তা শুনি নি। কোনও কেসে এসেছেন বুঝি?"

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"না, আপনাদের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

আশ্চর্য্য হইলাম। আমাদের সহিত দেখা করিতে এতদূর আসিয়াছেন! বিস্ময়ের আবেগে সহসা বলিয়া ফেলিলাম,—"আশ্চর্য্য বই কি? কলকাতা থাকতে কবার দেখা করতে এসেছেন, তা এতদূরে—"

তিনি একটু হাসিলেন; হাসিয়া চশমার মধ্য হইতে আমাদিগকে পূর্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"আমার বিশ্বাস ছিল, অনেক কথা খুলে না বলাতেই আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনের অনেক ভুলের মত দেখছি, এ-ও আমার আর একটা ভুল! আমি যে কেন আসতুম না, তা কি বোঝেন নি আপনি?"

"কি ক'রে বুঝব?"

তিনি আইগ্লাসটা একবার খুলিয়া আবার ভাল করিয়া চোখে আঁটিয়া উন্নত মধুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,- "বেশী আসতে ইচ্ছা করত বলেই আসি নি।"

"তা হ'লে কি মনে করব, এখন ইচ্ছা নেই বলেই—"

"তা হ'লে তবে একটা ভুল করবেন," তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "একটু যে অবস্থান্তর ঘটেছে, তা অস্বীকার করতে পারিনে। তখন শুনেছিলুম আপনি engaged। এখন সে সঙ্কোচ ঘুচেছে—তাই—তাই।"

ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলাম। একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হইল। তাই—তাই—কি? তিনি একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "তাই আমার জীবন প্রাণসর্ব্বস্ব আপনাকে সমর্পণ করতে এসেছি—এখন আপনি যা করেন।"

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আমার চারিদিকে ঘুরিয়া উঠিল, একটা মধুরতার আবর্ত্তে আমি আবর্ত্তিত হইতে লাগিলাম।—কি করিয়া বলিব, তাহা কি মধুর! পুরুষের নিকট হইতে—যে পুরুষকে ভালবাসি, তাহার নিকট হইতে প্রথম শোনা সে আমারি! "পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে, তবে ইহাই তাই!" কিন্তু পৃথিবী সত্যই স্বর্গ নহে, সেইজন্য এত অমিশ্র অসীম সুখ জীবনে কাহারো অধিকক্ষণ থাকে না। মুহূর্ত্ত না যাইতে সুখের অসীমতা দুঃখ আসিয়া সীমাবদ্ধ করে। কিছু পরেই প্রকৃতিস্থ হইলাম, স্বপ্ন ভাঙ্গিল অনতিক্রমণীয় বাধা-বিঘ্ন আবার চক্ষের উপর স্তূপাকৃতি দেখিলাম। বুঝিলাম, এত মধুর আলোক শুধু অন্ধকারের পূর্ব্বসূচনা, তাঁহার আত্মসমর্পণ শুধু চিরবিদায় গ্রহণ করিতে; এ মিলন শুধু চিরবিচ্ছেদ, চিরব্যবধানের জন্য।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি —তুমি—আমার কেমন সমস্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে, মাপ করবেন, বিলাত থেকে এসে যে দিন আপনাকে দেখেছি, সে দিন থেকে বুঝেছি, আপনি ছাড়া আমার জীবন নিষ্ফল; সেই থেকে বহুদিনের"—

হঠাৎ বলিলাম—"কিন্তু আপনি না engaged ?"

"আমি engaged! এ খবর কোথায় পেলেন ?"

"আপনার মা নাকি বলেছিলেন।"

তিনি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মায়ের কথা যে মেয়েটিকে তাঁর পছন্দ হয়—অবশ্য সে জন্য মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-সরস্বতীর যে আবশ্যক, তা বলতে পারছিনে—তাকে তিনি বৌ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এখন বহুবিবাহ প্রচলিত না থাকায় তাঁর বোধ হয় বিশেষ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যাক, আমার কথায় কি কোন উত্তর নেই ?"

কি উত্তর দিব ? আমি কি সমস্ত প্রাণে তাঁহারি নহি; তবে কোন্ প্রাণে বলিব, আমি অন্যের হইতে চলিয়াছি। তবুও বলিলাম, কি করিয়া বলিলাম, ঠিক জানি না,—

"আমি engaged; বাবা অন্যের সঙ্গে বিয়ে স্থির করেছেন।"

একটা শোক-নিস্তব্ধতায় আনন্দোচ্ছ্বাস নিমিষে ডুবিয়া গেল। কিছু পরে তিনি বলিলেন, যেন আপনার বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশির সহিত একত্রীভূত করিতে করিতে আপন মনেই বলিলেন—"কিন্তু মিষ্টার মজুমদার এরূপ ব্যবহার করবেন, আমাকে, —থাক সে কথা তাঁর সঙ্গে। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনারো কি তাই ইচ্ছা ?"

তখন আমার লজ্জা, সঙ্কোচ জ্ঞান ছিল না। আমি পুরুষের মত সুস্পষ্টভাবে বলিলাম—"না, অন্য কাউকে ভালবাসতে আমার শক্তি নেই ?"

একটা বৈদ্যুতিক-স্ফুরণ তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহা কি আনন্দের ? কিছু পরে তিনি বলিলেন, "সে কথা কি আপনার বাবাকে বলেছিলেন ?"

আমি বিস্ময়ে বলিলাম, "সে কথা বাবাকে কি বলব ? এইটুকু বলেছিলুম, আমার বিবাহে ইচ্ছা নেই, তাতে আমি সুখী হব না।"

"তিনি কি বল্লেন ?"

"বল্লেন, আমাকে বিবাহ করতেই হবে।—বুঝলুম, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে আমি অক্ষম, তাঁকে সুখী করাই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।"

"কিন্তু ভালবাসার কি একটু সামান্য কর্ত্তব্যও নেই! তুমি—আপনি যাকে ভালবাসেন, যে আপনাকে ভালবাসে, আপনা ব্যতীত যার জীবন-মরণ সমানই—তার প্রতি—কেবল তার প্রতি না—নিজের প্রতিও এতে যে গুরুতর অন্যায় করা হচ্ছে, তার প্রতীকারের চেষ্টাও কি কন্যাধর্ম্মের বিরোধী ? আমার বিশ্বাস, মজুমদার মহাশয় সমস্ত জানলে কখনই আপনাকে অন্যের সহিত বিবাহে বাধ্য করবেন না।"

চুপ করিয়া রহিলাম। যাহা বলিতেছেন, সবই ত ঠিক। নীরব দেখিয়া তিনি অধীরভাবে বলিলেন,, "আপনার সঙ্কোচ হয়, আচ্ছা, আমি বলব, আমাকে অনুমতি দিন।"

আমি বলিলাম—"না না, আপনার বলতে হবে না; আমি বলব। কিন্তু বাবাকে না, তাঁকে ব'লে কোন ফল নেই, তিনি তাহার ভাব বুঝবেন না, নিশ্চয়ই sentimental দুর্ব্বলতা ব'লে মনে করবেন। আমি তাকে বলব; যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা, তাকে—ছোটুকেই বলব।—তার উদারতার প্রতি আমার খুব বিশ্বাস আছে। আমি বেশ জানি, তার থেকেই আমি মুক্তি পাব। যদিও আমি তাকে কখনও হৃদয় দিতে পারব না; কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকে তাকে ভালবাসি, বন্ধু মনে করি, তার স্মৃতি চিরদিন আমার মনে সুখ জাগায়। সে যে আমার কষ্টের কারণ হবে, আমি কিছুতেই মনে করতে পারিনে।"

"ছোটু! ছোটুর সঙ্গে বিবাহের কথা ? নিশ্চয়ই তার যদি একটুও মনুষ্যত্ব থাকে, অবশ্যই সে সহায় হবে।"

অতিরিক্ত আশানন্দে তিনি নিতান্ত যেন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া এইরূপ বলিলেন। আমি বলিলাম —"তাকে চেনেন কি ?"

তিনি সে কথায় উত্তর করিলেন না; বোধ হইল যেন, তাহা শুনিতে পাইলেন না; নিজের ভাবে ভোর হইয়াই বলিলেন—"কেমন যেন সমস্ত মায়ার খেলা মনে হচ্ছে! আপনি তা হ'লে তাকে বলবেন। আমি এখন যাই। তার সঙ্গে কথা কয়ে কি ফল হয়, যেন শুনতে পাই। হয় ত নিজেই আসব; যদি

আবার কালই আসি, কিছু মনে করবেন না; আপনার বাবার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি।"

বলিয়া কেমন যেন অতি সহসা তিনি চলিয়া গেলেন, আমাকে একটি কথা কহিবার পর্য্যন্ত আর সময় দিলেন না।

———

বিংশ পরিচ্ছেদ

—•—

মহা আনন্দ! বাবা সম্মত! কিন্তু ডাক্তার আর সে পর্য্যন্ত আসেন নাই, তাঁহাকে এ সুখবরটা কিরূপে জানাই? চন্দ্রময়ী নিশা! আমি উদ্যানে বসিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে রাস্তার দিকে চাহিয়া আছি—মনে হইল যেন তিনি যাইতেছেন। উঠিয়া দ্রুতগতিতে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু তিনি তখন এতটা দূরে চলিয়া গিয়াছেন যে, আমাকে দেখিতে পাইলেন না; আমি আবার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু বৃথা, সেই সুদীর্ঘ রাস্তার মোড়ে তিনি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। কাতর চিত্তে পথিপার্শ্বের একটি সুপ্রশস্ত ভূমিতে উঠিলাম—সেখান হইতে দেখিব, তিনি কোথায় গেলেন। কিন্তু তখনি একজন বালিকা সাজিহাতে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এ কি প্রভা যে! আমরা ছেলেবেলা কৃষ্ণমোহন বাবুর পাঠশালায় একত্র পড়িয়াছি। সে বলিল,—"তুমি কোথা থেকে? আমি আজ সবে এখানে এসেছি,ফুল তুলে তোমাকে দিতে যাচ্ছিলুম।"

আমি বলিলাম,—"এইরূপ ভাই বিপদ—তাঁকে খবর দিতে যাব, তা পারছিনে।"

সে বলিল—"এস আমাদের বাড়ী।" এমন সময় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া হাজির। প্রভা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জানিস, ডাক্তার কোথায়?"

সে বলিল,—"জানি বই কি। মণি, তুমি আমার এই ঘোড়ায় চড়; আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।"

ঘোড়ায় চড়িলাম—ঘোড়াটা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একটা পাহাড়ের উচ্চভূমিতে উঠিল, প্রভা ও তাহার ভাই কোথায় পড়িয়া রহিল, তাহার ঠিক নাই। ট্রট, গেলাপ, ক্যান্টার, তাহার পর চারিপায়ে উল্লম্ফন করিয়া পক্ষিরাজের মত উড়িয়া চলিতে লাগিল। আমি প্রাণপণে রাশ ধরিয়া রহিলাম। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল, বুঝি পড়ি পড়ি। রাস্তা দিয়া একটা উট চলিয়া যাইতেছিল, বিপদ দেখিয়া উষ্ট্রবাহক তাহার পিঠ হইতে লাফাইয়া পড়িল—ঘোড়াটাও হঠাৎ থামিল—আমি সেই অবকাশে নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু এখানেই বিপদের শেষ নহে। রাত্রিকাল, অপরিচিত বিজন ভূমি, এখানে আমি নিতান্ত একাকী, এখন কি করিয়া গৃহে ফিরি? হাঁটিয়া রাস্তায় উঠিলাম,—রাস্তাটা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে একটি চোরাগলির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। চারিদিকে উচ্চভূমি; মধ্যে একটিমাত্র ছোট্ট গলি, গলির মোড়ে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরে ঢুকিলাম,—কোমল-মুখশ্রী এক বৃদ্ধা আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"এস মা এস; যাবে কোথায়? বস।"

আমি বলিলাম—"আমি পথহারা।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"বস মা, একটু কফি খাও। সামনে বাগান দেখছ, আমি নিজে হাতে কফিগাছ পুঁতেছি।"

ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, দীপের কাছে বাটীর উপর নানারকম দ্রব্যসামগ্রী ফেলাছড়া। আমি বলিলাম, "এখানে এ সব জিনিসপত্র প'ড়ে কেন?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"সে আস্‌বে ব'লে চ'লে গেছে, এখনো আসে নি—এখনি আসবে।"

আমি বলিলাম, "কে গো?"

বুড়ী বলিলেন "আমার সোনার চাঁদ বৌ গো।"

বুঝিলাম—তিনি পাগল। তাঁহার বৌ মরিয়াছে; বধূর অলঙ্কার তৈজসাদি লইয়া তাহার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন। আমার চোখ দিয়া জল পড়িল। বুড়ী বলিলেন, "মা তুমি কে গো? আমার বৌ কি ঘরে ফিরে এলে? ও ছোটু আয় রে! আহা, সেই যে বাছা আমার মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেছে—এখনো ঘরে ফেরে নি।" আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল,—অশ্রুজলে আমি জাগিয়া উঠিলাম।

উঠিয়া ঘড়ি দেখিলাম,—ডাক্তার যাইবার পর আধ ঘণ্টাও অতিবাহিত হয় নাই।—আর আমি পাঁচ মিনিটও ঘুমাইয়াছি কি না সন্দেহ।—মনের মধ্যে কেমনতর একটা নিরাশার গুরুভার লইয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। ছোটুকে ত সব বলিব

ভাবিতেছি—বলিলে পরিত্রাণ পাইব এমনো মনে করিতেছি, কিন্তু যদি আমার ভুল হয়? আমি তাঁহাকে যেমন্ ভাল লোক মনে করিতেছি, সে তেমন নাও হইতে পারে। বাস্তবিক আমি তাহাকে কি চিনি।—আর যদি এমনতরই হয়, ছোটু আমাকে এখনো ভালবাসে? সেই জন্যই আমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে? তাহা হইলে আবার একজনের কিরূপ কষ্টের কারণ হইব! অতিশয় ব্যাকুল অশান্তহৃদয়ে আকাশের দিকে চাহিলাম,—ঈশ্বরের অনুগ্রহলোলুপ হইয়া কাতরচিত্তে অনন্ত নিরীক্ষণ করিলাম।—আকাশে সান্ধ্য মেঘে বর্ণের তরঙ্গবিন্যাস। শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, লাল, পীত ও হরিৎ নানা আভার একত্রে স্তরে-স্তরে পুঞ্জীকৃত। সাদায় কালোর ছায়া, লালে নীলের বেষ্টন, ধূসরে গোলাপীর সংমিশ্রণ। দেখিয়া মনে হইল, এই ত সংসারের নিয়ম! দুঃখ ছাড়া কোথায় সুখ; অশ্রুহীন হাসি কোথায়? আমার প্রাণান্ত আকাঙ্ক্ষাতে সাধনাতেই কি তবে ইহার অন্যথা হইবে? আমি কে? সৃষ্টির একটি অণুকণা; বিধাতা আমার জন্য কি তাঁহার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবেন?

ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে পিয়ানোর কাছে আসিয়া বসিলাম, জানিতেও পারিলাম না। আনন্দে বাজাইতে লাগিলাম—

হায় মিলন হোলো!
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো!
হাতে ক'রে মালাগাছি, সারা বেলা ব'সে আছি,
কখন্ ফুটিবে ফুল—আকাশে আলো।
আসিবে সে বর-বেশে, মালা পরাইব হেসে,
বাজিবে সাহানা তানে বাঁশী রসালো!
সেই মিলন হোলো!
আসিল সাধের নিশা, তবু পূরিল না তৃষা,
কেমন কি ঘুমে আঁখি ভরিয়ে এল!

আর জানিতাম না, এই ক'টি লাইনই বারবার বাজাইতেছি, সহসা পশ্চাৎ হইতে ইহার অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া কে গাহিল—

শুভক্ষণে ফুলহার, পরান হোল না আর
হাতের সুগন্ধি মালা হাতে শুকাল;
নিশিশেষে আঁখি মেলে, বাসি মালা দিনু গলে,
মরমে বেদনা নিয়ে নয়নে জল।
হায় মিলন হোলো!

গীতবাদ্যের সুরকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব কম্পন উঠিল। কে গাহিতেছেন, তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত না করিয়াই আমি মুগ্ধ আবেশ-বিভোর হইয়া গানের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বাজাইয়া চলিলাম। তিনি যখন থামিলেন, যখন ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিলাম, তখন বর্ত্তমান অতীতে, যৌবন বাল্যে বিলুপ্ত। আমি বিস্ময়ে বিভ্রমে বলিতে যাইতেছি, "তুমি ছোটু—তুমি ছোটু!" কিন্তু বলা হইল না, প্রাণের কথা ওষ্ঠাধরে আসিয়া মিলাইয়া গেল। তখনি বাহিরে পদশব্দ শুনিলাম, আশ্বস্ত হইয়া বুঝিলাম, বাবা আসিতেছেন, সভয়ে সঙ্কোচে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা আসিয়া বলিলেন,—"এই যে বিনয়কুমার! মণি, তুমি এঁকে চিনেছ কি? ইনিই ছোটু!"

এখনো কি স্বপ্ন দেখিতেছি? নিশ্চয়ই!!!

উপসংহার

তেমনি উজ্জ্বল-মধুর সন্ধ্যায় তেমনি মেঘের স্তর, তেমনি বর্ণবিন্যাস, ছায়া আলোর তেমনি লীলাখেলা, কেবল মনের ভাব আজ অন্য রকম।

আজ আমি দিশাহারা, একাকী নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যথিতচিত্তে অকূল আকাশ-সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছি, 'না—সুখ কোথায়? সুখ কেবল দুঃখের অন্ধকারে, হাসি কেবল অশ্রুর তাপে, ফুটিতে না ফুটিতে টুটিয়া ঝরিয়া যায়।' আজ কাননতলে দু'জনের, প্রেমে মগ্ন দু'জনে, আকাশের বর্ণমিলন-সৌন্দর্য্যে হৃদয়ে অন্য ভাবের সুর বিকম্পিত! আজ মেঘে মেঘে লাল-কালোর মিলন দেখিয়া আমি ভাবিতেছি, 'অশ্রু আছে বলিয়া হাসির এত মাহাত্ম্য, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ এত মধুর!' তিনিও কি ঠিক এইরূপই ভাবিতেছিলেন! আমার নীরব চিন্তা ভঙ্গ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—Happiness is not happy enough but must be drugged by the relish of pain and fear.

অতি সুখে দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি অনুতাপব্যথা জাগিয়া উঠিল, আমি এত সুখী, আর

মিটায় বোধ ? যদি সত্যই তিনি আমাকে ভালবাসিয়া থাকেন—তাঁহার প্রতি কতদূর অন্যায় করিয়াছি ? আমার ভাবনা কি ইঁহারো মস্তিষ্ক স্পর্শ করিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"ওঃ, একটা খবর আছে!—কুসুমের সঙ্গে রমানাথের বিবাহ! What a humbug—beg your pardon, I mean what an examplary lover!"

আর বেশী কিছু না বলিতে দিয়াই আমি বলিলাম—"সত্যি নাকি ? কবে ?"

"আমাদের বিবাহের এক সপ্তাহ আগে।"

গাছের আড়াল হইতে নবোদিত চন্দ্রের জ্যোতি ইঁহার মুখে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। আমি মুগ্ধ নেত্রে সেই রূপের জ্যোতি পান করিতে লাগিলাম।

দুই কলায় মাত্র অসম্পূর্ণ ত্রয়োদশীর নির্ম্মল চন্দ্র নীলাম্বরতলে ভাসিয়া উঠিয়াছে, শেফালিকা-রাশি আমাদের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া সুগন্ধে জ্যোৎস্নালোক বিকম্পিত করিতে করিতে, কাননতলে তারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। শরতের জ্যোৎস্না ঈষৎ ম্লানাভ, তাহার ছায়া, ছায়া-আলোক আমাদের অতি সুখে ম্রিয়মাণ হৃদয়ের মত বিষাদ স্নিগ্ধ, অতি কোমল-মধুর!

থাকিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম—"আচ্ছা, আপনি—কি ক'রে—"

"আবার আপনি ? তবে আমি শুনব না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা তুমি,—কি ক'রে তুমি আমাকে এতটা দুঃখ দিলে ? যখনি আমার কথা থেকে বুঝলে, তোমার সঙ্গেই বাবা সম্বন্ধ করেছেন, তখন সেটা—"

"বুঝলুম বটে, কিন্তু কি ক'রে জানব, যা বুঝছি, তাই ঠিক, ভুলও ত হ'তে পারে ?"

"তাই আমাকে অমন কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখে গেলে—বেশ যা হ'ক।"

"বুঝছ না, আমি ভাবলুম, কেবল তোমার বাবার সঙ্গে একটিবার কথা কয়ে তখনি আসব, তার পর বিনয়কুমার ছোট্ট হয়ে দাঁড়াবে—"

"ভারী একটা কৌতুক-নাটক অভিনয় হবে। সে লোভটা কি আর সামলান যায়! তা আমার কেন ইতিমধ্যে যতই কষ্ট হ'ক না! এমনি তোমার ভালবাসা!"

"তা বই কি! আর তোমার এমুনি ভালবাসা, আমাকে দেখে চিন্‌তেই পার নি। আমি তোমাকে প্রথম দিন দেখেই চিনেছিলুম!"

"সেটা কি না খুবই আশ্চর্য্যের কথা। যখনি বাড়ী এসেছ, তখনি ত পরিচয় জেনেছ। জেনে শুনে আর চিন্‌তে পারবে না! বরঞ্চ এ অবস্থাতে তুমি যে বরাবর আপনাকে ঢেকে রেখেছিলে—একবার পুরান গল্প করতে ইচ্ছাও হয়নি—এইটেই পরমাশ্চর্য্য! তোমার ভালবাসা এখানেই বোঝা যাচ্ছে।"

"ঠাকরুণ যে engaged ছিলেন! সেটা ভোলেন কেন ? তার পর যখন দেখলুম, মহাশয় বাল্যবন্ধুকে চিন্‌তেই পারলেন না, তখন ভাবলুম, মানে মানে চুপ ক'রে যাওয়াই ভাল, কি জানি, যদি পুরান পরিচয়ে বন্ধুত্বের দাবীটাই অসহ্য হয়ে ওঠে! তুমি ত আর পুরান আমাকে ভালবাস নি, তুমি ভালবেসেছ একজন নূতন লোককে!"

"তুমিও ত আর আমাকে ভালবাস নি। তোমার প্রেম পুরাতনের উপর, তুমি ভালবেসেছ তোমার বাল্যসখীকে।"

আগে মনে করিতাম, প্রেম বুঝি মতামত, স্বতন্ত্র ভাবে একাকার হইয়া যায়। এখন দেখিতেছি, ছায়ালোকের মত, আকর্ষণ-বিকর্ষণের মত প্রেমে দ্বন্দ্ব কলহ মানাভিমান অবিচ্ছেদ্য। তাহাতেই ইহা চিরনবীন—চিরজীবন্ত।

অন্ততঃ আমাদের জীবনে, প্রেমালাপ অনবরত এইরূপ দ্বন্দ্বময়। আমি বলি, 'তুমি আমাকে ভালবাস নাই, ভালবাসিয়াছ তোমার বাল্যসখীকে।'

তিনি বলেন, 'তুমি আমাকে ভালবাস নাই, ভালবাসিয়াছ নূতন লোক ডাক্তারকে!'

এখন পাঠক মীমাংসা করুন—ঠিক কি ? পুরাতনের ছায়া দেখিয়াই হৃদয় নূতনে আকৃষ্ট হইয়াছে, অথবা নূতনে মুগ্ধ হইয়া সহসা পুরাতন লাভ করিয়াছি ? কাহাকে ভালবাসিতে এ কাহাকে ভালবাসিয়াছি ?

সমাপ্ত।

মালতী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরমধ্য দিয়া, বালুকাময় বেলাভূমি চুম্বন করিয়া সুখময়ী নদী বঙ্কিমভাবে বহিয়া যাইতেছে। তীরে সুরম্য উপবন-বাটিকা। উপবনে স্থানে স্থানে বসিবার জন্য উচ্চাসন। একখানি সুপ্রশস্ত প্রস্তরাসনের উভয় পার্শ্বে মালতী-লতাবেষ্টিত দুইটি ঝাউ-গাছ, তাহার তলায় দুইজনে বসিয়া গল্প করিতেছেন। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; চতুর্থীর চাঁদ, নিরাশ হৃদয় ক্ষীণ আশার মত গগন-প্রাঙ্গণের একটি ধারে মলিন জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়াও যেন করিতে পারিতেছে না; চঞ্চল নদী-বক্ষ ঈষৎ উজ্জ্বল করিয়া, ফুটন্ত মালতী ফুলগুলিকে আরও বিকসিত করিয়া, মালতীর মুখে সেই চাঁদ পড়িয়াছে। মালতী ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা। মালতী জ্যোৎস্নাময়ী-প্রতিমা, মালতী মৃদুহাস্যময়ী কুসুম-কলিকা। মালতী কথা কহিতে কহিতে একবার চাঁদের দিকে চাহিয়া দেখিল, একবার জ্যোৎস্নাধৌত সুখময়ীর তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস দেখিল, একবার সন্ধ্যাসমীর-আন্দোলিত মালতীলতা হইতে কতকগুলি ফুল লইয়া দেখিতে দেখিতে হাসিয়া বলিল,—

"দাদা, আর দশ দিন আছে মাত্র, তবুও আমার মনে হচ্ছে, দিন বুঝি আর ফুরোবে না!"

যুবকের হর্ষোৎফুল্ল মুখ এই কথায় আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ঈষৎ রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইল, যুবকের মৃদু হাসিতেই মালতীর কথার উত্তর হইল। মালতী গোলাপ-কলির মত রাঙা মুখখানি নাড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া আবার বলিল,

"দাদা, আমরা এই দুটি প্রাণীতেই এখানে আছি; শোভনা এলে আমাদের একটি লোক বাড়বে। দিনের বেলা যখন তুমি কাজে যাবে, আমাকে আর একলা থাকতে হবে না।"

যুবক ব্যারিষ্টার, কিন্তু এ কার্য্যে পসার করিতে না পারিয়া মুন্‌সেফ হইয়া পল্লীগ্রামে আসিয়াছেন। বালিকার কথায় তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সেই জন্যই মালতি, তোর বুঝি এত আহ্লাদ?"

মালতী ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, "না দাদা, তা নয়! আমি শোভনাকে যে কত ভালবাসি, তা তুমি জান না।"

যু। তাকে না দেখেই তোর ভালবাসা কি ক'রে হোলো? তোদের বুঝি স্বপ্নে-স্বপ্নেই ভাব হয়ে যায়?

মা। আমি নাই বা দেখলুম, তোমার কাছে তো তার কথা শুনেছি! তাতেই আমার ভালবাসা হয়েছে, তাকে দেখতে যে কি ব্যগ্র হয়েছি, তা আর কি বলব। বিয়ের আগে, দাদা, তাকে কি একদিন দেখাবে না? একদিন কল্‌কাতায় নিয়ে চল না।

যু। অত দূর ট্রেণে যাতায়াত তোর পক্ষে কি না বড় সহজ ব্যাপার। নইলে কি আর আমাকেও কথা বলতে হয়? শোভনাও যে তোকে কতবার দেখতে চেয়েছে, তার ঠিক নেই!

মা। তবে কি, দাদা, সেও আমাকে ভালবাসে?

যুবকের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে বালিকা তখনি আবার বলিল, "দেখ দাদা, মা মারা গেলেন, তুমি বিলাত গেলে, আমার সে কটা বছর যে কি কষ্টে গেছে, তা আমিই জানি! পিসীমারা কত আদর-যত্ন করতেন, কিছুতেই মন ঠাণ্ডা হ'ত না, সেখানে একটিও সমবয়সী নেই —সেখানে কি প্রাণ বাঁচে! আমার যদি তখন শোভনার সঙ্গে আলাপ হোত! আচ্ছা দাদা, তোমার সঙ্গে তার প্রথমে কোথায় দেখা হোল?

যু। কতবার বলব?

মালতী। হাঁ্যা হাঁ্যা, চারু দাদার বাড়ী নিমন্ত্রণে! আমি কেন সে দিন সেখানে রইলুম না! দেখতুম, তোমাদের কি ক'রে ভাব হোল। আঃ! কবে

বিয়ে হবে! আমার যেন কিছুতেই আর সবুর সচ্চে না। আমার যে আহ্লাদ হচ্ছে, কি বলব! তুমি যখন না থাকবে, তাতে আমাতে আমার ঐ বাগানটিতে বেড়াব, তাকে কত সাজাব, তুমি এলে দেখে কত খুসী হবে, আর আমরা দুজনে কত গল্প করব!

যু। তুই দেখছি, এখন থেকেই মনে মনে সব কল্পনা ক'রে নিয়েছিস।

সহসা গল্পের মধ্যে বালিকা মৌন হইয়া পড়িল। তাহার প্রফুল্ল মুখখানি বিষাদে আচ্ছন্ন হইল, যুবার কথায় কান না দিয়া সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দাদা, আহা আজ যদি মা থাকতেন, তাঁর এ বিয়েতে কত আহ্লাদই হোত।"

যুবাও যেন এই কথায় বিমর্ষ হইলেন, কি যেন ভাবিতে ভাবিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "তিনি থাকলে কি এ বিবাহ হোত?"

বালিকা আশ্চর্য্য হইল। বালিকা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিল, "তিনি থাকলে কি এ বিবাহ হতো না? কেন?"

যুবক নিস্তব্ধ, গম্ভীর, এ কথায় তিনি কোন উত্তর করিলেন না।

বালিকা আবার প্রশ্ন করিল, "দাদা, মা থাকলে এ বিবাহ হ'ত না কেন?"

যুবা ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তিনি থাকলে কি আর আমার বিলাত যাওয়াই হোত—না এতদিন অবিবাহিতই থাকতুম!"

মালতী। কেন, মা ত বলেছিলেন, তোমাকে বিলেত পাঠাবেন। তুমি নিশ্চয়ই আমার কাছে কোন কথা ঢাকছ।

যুবা তখন সসঙ্কোচে ধীরে ধীরে স্থিরগম্ভীরভাবে বলিলেন, "মালতি, তুই এখন বড় হয়েছিস, তোর এখন সকল কথা বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে, এতদিন ধ'রে সত্যিই আমরা তোর কাছে একটা কথা লুকিয়ে এসেছি, আজ তা' বলব; মালতি তুই আমার সহোদরা ন'স।"

মালতী রমেশের সহোদরা নহে! মালতীর তবে সংসারে কেহই নাই! যুবাকে সে একমাত্র সংসার-বন্ধন—একমাত্র ভাই বলিয়া জানিত; যুবাও তাহার ভাই নহেন—কথাটি বজ্রের মত মালতীর বুকে পড়িল। যুবা আবার বলিলেন, "মালতি, তুই মায়ের একজন সখীর মেয়ে। তোর যখন এক বৎসর বয়স, তখন তোর বিধবা মা'র মৃত্যু হয়। সেই থেকে আমার মা তোকে গ্রহণ করেন।—তখন আমার বয়স সাত বৎসর, সেই জন্য সে সব কথা আমার বেশ মনে আছে। মায়ের ইচ্ছা ছিল, তোর সঙ্গেই আমার বিবাহ দেন, তাতেই মনে হয়, মা থাকলে এ বিবাহ হোত কি না সন্দেহ।"

সব কথাগুলি মালতীর কানে গেল না, সে চারিদিক্ যেন অন্ধকার দেখিল, কি একটা অসহ্য বেদনায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—অথচ তাহার কারণ সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

যাহাকে অন্ধকারমধ্যে আলো বলিয়া জানিত—আর অন্য আপন কেহ না থাকা সত্বেও যে ভাইটিকে পাইয়া তাহার আর কোন অভাব মনে হইত না—যাহাকে সে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসে—সে তাহার ভাই নয়, সে তাহার কেহই নয়, তাহার সহিত কোন সম্পর্কই নাই! সে ভালবাসাতেও তাহার অধিকার নাই! এ সংসারে মালতী অনাথা বালিকা, রমেশের ন্যায্য স্নেহের সামগ্রী নহে, তাহাতে তাহার দাবী নাই, তাহার কৃপাভাজন আশ্রিতা মাত্র! হয় ত এই কারণে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল, কিন্তু এত কথা তাহার মনে আসে নাই। কি যে তাহার কষ্ট, কষ্টের কথা যে রমেশ কি বলিলেন, সে তাহা বুঝিল না, অথচ অকারণে কি এক মর্ম্মভেদী তীব্র যাতনায় হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র মেঘের কোলে ঢলিয়া, পড়িল, উদ্যান, নদী, পৃথিবী, সঙ্গে সঙ্গে চিরহাস্যময়ী মালতীর হৃদয়ও অন্ধকার করিয়া চন্দ্র আজ অস্তমিত হইল। শোক-বিহ্বল-চিত্তে অজ্ঞানের মত বালিকা নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

রমেশ যেন তাহার মনের ভাব বুঝিলেন, ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "মালতি, কাঁদিস কেন? আমার সোদরা না হ'লেও তুই আমার বোন! আমি সোদর না হয়েও তোর ভাই। কোন সম্পর্ক না থাকিলেও আমাদের এই আশৈশব-উপচিত স্নেহ কোন কালেই ঘুচবে না, চিরজীবনের মত হৃদয়ে বদ্ধমূল। তুই জানিস, মালতি, আমার আপনার বোন হ'লেও তোকে আমি এর অপেক্ষা অধিক ভালবাসতে পারতেম না; আমাদের এ ভালবাসা অচ্ছেদ্য, বিশুদ্ধ, স্বর্গীয়। ইহা দেবতার পক্ষেও লোভনীয়!"

মালতীর অশ্রুজল শুকাইল, মালতীর বিষাদময়ী মূর্ত্তি এই কথায় আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল! যদি তাহাদের সেই ভালবাসাই রহিল, যদি মালতী তেমনি করিয়া হৃদয় পূরিয়া ভালবাসিতেই অধিকারী হইল, তবে আর মালতী কি চায়—তাহার আর তবে কিসের দুঃখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—•—

দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—ঘটনা-রূপ পদচিহ্ন প্রত্যেক মানুষের জীবনে অঙ্কিত রাখিয়া এই দুই তিন বৎসর কাল অতীতের রাজ্যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

সুসজ্জিত কক্ষ উজ্জ্বল বেলোয়ার দীপালোকে আলোকিত। শোভনা প্রস্তর-টেবিলের নিকট একখানি চৌকিতে বসিয়া জাপানদেশীয় সুদৃশ্য পানের ডাবর হইতে মসলা তুলিয়া স্বামীর জন্য সাচিপান সাজিতেছে, নিকটে একটি কৌচের উপর রমেশ অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় হেলান দিয়া সংস্কৃত রত্নাবলী নাটক হইতে শোভনাকে পড়িয়া শুনাইতেছেন। রমেশ বিলাত-প্রত্যাগত হইলেও সংস্কৃত-চর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই। শোভনার পান সাজা হইল, হাত ধুইয়া শোভনা হাতের উপরে চিবুক রাখিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রত্নাবলী শুনিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে রমেশ বলিলেন, "শোভনা, আজ মালতী কোথায়? সে যে আজ এখনো রত্নাবলী শুন্‌তে এলো না?"

শোভনা ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কি ডেকে আনব?"

রমেশ। না, সে কোথায় ফুল তুল্‌ছে, কোথায় পাখীকে পড়াতে শেখাচ্ছে, কোথায় নদীর ধারে নুড়ী কুড়োচ্ছে, তুমি তাকে কোথায় খুঁজে পাবে? সে আপনিই আসবে এখন।

যুবা আবার পড়িতে লাগিলেন,—

"দুল্লহজণঅণুরাও লজ্জা গুরুই পরব্বসো অপ্পা।
পিঅসহি বিষমং পেম্মং মরণং শরণং ণবরিঅমেক্কং॥"

পড়িয়া তাহার অর্থ করিতে করিতে শোভনার দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, শোভনার পদ্মকোরকোপম ফুল্লনয়নে দুই বিন্দু অশ্রু শোভিতেছে। যুবা হাসিয়া বলিলেন, "শোভনা, হঠাৎ যে পদ্মনয়নে শিশিরের শোভা! কবিতাটি কি তোমার এতই মনে লাগিল?"

শোভনা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি কবিতা?"

যুবক দেখিলেন, শোভনা অন্যমনা, শোভনা চিন্তানিমগ্না, শোভনা কবিতা শুনিয়া কাঁদে নাই। যুবার আর পড়া হইল না। বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া শোভনাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, শোভনা, তোমার সে আগেকার হাসি এখন কোথায় গেল? বিবাহের আগে যখন তোমাদের বাড়ী যেতুম, তখন যে একটি প্রফুল্লভাবে তোমার মুখখানি উৎফুল্ল হয়ে উঠত—আজকাল তোমার সে ভাব আর দেখতে পাইনে কেন? তোমাকে সর্ব্বদাই প্রায় বিষণ্ণ দেখি, জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাইনে। শোভনা, আমাকে বিবাহ ক'রে কি তোমার অনুতাপ হয়েছে?"

শোভনার নয়ন হইতে অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল। সে গদ্গদস্বরে কহিল, "সর্ব্বস্ব-ধন! তোমাকে বিবাহ ক'রে আমার অনুতাপ! তোমার সঙ্গে চির-জীবন নরকে বাসও আমার পক্ষে স্বর্গবাস! তোমাকে বিবাহ ক'রে অনুতাপ! কিন্তু—"

যু। 'কিন্তু' কি, শোভানা, বল! তোমার এই রকম ভাব দেখে যে আমার কি ভয়ানক যাতনা হয় তা যদি বুঝতে—

কথাটি শোভনার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, শোভনা ব্যথিত হইয়া বলিল, "ভাই! আমার কি হয়েছে জানিনে! কিন্তু আমার মনে হয়, আমাকে বিবাহ ক'রে তুমি অসুখী হয়েছ।"

যু। সে কি কথা শোভনা! আমার কি কার্য্যে কি কথায়, কি ভাবে, আমি তোমাকে ও রকম মনে করতে দিয়েছি, শোভনা?

শোভনা দুই হস্তে আঁচলের খুঁট নখাগ্রে খুঁটিতে খুঁটিতে আনতমস্তকে বাধ' বাধ' স্বরে বলিল, "নাথ! আমার কি গুণ আছে যে, আমাকে বিবাহ ক'রে তুমি সুখী হবে? আমার এমন রূপ নাই যে, আজীবন সে রূপের ঘোর থাকবে, আমার এমন কিছু গুণ নেই, যাতে রূপের অভাব সত্ত্বেও তোমার হৃদয়কে মুগ্ধ করতে পারি, আমার এমন বিদ্যাবুদ্ধিও নেই যে, আমার সঙ্গে কথা কয়ে তুমি তৃপ্ত হও বা

আমার কাছ থেকে তোমার মনের সকল রূপ ভাবের প্রতিধ্বনি পেতে পার! এক কথায় আমা হ'তে তোমার হৃদয়ের কোন অভাবই পূরণ হ'তে পারে না! এমন কি, তুমি যে গান শুনতে এত ভালবাস, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাও আমার আসে না! তবে কিসের জন্য তুমি আমাকে ভালবাসবে? রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুতেই তোমার সমকক্ষ হওয়া দূরে থাক, কিছুতেই আমি তোমার পায়ের নখের কাছেও দাঁড়াতে পারিনে, আপনার অযোগ্যতা আমি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বুঝতে পারি। আগে মনে করতুম, রূপগুণ নাই থাক, আমার এ অসীম ভলবাসার তো প্রতিদান আছে, কিন্তু এখন আর তাও মনে করতে পারিনে—"

রমেশ নিস্তব্ধে সকল শুনিলেন। শোভনার কথা শেষ হইলে তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "শোভনা, কে বলে যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে তুমি আমার অসমযোগ্য। ক'জন পুরুষ আজ এ বিষয়ে তোমার মত বক্তৃতা করতে পারত! আর তোমার রূপের বিচারক—সেও তুমি নও, আমি। এই যদি তোমার কষ্টের কারণ হয়, তবে আশ্বাস দিচ্ছি, তোমার কষ্ট অমূলক। না, শোভানা, ঠাট্টা নয়, কোন দেবী তোমা হ'তে রূপগুণবতী, তা তো আমি জানি নে! আর তা হ'লেও আমি কোন স্বর্গীয় দেবীর সঙ্গে তোমাকে বিনিময় করতে প্রস্তুত নই—তুমি আমার হৃদয়ের রাণী আমার দেবতা. তুমি আমার কে ন'ও, আমি বলতে পারিনে—তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তোমাকে পেয়ে আমি সুখী নই, শোভনা? তুমি আমার সুখের প্রতিমা!"

শোভনার আহ্লাদে কথা ফুটিল না। শোভনার তবে কি-- তবে সকলই এই কল্পনামাত্র, সকলি ভ্রম? শোভনা স্বামীর চরণে মাথা লুকাইয়া বলিল, "আমি পাপী, নরকেও আমার স্থান হবে না-তাই—তোমার মত স্নেহময় স্বামীর প্রতি সন্দেহ করেছি। আমার কিসে প্রায়শ্চিত্ত হবে জানিনে—কিন্তু আজ যখন মন খুলতে বসেছি, মুক্তকণ্ঠে আমার হৃদয় খুলব —আমি যে কি নরক-যন্ত্রণা মৌনে সহ্য ক'রে আসছি, আজ তোমাকে খুলে বলব; যদি আমার অপরাধের মার্জ্জনা না থাকে, তবে তুমিই তার শাস্তি দাও, তোমার হাতেই আমার জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে। নাথ! আমার হৃদয়ে দাবানল জলছে, তোমার মত দেবতুল্য স্বামী পেয়েও আমার নিজের মনের গুণে আমি সুখী হ'তে পারলুম না। হৃদয়ধন, আমার মনে হয়, তুমি আর আমাকে ভালবাস না -- তুমি—মালতীকে—"

শোভনার আর কথা ফুটিল না, লজ্জায়, অনুতাপে, কষ্টে সে থামিয়া পড়িল।

যুবা তাহার কথায় বিস্মিত হইলেন। তাহার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন না, ধীরে ধীরে তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "শোভনা, কি বল্লে? মালতীকে কি?"

শোভনা থামিয়া থামিয়া বলিল, "ভালবাস।"

যুবা বিস্মিত নেত্রে বলিলেন, "মালতীকে ভালবাসি! এর মর্ম্ম? মালতী আমার বোন না হয়েও আমার বোন—তাকে তো আমি ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি।"

এই কথায় শোভনার আবার কথা কহিবার শক্তি জন্মিল। সে দৃঢ়তর স্বরে বলিল, "এ আমি সে ভালবাসার কথা বলছিনে—আমার চেয়েও বেশী ভালবাস, এ প্রেমের ভালবাসা!"

"প্রেমের ভালবাসা!" যুবা অবাক্ হইলেন, যুবা এতক্ষণে শোভনার মন বুঝিলেন! তাঁহার কষ্টের ভিতর একটু হাসিও আসিল। তিনি বলিলেন, "শোভনা, তা হ'লে কি মালতীকে বিবাহ করতুম না? তবে তোমাকে বিবাহ করলুম কেন?"

শো। যখন বিবাহ করেছিলে, তখন আপনার মন বোঝ নি।

যুবা। তা যদি না বুঝেই থাকি, তা হ'লে এখনও বুঝি নি,—আমি তাকে বরাবর যেমন ভালবাসি, এখনও তেমনিই ভালবাসি; এ ভালবাসা ত বিশুদ্ধ ভগিনী-স্নেহ, এ প্রণয়ের ভালবাসা নয়।

শো। প্রেম যখন অল্পে অল্পে হৃদয়কে অধিকার করে, তখন নিজে তা বোঝা যায় না—তোমার হৃদয় তুমি যা না বোঝ—আমি তা বুঝতে পারি। এই স্থির সন্দেহে যুবার মনে বড়ই আঘাত লাগিল। কি করিয়া তাহা দূর করিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া তিনি বলিলেন, "আমার কি ব্যবহারে তোমার ও রকম ধারণা হ'ল?"

শো। তোমার সকল কথায়, সকল ভাবে, সকল ব্যবহারেই তোমার মনের ভাব প্রকাশ পায়। প্রেমে বাধা না পড়লে অনেক সময় তা পূর্ণতা লাভ করতে

পারে না। হয় তো ছেলেবেলা থেকে তোমার ভালবাসার যে অঙ্কুর হয়েছে, তা তুমি তখন প্রেম ব'লে বোঝ নি; তাই আমাকে ভালবেসে প্রেম মনে করেছ; কিন্তু এখন দেখছি, মালতীকেই তুমি ভালবাস।

যুবা ঈষৎ বিরক্তির ভাবে বলিলেন, "শোভনা প্রেমে বাধা না পেলে তা পাকে না—এ কথা অনেকে বলে বটে, আর তুমিও বলছ, কিন্তু যদি মালতীকে ভালই বাসি, কি বাধা পেয়ে আজ তা পূর্ণতা লাভ করেছে?"

শো। আমাকে বিবাহ ক'রে। আমিই তোমাদের পথের কাঁটা!

এই কথা বলিতে বলিতে আবার কষ্টে শোভনার কথা বন্ধ হইয়া আসিল। যে যাতনা এতদিন হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া নয়নে উথলিয়া উঠিল। কষ্টে অশ্রুজল সংবরণ করিয়া শোভনা আবার বলিল, "নাথ, আমিই তোমাদের পথের কাঁটা! যখন বিবাহ হয় নি, তখন মালতী ছাড়া তোমার আর কেহই ছিল না; মালতীকে নিয়ে সারাদিন গল্প করলে, সোহাগ করলে, কেহই কাঁদবার ছিল না। তখন অবাধে মনের সাধ পুরিয়ে তুমি তাকে স্নেহ করতে পারতে, সাধ মিটিয়ে তাকে ভালবাসতে পারতে,তাতে তোমার সঙ্কোচের কোনই কারণ ছিল না—সেই জন্যে তখন সে ভালবাসা ফুটতে পায় নি—অন্ততঃ তা প্রেম ব'লে বোঝ নি। কিন্তু এখন সকল সময় ইচ্ছা হলেও, মালতীর সঙ্গে মন খুলে কথা কইতে পার না, এখন অনিচ্ছা সত্বেও আমার সঙ্গে থাকতে হয়, আমিই তোমার বাল্যসুখ ভেঙেছি, আমিই তোমাদের ভালবাসার বাধা হয়ে তা প্রেম-রূপে পরিণত ক'রে তুলেছি।"

শোভনার যুক্তি শুনিয়া সেই কষ্টের মধ্যেও রমেশের হাসি আসিল, হাসিয়া বলিলেন, "তুমি শোভনা যে এক দিন কোন ন্যায়পঞ্চাননের সঙ্গে তর্কে জয়ী হবে, তাতে আমার বড় সন্দেহ নাই। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়, তার পর? তোমার সকল যুক্তিই কি ফুরাল —না আরো কিছু বাকি আছে?"

শোভনার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা পড়িল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহা মিলাইল, বিষাদ-গম্ভীর-ভাবে শোভনা বলিল, "ভাই! হেসো না, যদি তুমি আমাকে বোঝাতে পার যে, এটা প্রেম নয়, যদি আমি বিশ্বাস করতে পারি, তুমি আমারি, তা হ'লে আর আমি কি চাই? তা হ'লে আর এ জগতে আমার মত সুখী কে? আমার হৃদয়ে যে আগুন জলচে, তা তুমি কি বুঝবে। আমার কাছে আর এর যুক্তির অভাব নেই। ঐ ভাবনাই একমাত্র আমার তপ, জপ, ধ্যান হয়েছে, সমস্ত দিন-রাত ধ'রে কেবলি আমি ঐ এক কথাই ভাবছি। কখনো সন্দেহে দগ্ধ হচ্ছি, আবার কখন বা বিশ্বাসে বিচলিত হয়ে তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করেছি ভেবে দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছি; এক কথায়, ঐ কথা ভেবে ভেবে আমি যে পাগল হই নি, এই আশ্চর্য্য।"

যুবা। শোভনা, আমি আর শুনতে পারিনে! যাকে দেখে আজ পর্য্যন্ত আমার আশ মেটে নি,যাকে ভালবেসে আমার তৃপ্তি নেই, যার মূর্ত্তি আমার হৃদয় পূর্ণ ক'রে বিরাজিত, তার কাছ থেকে আর এরূপ অবিশ্বাস সহ্য হয় না, এর অপেক্ষা বজ্রেও আমার অধিক বাজতো না।

যুবকের কঠিনতর কথাগুলি শোভনার বুকে বিঁধিল। স্বামীর চরণে ধরিয়া শোভনা বলিল, "নাথ, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করব? আমি থাকতে তোমার আর সুখ নেই। এ জঘন্য ঘৃণিত মন নিয়ে কাউকে কখনও সুখী করতে পারব না, আমি তা বেশ জানি! আমাকে মরতে দাও, আমি এ প্রাণ দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

যুবা শোভনাকে এখনও হৃদয়ের কোথায় রাখিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না, এখনও তাঁহার ভালবাসার উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই! শোভনার কথায় তাঁহার মন গলিয়া গেল, তিনি অশ্রুজল মুছিয়া বলিলেন, "না শোভনা, যা বললুম, তাতে কিছু মনে করো না, তীব্র যাতনায় ও কথা বেরিয়ে গিয়েছে। তুমি হৃদয় খুলে বলেছ, ভালই হয়েছে, তাতে কষ্টের মধ্যেও আমি সুখ অনুভব করছি। তোমার আরও যা সব মনে হয়েছে সমস্ত খুলে বল, কিছু লুকিও না।"

শোভনা বলিল, "আজ যখন মন খুলেছি, তখন আর কিছুই লুকোব না, এতে আমার অদৃষ্টে যাই হ'ক, তা অবাধে সহ্য করব, সঙ্কল্প ক'রেই আমি বলতে বসেছি! সমস্ত শুনে এ পাপীকে পরে চরণে স্থান দাও দিও, নইলে মরতে আমার ভয় নেই, কত শত বার দিন রাতে যে, আমি মৃত্যু-কামনা করি,

তা দেবতাই জানেন?” এই বলিয়া শোভনা অশ্রু-জল-নিষিক্ত নেত্রে ও ব্যথিত-চিত্তে তাহার কথা শুনিবার অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শোভনা আবার বলিল, “নতুন বিবাহের পর, তুমি সন্ধ্যাকালে বাড়ী এসে আমাকে দেখতে যেমন ব্যগ্র হ’তে, এখন আর তেমন দেখতে পাইনে কেন? এখন তার পরিবর্ত্তে কাকে সন্ধ্যাবেলা না দেখলে ব্যাকুল হয়ে পড়? আবার কাকে দেখলে সেই বিষণ্ণ মুখে স্বর্গীয় প্রফুল্লতার ভাব এসে পড়ে! কত সময় তোমার সেই ছবি আঁকবার জন্যে, আমার চিত্রকর হবার ইচ্ছা হয়েছে, কেন না, তা হ’লে তোমাকে তা এঁকে দেখাতে পারতুম! কিন্তু আঁকতে পারি না পারি, তোমার সে ছবি আমার মনে আঁকা আছে। মালতীর সঙ্গে গল্প করতে করতে কেমন ভাবে বিহ্বল হ’য়ে পড়, তা ব’লে বোঝান যায় না। তোমার প্রতি কথায়, প্রতি ব্যবহারে প্রত্যেক ভাবে মালতীর প্রতি তোমার ভালবাসা আমাকে জানিয়ে দেয়, আমাকে জীবন্তে পোড়াতে থাকে প্রতিপদে আমি বুঝতে পারি, মালতী আর আমি তোমার কাছে কত ভিন্ন। আমার কাছে তোমার সেই মন-খোলা হর্ষের হাসি বিকাশ পায় না, আমার কাছে তুমি আপনহারা হও না, মালতী না থাকলেই তুমি যেন মুমূর্ষু হয়ে পড়!”

যু। মালতীকে দেখলে যে আমার ভাল লাগে, মালতীকে যে আমি ভালবাসি, তা তো তোমার কাছে কখনই অস্বীকার করি নি, এখনো করছিনে। কিন্তু তুমি আপনার কল্পনার বলে স্নেহ থেকে সেটাকে যে রকম উঁচুতে উঠিয়ে নিয়েছ, তার কিছুই তাতে নাই! তোমাকে কি ব’লে বোঝাব,আমি ভেবে পাচ্ছি নে,যদি বিশ্বাস কর—”

স্বামীকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই শোভনা বলিল, “একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি, তাও আজ আর লুকোব না। কতজনে মালতীকে বিয়ে করতে চায়, তুমি পণ ক’রে আছ, সুকুমার ছাড়া আর কারো সঙ্গে তার বিয়ে দেবে না, সে যে কবে বিলেত থেকে ফিরবে, তার এ দিকে কিছুই ঠিক নেই! এও আমার সন্দেহের একটা কারণ হয়েছিল।”

যুবা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,“সে কি! মালতীর সঙ্গে সুকুমারের সম্বন্ধ স্থির, সে ফিরলেই তার সঙ্গে মালতীর বিয়ে হবে। গেল বার সে পাশ হ’তে পারে নি,এবারও যদি পাশ না হ’তে পারে, তা হ’লে অবশ্য ফিরতে আরও দেরী হবে, কিন্তু তাই ব’লে যার-তার সঙ্গে চটপট মালতীর বিয়ে দিয়ে ফেলতে পারিনে! আর তা দিচ্ছিনে ব’লে এতেও তুমি আমার প্রেম দেখছ? ঈর্ষাতে মানুষকে কি অন্ধই ক’রে ফেলে!”

শোভনা লজ্জিত হইল, আপনার ভ্রম যেন বুঝিল। যুবা আবার বলিলেন, “শোভনা, তুমি ও রকম ভেবে নিজেই আর নিজের অসুখের কারণ হয়ো না। আর আমাকেও এ রকম ক’রে আহত করো না! বল, আমি কি করলে তোমার অবিশ্বাস দূর হবে? যা করতে বল, এখনি করছি। আমার ভালবাসার শপথ ক’রে বলছি, তোমাকে বই আমি আর কাউকে ভালবাসিনে! শোভনা, আমি মালতীকে ছেড়ে চিরকাল থাকতে পারি, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমাকে না দেখতে পেলে আমার কষ্ট হয়। যতক্ষণ বাইরে কাজের জন্যে থাকতে হয়, ততক্ষণ কার কথা সমস্তক্ষণ মনে জাগে? কার জন্য ব্যাকুল ভাবে সমস্ত কাজ ভুলে যাই! কার মূর্ত্তি অন্তরের নিভৃত কক্ষে ধ্যানে দেখে আবার মনে বল পাই? শোভনা! শোভনা! তুমি আর আমাকে অবিশ্বাস ক’রে কষ্ট দিও না,—শোভনা, আমার হৃদয়ে এমন নির্দ্দয় ভাবে আর আঘাত ক’রো না।”

মনের ব্যাকুলতায় যুবা তাহার চরণে হাত দিলেন। চমকিত হইয়া শোভনা তাঁহার হাত উঠাইয়া বক্ষে ধরিল, পৃথিবী তাহার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল, তাহার যেন সমস্ত স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইল। শোভনা তাহার নিজের মত জগতে আর কাহাকেও সুখী দেখিল না। শোভনা বুঝিল,তাহার ঘৃণিত কল্পনাতিশয্যেই নিরর্থক স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে। শোভনার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল। স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া শোভনা কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহসী হইল না। যুবা তাহার মনের ভাব বুঝিলেন, বুঝিলেন,তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে, আর ওরূপ ভাব মনে স্থান পাইবে না। সুখে অভিভূত হইয়া উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

এই সময় মালতী সহসা এই গৃহে প্রবেশ করিল,

হাসিয়া একটি গোলাপফুল যুবার হাতে দিয়া বালিকা বলিল; "দেখ, দেখ, আজ তোমার জন্ত কেমন একটি নতুন জিনিষ এনেছি, আমার সেই শুকনো গাছটিতে আজ নতুন ফুল ফুটেছে।"

সেই শোকাকুল গৃহ যেন মালতীর হর্ষোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইল। মালতীর অজ্ঞান সরল হর্ষের ভাবে যুবার চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। মালতী বালিকা, জানে না,তাহাকে লইয়াই তাহার ভ্রাতার যত বিপদ, তাহাকে ভালবাসে বলিয়াই আজ রমেশ অসুখী. রমেশের শোভনা অসুখী, তাহার জন্যই তাহাদের এত যাতনা। যুবা সেই সরল বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া হর্ষ-বিষাদভাবে একটু হাসিতে হাসিতে গোলাপটি লইয়া আঘ্রাণ করিলেন।

আবার আগুন জ্বলিল। শোভনা সেই হাসি দেখিয়া আর আপনার সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিল না। মানুষ আত্ম-বিরোধী অস্থিরচেতা। এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে শোভনা ভাবিয়াছিল, তাহার মনে আর কখনও ওরূপ সন্দেহ স্থান পাইবে না, কিন্তু কেন যে আবার তাহা আসিল, সে নিজেই বুঝিল না। রমেশের অত কথায় যে ফল হইয়াছিল, রমেশের ঐ মুহূর্ত্তের হাসিটুকুতেই তাহা যেন উড়িয়া গেল। অমন প্রেমময়, অমন স্বপ্নময়, অমন সুখময় হাসি রমেশের মুখে শোভনা আর কখনও দেখে নাই! রমেশ নিশ্চয়ই আপনার মন বোঝেন না—নহিলে এ হাসি কি করিয়া হাসিলেন? কই, ইহা তো শোভনার অদৃষ্টে আর এখন ঘটে না। অমন মধুর সোহাগময় হাসি.—অমন প্রেমে বিজড়িত, আদরে সুমার্জ্জিত, অনুরাগে সুরঞ্জিত হাসি তো আর শোভনার কপালে কখনও ঘটে না! রমেশ শোভনাকে তবে কি এতক্ষণ ছলনা করিয়া ভুল বুঝাইলেন? না, তাহা নহে, রমেশ নিজের মনের ভাব নিজেই বোঝেন না। রমেশ, তবে সত্যই কি তুমি আর শোভনার নও? সত্যই কি তুমি তবে মালতীর? রমেশের সেই হাসি শোভনার মনে জাগিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ে আবার দাবানল জ্বলিয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

সেই দিন হইতে সহস্র কষ্টেও আর শোভনার মুখ ফুটিল না। পূর্ব্বের ন্যায় কখনও সন্দেহ, কখনও বা অনুতাপে তাহার হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু মনে মনেই সে তাহা সহ্য করিবে সঙ্কল্প করিল।

মালতী এ সমস্ত ঘটনার কিছুই জানে না, তাহাকে লইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে যে কিরূপ বিপ্লব চলিতেছে,তাহা সে কিছুই বোঝে না। সেই জন্য তাহার হাসিমাখা মুখখানির হাসি আর নিভিল না। কখনও কখনও মাত্র কুটীরের অন্ধকার সেই জ্যোৎস্নাময়ী বালিকার হৃদয়কেও স্পর্শ করিত। শোভনা আর তাহার সহিত হাসিয়া হাসিয়া বাগানময় ঘুরিয়া বেড়ায় না,আর লুকোচুরী খেলিবার ছলে মালতীকে ফাঁকি দিয়া রমেশের নিকট পলাইয়া গিয়া মালতীকে জব্দ করে না, মালতীর ফুলগুলি ছিঁড়িয়া আর মালতীকে কাঁদায় না—মালতীর সঙ্গে আড়ি করিয়া তাহাকে আর সাধায় না—রমেশের সহিত রাত্রে তাহার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহার গল্প করিয়া তাহাকে আর হাসায় না—আজকাল শোভনা বড় গম্ভীর, বড় বিষণ্ণ! শোভনা বলে, তাহার আর ছেলেমানুষী করিতে ভাল লাগে না। তবে মালতীই কি শুধু চিরকাল ছেলেমানুষ থাকিবে? চিরকাল কি এমনি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবে? মালতী তাহার কথার অর্থ যেন ভাল বুঝিতে পারে না—মালতী অবাক্ হইয়া ভাবে, সে আবার কি? চিরকাল আমরা হাসিব না, খেলিব না? ছেলেমানুষ ছাড়া কি আর কাহাকেও হাসিতে খেলিতে নাই? তবে বিবাহ হইলে আমার কি হাসি-খেলা চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে! মালতী যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহার সহিত রঙ্গ করিতেছে ভাবিয়া সে হাসিয়া হাসিয়া শোভনাকে হাসাইতে চেষ্টা করে—শোভনার সাধের ফুলগুলি তুলিয়া তাহাকে মারিতে থাকে, তাহাতে শোভনার বিষণ্ণ মুখটি প্রফুল্ল না হইলে তখন মালতীর চমক ভাঙ্গে, সে অন্ধকারের ছায়া তখন তাহার হৃদয়কেও স্পর্শ করে। সত্যই তবে শোভনা বড় হইয়াছে, আর সে খেলিবে না, আর সে হাসিবে না, অমনি মালতীও বিষণ্ণ হইয়া পড়ে—তাহার কান্না পায়,

লুকাইয়া কাঁদিবার জন্য সেখান হইতে নিঃশব্দে চলিয়া যায়। একাকী খানিকক্ষণ নদীতীরে বেড়াইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। আসিয়া যদি রমেশকে দেখিতে পায়, যদি রমেশকে প্রফুল্ল দেখিতে পায় তো বড়ই আনন্দ! নহিলে বিষণ্ণ দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে থাকে। সে জানে,স্ত্রীলোকই বড় হইলে সংসারী হইয়া গম্ভীর হয়, বিষণ্ণ হয়, কেন না, শোভনার কাছে সে তাহা শুনিয়াছে, শোভনাতে সে তাহা দেখিয়াছে, কিন্তু রমেশের আবার কেন ও ভাব আসিবে? সে দেখিয়া শুনিয়া বিষণ্ণভাবে না খাইয়া ঘুমাইতে যায়। রমেশকে প্রফুল্ল দেখিলে সে কত কি বকে, কত গল্প করে—কিন্তু বিষণ্ণ দেখিলে কথা কহিতে তাহার সাহসে কুলাইয়া উঠে না। এক দিন রাত্রে শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সঙ্কল্প করিল, এবার বিষণ্ণ দেখিলে সে রমেশকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেই করিবে! ইহাতে তাহার অদৃষ্টে যাহাই ঘটে ঘটুক। কিন্তু প্রত্যাশিত দিন আসিল, পুনরায় সে রমেশকে বিষণ্ণ দেখিল, কিন্তু কই তাহার প্রতিজ্ঞা রহিল কোথায়? সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—কত বার জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া থামিয়া গেল, শেষে না পারিয়া ভগ্ন শরীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নদীতীরে আসিয়া কাঁদিতে বসিল। কিছু পরে হঠাৎ রমেশ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন, মালতীকে একাকী বিজনে কাঁদিতে দেখিয়া যেন আশ্চর্য্য হইলেন, যেন ব্যথিত হইলেন, ধীরে সাদরে তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন, "এ কি মালতি! এখানে কাঁদছিস? মালতী সে কণ্ঠস্বর চিনিল, মালতী মুখ ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল, মালতী আর পারিল না, মালতীর অশ্রুধারা উথলিয়া গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। কেন যে মালতী কাঁদিতেছে, মালতী নিজেই তাহা বুঝিতে পারিল না, সুতরাং সে আর রমেশকে কি বুঝাইবে? রমেশ ধীরে ধীরে অশ্রুধারা মুছাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, মালতী কাঁদছিস "কেন? শোভনা কি তোর সঙ্গে আড়ি করেছে নাকি—মালতি?"

রমেশ জানেন,শোভনা আড়ি করিলেই মালতী কাঁদে। মালতী অনেক কষ্টে অশ্রুপ্রবাহ রোধ করিয়া বলিল, "না, শোভনা আর আড়ি করে না।" এমন বিষাদভগ্নস্বরে মালতী ঐ কথাটি কহিল যে, রমেশ চমকিয়া বলিলেন, "তবে তোর কিসের দুঃখ, মালতি?" মালতী ধীরে ধীরে বলিল, "আড়ি করে না বলেই আমার কষ্ট।" রমেশ হাসিয়া বলিলেন, "তাই তোর এত দুঃখ, তবে আমি আড়ি করতে ব'লে দেব এখন; চল্ তবে তার কাছে নিয়ে যাই।"

মালতী উঠিল না, মালতী হাসিল না, মালতী বিষণ্ণমনে বসিয়া রহিল। মালতী ভাবিতে লাগিল—কি করিয়া সে রমেশের বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। রমেশ দেখিয়া শুনিয়া আবার বলিলেন, "শোভনা আড়ি করে না বলেই তোর এত দুঃখ?" মালতী এবার তাহার ইচ্ছা পুরাইতে সহসা সুযোগ পাইল। সে কত বার থামিয়া থামিয়া অতি ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আরো একটি কারণ আছে—দাদা, তোমার কি হয়েছে? কেন আর সারাদিন তেমন ক'রে গল্প কর না—আমি কি কোন দোষ করেছি?"

মালতীর সরল প্রশ্নে,তাহার সেই শঙ্কিত অর্দ্ধস্ফুট জড়িমা-জড়িত প্রশ্নে রমেশের চক্ষে জল আসিল, একবিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে নামিয়া মালতীর হাতের উপর পড়িল! মালতীর হৃদয় স্তম্ভিত হইল, মুখ শুকাইয়া গেল। মালতী নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করিয়াছে, নহিলে তাহার কথায় রমেশের চক্ষু দিয়া জল পড়িল কেন? মালতীর সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল, কথা আর বাধিল না—ব্যাকুলভাবে আবার মালতী বলিল,—"দাদা, আমি কি দোষ করেছি—বল? তুমি আমার উপর রাগ করেছ? না, রাগ করো না—বল, ভাই, কি দোষ করেছি—"

যুবা তাহার কাতরতায় বিচলিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না, মালতি, তুই তো কিছুই দোষ করিস নি।"

মা। তবে কেন তুমি আর তেমন ক'রে আমার সঙ্গে কথা কও না? কেন আজ আমার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে তোমার চোখে জল এল?

সুখেই যে মানুষ হাসে, তাহা নহে, নিভিবার আগেও প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে—অন্ধকারেও বিদ্যুৎ চমকে। আজ যুবা বালিকার কথায় অতি দুঃখেও হাসিয়া বলিলেন, "মালতি, তোর উপর রাগ করব, এ কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে? না, তা নয়। কি দুঃখে যে আমার আগেকার সে ভাব নেই, কি দুঃখে যে এ কঠোর চোখে জল এসেছে, তাহা তুই কি

বুঝবি, মালতি? আজ তোর মত ছেলেমানুষ অজ্ঞান বালিকা তা কি ক'রে বুঝবে, মালতি?"

রমেশ যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। বিংশতি-বর্ষীয়া হইলেও মালতী বালিকা, হৃদয়ের সরলতায় সে বালিকা, মনের নবীনতায় সে বালিকা। কিন্তু বালিকা হইলেও মালতী স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকে দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী না হইয়া থাকিতেই পারে না—আর কিছু বুঝুক না বুঝুক, পরের ব্যথা বুঝিবার সময় স্ত্রীলোকে আর ছেলেমানুষ থাকে না, অন্য সকল বিষয়ে বালিকা থাকিলেও শত বর্ষের বৃদ্ধও তাহার মত হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের কষ্ট বুঝিতে সক্ষম নহে। বালিকা মালতী আজ গম্ভীর প্রৌঢ়ার মত বলিল, "দাদা, আমি তোমার কথা বুঝতে পারব না? ছেলেমানুষ? তিন চার বৎসর আগে এক দিন কি অন্য রকম ভেবে আমাকেই তোমার মনের কথা বলনি? আমি কি এখনো, দাদা, তার চেয়েও বড় হই নি?"

পৃথিবীতে যথার্থ ব্যথার ব্যথী অতি দুর্লভ। একটি সুন্দর গোলাপ দেখিয়া যত্নে কে না তাহাকে গ্রহণ করে? কে না তাহাকে ভালবাসে? কেন না, তাহাতে চক্ষের তৃপ্তি হয়, তাহাতে নিজের সুখ হয়। কিন্তু সেই গোলাপটি শুকাইলে কে তাহার প্রতি এক মুহূর্তের জন্যও মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখে? ক'জনের চক্ষু হইতে তাহাতে অকৃত্রিম শোকাশ্রু পড়ে? তাহা পড়ে না বলিয়াই অকৃত্রিম অশ্রুর এত আদর, নিঃস্বার্থ ভালবাসার সংসারে এত অধিক মূল্য! স্বর্গ তুচ্ছ করিয়াও লোকে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে—তাহাতে লোকে এত মুগ্ধ হয়। রমেশও মানুষ, তিনিও সে দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারিলেন না,—তাঁহার হৃদয়দ্বার আপনা হইতে খুলিয়া গেল, এক জন ব্যথার ব্যথী পাইবার জন্য তাঁহারও হৃদয় উন্মুখ হইল। তিনি বলিলেন, "আমার কষ্টের কথা শুনবি মালতি? যা হ'তে আমার সুখ, তা হ'তেই মালতি আমার দুঃখ! শোভনা আজকাল কল্পনার প্রাচুর্য্যে নিজেও অসুখী, আর আমাকেও সেই সঙ্গে অসুখী ক'রে তুলেছে।" এই বলিয়া যুবা সংক্ষেপে শোভনার সন্দেহ-বৃত্তান্ত মালতীকে বলিলেন।

মালতী নীরবে অনিমেষনেত্রে সমস্ত শুনিল। মালতীতে আর মালতী নাই। শুষ্ক অধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। দীন যাতনাময় দৃষ্টি শূন্যে সংলগ্ন হইল, মালতী থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিল। যুবাও কাঁদিতে লাগিলেন। নীরবে সেই সন্ধ্যাকালে সুখময়ীর চঞ্চল বক্ষে সে জল মিশাইল। আকাশে চাঁদ নাই, শত শত তারকা উঠিয়াছে। তাহারা সে দুঃখ কিছুই বুঝিল না, কেবল একটু মৃদু মন্দ হাসিল মাত্র। হাসিবে নাই বা কেন—তাহাদের নিকট মমতা কে প্রত্যাশা করে? তাহারা ত অনন্তকাল পর্য্যন্ত হাসিবার জন্যই সৃষ্ট—সুতরাং সেই নির্ম্মমতায় কাহারও হৃদয়কে আহত করিতে পারে না। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, সেই প্রশান্ত সুখময়ী-তীরে জনমানবের আর নাম-গন্ধও ছিল না। রমেশ ও মালতীর অশ্রুজল দেখিয়া হাসিবার, তাহাদের দীর্ঘশ্বাসে উপহাস করিবার, তাহাদের কাতরতায় আমোদ উপভোগ করিবার, এক জনও গুপ্ত বা প্রকাশ্য আত্মীয়পর কেহই ছিল না। যাহাদের মমতাশূন্য মূর্ত্তি দেখিলে অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে না হইতেই নীহারবৎ জমাট হইয়া পড়ে, দীর্ঘশ্বাস আপনা আপনি মরমের নিভৃত কন্দরে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, এমন জনপ্রাণীও সেখানে ছিল না। সুতরাং তাহারা দু'জনে আজ অবাধে কাঁদিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া বালিকা বলিয়া উঠিল,—

"দাদা কি বল্লে? সত্যিই কি শোভনা মনে করে যে, তুমি তার চেয়েও আমাকে ভালবাস? আমি তা হ'লে তোমাদের অসুখের কারণ। আমার জন্যেই তোমার প্রফুল্লমুখ মলিন হয়েছে, শোভনার হাসি নিভে গিয়েছে। আমিই তোমাদের অশান্তির মূল! দাদা, কি কর্‌লে তোমাদের পূর্ব্বের সুখ আবার ফিরে আসে? কি করিলে তোমাদের শান্তি বজায় থাকে?"

মালতীর নিঃস্বার্থ স্নেহ-উথলিত বাক্যে যুবার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন, "মালতি, মালতি, তুই আমাদের অসুখের কারণ? না, মালতি! আমাদের অকারণ—"

মালতীর আজ কথা ফুটিয়াছে! মালতী আর রমেশকে কথা কহিতে না দিয়া বলিল, "না দাদা, আমাকে আর ভুলিও না—আমি তোমার কথায় আর ভুলব না। দাদা, বল, কি করলে তোমাদের সুখ আবার ফিরে আসে? আমি মরলেও কি

তোমাদের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার শেষ হয় না—দাদা?"

সকলরূপ ভালবাসার কি মর্ম্মান্তিক ভাব একই প্রকার? প্রিয়জনের সুখের জন্য মরিতে ইচ্ছাই কি ভালবাসার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস? তাহার কথায় রমেশ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না—মালতীও কোন কথা কহিল না. মনে মনে যাহা সঙ্কল্প করিল, মনেই তাহা রাখিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটিয়া গেল, দু'জনের মনে মনে কত কথা বহিয়া গেল, কিন্তু দু'জনের কাহারও তাহা প্রকাশে প্রবৃত্তি জন্মিল না। ক্রমে দু'জনে এত গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন,দু'জনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন ভুলিয়া গেলেন। একাকী আছেন জ্ঞানে যুবা আপন মনেই যেন বলিয়া উঠিলেন, "যাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি, তার কাছ থেকে অবিশ্বাসই কি একমাত্র উপযুক্ত প্রতিদান। এই দারুণ আঘাতই কি তার যোগ্য পুরস্কার!" এই কথায় মালতীর চিন্তাভঙ্গ হইল। সে বলিল, "কি বল্লে, দাদা? শোভনার চেয়ে তুমি আমাকে ভালবাস—এই কি শোভনার বিশ্বাস?"

যুবা কোন উত্তর করিলেন না। মালতী আবার বলিল, "সত্যিই কি শোভনা মনে করে যে, তুমি শোভনার চেয়ে আমাকে ভালবাস?"

যন্ত্রের ন্যায় যুবার মুখ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইল—"হাঁ।"

সহসা এই সময় শোভনা পশ্চাদ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইল, মালতীর শেষ প্রশ্ন ও যুবার শেষ উত্তর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। আর কোন ভুল নাই, এবার শোভনার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিল - এ তো আর তাহার কল্পনা নহে, মালতী ও রমেশের প্রেমালাপ আজ সে স্বকর্ণে শুনিয়াছে। উন্মত্ত বেদনায় শোভনা অজ্ঞানের মত সেখান হইতে ছুটিয়া কিছু দূরে নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল—আপন সঙ্কল্পসিদ্ধি করিবার পূর্ব্বেই একবার আকাশ, পৃথিবী, নদী ও গৃহের দিকে একে একে চাহিয়া দেখিল. নিমেষের মধ্যে একবার কত কথা তাহার হৃদয়মধ্যে তাড়িতের মত বহিয়া গেল। "আমি কে? আমি কার? আমি যখন আমার স্বামীর নই, তখন আমাকে আর কে চায়? সংসার আমাকে চায় না, সমাজ আমাকে চায় না, আমার আত্মীয়েরাও হয় তো আমাকে চায় না, অন্য সব দূরে যাক—আমি নিজেই আর আমাক চাইনে, তবে বেঁচে আর এ নরক-যন্ত্রণা-ভোগ কেন? আমি আজ মরলে পৃথিবী পূর্ব্বের মতই মেরুদণ্ডে ঘুরবে, সংসার সেই পুরাতন সমানভাবেই চলবে; আবার হেমন্তের পর বসন্ত আসবে, অমাবস্যার পর চাঁদের উদয় হবে, আত্মীয়েরা, বন্ধুরা একবার মাত্র অশ্রুজল ফেলে সেই পূর্ব্বকার মতই আমোদ-প্রমোদ করবে, আর আমার সর্ব্বস্বধন—যার পর নেই সেই স্বামী?—তিনি কি করিবেন? এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলা দূরে থাক, নিষ্কণ্টক হয়েছেন ভেবে তিনি বরঞ্চ সুখীই হবেন। তবে—তবে? আর একবার শোভনা চারিদিকে চাহিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না— অন্ধকার পৃথিবী, অন্ধকার নদীর অন্ধকার জল, তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। শোভনা সেই ঘূর্ণানদীর আবর্ত্তমধ্যে বিঘূর্ণিত হৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শোভনাকে নিকট দিয়া ছুটিতে দেখিয়া কিছু কারণ না বুঝিয়াও রমেশ ও মালতী সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন—শোভনা পড়িতে না পড়িতে রমেশ লাফাইয়া পড়িয়া শোভনাকে তীরে তুলিলেন, মালতী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শোভনাকে লইয়া যুবা তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন! গৃহে আসিয়া তাঁহাকে কৌচে বসাইয়া আপনিও পার্শ্বে বসিলেন। শোভনা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল.যাহা আর কোন কালে দেখিতে পাইবে না ভাবিয়াছিল, পুনরায় আবার সেই সকল পরিচিত সামগ্রী তাহার নয়নে প্রতিভাত হইল। সেই বাড়ী—সেই ঘর—যেখানে বিবাহ অবধি দু'জনে একত্রে কাটাইয়াছে, যাহাতে তাহাদের জীবনের কত সুখদুঃখময় ঘটনা অঙ্কিত আছে,সেই সাধের—সুখের আলয় আবার দেখিল। গৃহে তাহাদের যেমন শয্যা তেমনি সজ্জিত রহিয়াছে,

কৌচের কাছে তেপায়ার উপর রত্নাবলী, উত্তর-রামচরিত, শকুন্তলা তেমনি সাজান রহিয়াছে; আবার যে কখনও স্বামীর সুধাকণ্ঠে তাহা শুনিতে পাইবে সে আশা তাহার ছিল না। দীপটি জ্বলিতেছে, কিন্তু তেলের অভাবে তেমন উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছে না—মুমূর্ষুর জীবনের মত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, 'নিব নিব' হইয়াছে অথচ নিবিতেছে না। শোভনার জীবনও 'নিব নিব' হইয়াছিল, কিন্তু নিবিল না। শোভনা লজ্জায় এতক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই, এইবার চাহিল। যাহাকে—যে হৃদয়সর্ব্বস্বকে আর কখনো দেখিবার আশা করে নাই, তাহাকে কি আবার সত্যই দেখিতেছে? আনন্দপরিপূর্ণ আকুলদৃষ্টিতে সে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশের সেই বিষাদগম্ভীর মুখচ্ছবি দেখিয়া মুহূর্ত্তে শোভনা অনুতাপব্যথিত বজ্রাহত হইল, তাহার চক্ষু নত হইয়া পড়িল, শোভনা নীরবে কাঁদিতে লাগিল, রমেশও নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় মানুষের জীবনকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করে, এমন একটি বহুকালব্যাপী মহাকাণ্ডতেও পারে না। এইজন্যই ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন রাজমন্ত্রী ডিজরেইলি বলিয়াছেন যে, মনুষ্য-জীবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমষ্টি মাত্র। শত শত বৎসরের বিপ্লবে যাহা না করিতে পারে, একটি মুহূর্ত্তের একটি ক্ষুদ্র ঘটনাতে কখনও কখনও তাহা সম্পন্ন হয়। পশু-চুরী অপরাধে দণ্ডিত না হইলে মহাকবি সেক্‌সপীয়রের নাম হয় তো কেহ শুনিতে পাইতেন না। সম্রাট পথের ভিখারী হইয়াও জীবনধারণ করেন; প্রিয়তম পুত্রকন্যা-বিয়োগও সহ্য করিতে পারা যায়, প্রণয়ে আহত হইয়া কত ভগ্ন-হৃদয়ও জীবিত থাকে; আবার কখনও কাহার একমুহূর্ত্তের একটু অনাদর-বাক্যেই হয় তো হৃদয়ের অন্তর-তার সহসা এমন ছিন্ন হইয়া যায় যে, তাহা আর কিছুতেই জোড়া লাগে না; হয় তো জীবনের গতিটা একেবারে এমন বিপথে গিয়া পড়ে যে, কিছুতেই তাহা আর সোজা পথে ফিরে না। আবার তেমনি যে [illegible]হৃদয় ভাগ্যের সকল প্রকার উৎপীড়ন, [illegible] সকল প্রকার অত্যাচার, ভ্রূকুটী করিয়া [illegible] দেয়, যে পাষাণহৃদয়ে শত শত মনুষ্য-[illegible]তেও কিছুমাত্র বিকার জন্মাইতে পারে না; সেই গর্ব্বিত পাষাণহৃদয়ও কাহারও একটি স্নেহ-বাক্যেই একেবারে দ্রব হইয়া যায়, যে আণ্টনি অসীম কষ্টে অপারবিপত্তি অতিক্রম করিয়া অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়াও কেশিয়াস্‌ ও ব্রুটাস্‌কে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই ভীমপরাক্রমশালী মহাবীর আণ্টনিই কি 'ক্লিয়োপেট্রার একবিন্দু অশ্রু-দর্শনে বিজয়ী হইবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেই কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করেন নাই? কিসে যে হৃদয়ের কি হয়—কি প্রাকৃতিক নিয়মে যে তাহা চলিতেছে, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। নিউটন গেলিলিও অনেক ভাবিয়া বাহ্যিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর কবেই বা জন্মাইবেন, কে জানে।

আজিকার সন্ধ্যাকালের এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি হইতে শোভনার জীবন-স্রোত যেন উল্‌টাইয়া পড়িল। শোভনা সকলই স্বপ্ন দেখিল, জলমগ্নের পরক্ষণ হইতে শোভনার জীবন যেন আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। রমেশকে সে পূর্ব্বকার সেই স্নেহময় স্বামীই দেখিল, তাঁহাতে প্রণয় ছাড়া সে আর কিছুই দেখিতে পাইল না। কি করিয়া যে সে একমুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে অন্যরূপ মনে করিতে পারিয়াছিল, শোভনা নিজেই তাহা বুঝিতে অক্ষম হইল।

আস্তে আস্তে তাঁহাদের কথা আরম্ভ হইল, আস্তে আস্তে নূতন প্রেম-সম্ভাষণের মত শোভনা স্বামীর ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রমেশের নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল শুনিয়া তাহার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল। এই অনুতাপ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে উত্থিত, ইহা মিশ্রিত নহে, ইহাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাস কিছুই ছিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, এখনও তাঁহারা সেই জলসিক্ত পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই, তাহা তাঁহাদের গাত্রেই শুকাইয়া গিয়াছে। সহসা শোভনার তাহা মনে পড়িল, রমেশের কাপড়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, "আমার জন্যে কত কষ্টই তোমাকে পেতে হোল! এর চেয়ে যে আমার মরণই ছিল ভাল। কত পুণ্যবলে যাহাকে পেয়েছি, যিনি মাটীতে চল্লে বুকে ব্যথা লাগে, হৃদয় পেতে দিতে ইচ্ছা করে, তাঁকে সুখী কর্‌তে পারলুম না—আমার জন্য তাঁর এত কষ্ট!" শোভনার চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু পড়িল। রমেশ বলিলেন, "শোভনা,

এ কি আর কষ্ট, এখন আমার মত এ সংসারে সুখী কে? তোমার আগের মন ফিরে পেয়েছি, তোমার অবিশ্বাস ঘুচেছে, এখন কি শত শত অন্য বিপদ এলেও আমি তা কটাক্ষে উড়িয়ে দিতে পারিনে? সহসা নিশাকালের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, তাহাদের সেই সুখবিহ্বল মোহ ভঙ্গ করিয়া দূরে নিশীথ-গগন গীতধ্বনিতে পূর্ণ হইল। রমেশ মালতীর গলা চিনিতে পারিলেন। এত রাত্রিতেও মালতী ঘরে আসে নাই, একাকী বেড়াইতেছে। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "শোভনা, মালতী এখনও ঘরে আসে নি, একা বেড়াচ্ছে!" বলিয়াই যেন রমেশের কি মনে হইল, একটু হাসিয়া বলিলেন, "শোভনা, এর থেকে না জানি আবার আমার কত ব্যাকুলতাই, কত প্রেমই দেখবে?" শোভনা লজ্জিত হইয়া বলিল, "সত্যি, মালতী এখনো একলা বেড়াচ্ছে, হয় তো দেখে শুনে কষ্টে সে আজ ঘরে আসে নি। আমি মালতীর কাছে নিতান্ত অপরাধী। আমি যাই—তাকে ডেকে আনি। আমি যাই, তার কাছে কেঁদে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। আমি হাজার দোষ করলেও মালতী কখনও রাগ করে নি, আজ কি আমি পায়ে ধরলেও সে আমাকে মার্জ্জনা করবে না?"

রমেশ বলিলেন, "না শোভনা, বাইরে বড় অন্ধকার। মালতী কোথায় তার ঠিক নেই, তোমার গিয়ে কাজ নেই, আমি খুঁজে আনি।"

সহসা আবার গীতধ্বনি উথলিয়া উঠিল। মুক্ত বাতায়নপথে স্পষ্টরূপে কথাগুলি তাহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহারা শুনিলেন,—

"দূর বিজন বনে একাকী যাইব চলে,
মানুষ-নিশ্বাস-বায়—যেখানে নাহি উথলে।
অনাথিনী উদাসিনী, যাব চলি একাকিনী,
দোসর আশাও আর রাখিনা মরমতলে।
ভালবাসা-প্রতিদান, সে আশাও অবসান,
অবসান সুখ-আশা সুখ-সাধ এ কপালে।
সুখেরি জনম যায়, এই এ দুখিনী আর
দিবে না সে সুখে বাধা—কাঁদাবে না পলে পলে।
সাক্ষী থেকো রবি শশী, অনন্ত তারকারাশি,
সাক্ষী থেকো গিরি, নদী, তোমরা সকলে—
যতই যাতনা সই, যেখানেই ম'রে রই,
সুখে রব সুখী ভেবে—দেখিও হৃদয় খুলে।'

গানটি তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। সেই বিষাদময় অথচ সুধাবর্ষী গগন-স্পর্শী সুরে রমেশ চমকিয়া উঠিলেন। অজ্ঞাত কারণে তাঁহার হৃদয় বড়ই চঞ্চল হইল, হৃদয়ে কি একটা যেন বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি উঠিয়া গৃহদ্বার খুলিলেন, অমনি সজোরে একটা বাতাসের দমকা আসিয়া দীপটি নিবিয়া গেল, গৃহ অন্ধকারময় হইল। শোভনার অন্ধকারের ভয় ছিল না, কিন্তু সহসা আজ নূতন অজ্ঞাত ভয়ে সে কাঁদিয়া উঠিল। রমেশ এক-বার ফিরিয়া চহিলেন, শোভনার নদীবক্ষে ঝাঁপ দিবার কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সহসা গান বন্ধ হইল, সেই অন্ধকার নিশীথের নিস্তব্ধতা আবার মুহূর্ত্তকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে আপন আধি-পত্য বিস্তার করিল। সেই কেমন একটি স্থির বিষাদ আসিয়া রমেশের হৃদয় অধিকার করিল। রমেশ দৌড়িয়া ব্যাকুলভাবে সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া অন্ধকার নদীতীরে আসিলেন। কেন যে তাঁহার মন এরূপ দারুণ ভারাক্রান্ত হইল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

চারিদিক্ কি অন্ধকার, চারিদিক্ কি প্রশান্ত—কি গম্ভীর, কি নিস্তব্ধ! আকাশে শত শত তারা জ্বলিতেছে, তবু আকাশ অন্ধকার; পাতায় পাতায় অসংখ্য অসংখ্য খদ্যোত জ্বলিতেছে, তবু পৃথিবী অন্ধ-কার। সেই অন্ধকার-নিস্তব্ধতীরভূমি দিয়া চলিতে চলিতে একটি অসাধারণ ভয়ে রমেশ শিহরিয়া উঠি-লেন। তাঁহার হৃদয় যেন রুদ্ধ হইল, চলৎশক্তি যেন রহিত হইল। কিন্তু সহসা একি? এই সৈকত-দেশের ভীষণ নিস্তব্ধতা মুহূর্ত্তের জন্য কিসের শব্দে সহসা এমন ভীষণ ভাবে ভঙ্গ হইল! কই, আর তো শুনা যায় না, নদীর গর্ভে কিছু কঠিন দ্রব্য পড়িবার শব্দ কি এ?

আবার সেই সন্ধ্যাকালের ঘটনার কথা রমেশের মনে পড়িল। রমেশ যেন মনশ্চক্ষে তাহা দেখিলেন, রমেশ কণ্টকিতকায় হইলেন। রমেশের নির্জীব প্রাণে প্রাণ আসিল, শোণিত বেগে বহমান হইল, দেহে আবার বল আসিল। রমেশ কাতরচিত্তে মালতী মালতী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে সেই শব্দ-নির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। মুহূর্ত্তে নদীর ঠিক উপরে এক কৃত্রিম পাহাড়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেইখানে পূর্ব্বোক্ত শব্দতরী

নদীর উভয়কূলব্যাপী সুবিস্তৃত জলস্রোতে যেন ধীরে ধীরে মিশিয়া গেল। রমেশ উৎকণ্ঠিত আগ্রহে নতমুখ হইয়া দেখিলেন, নদীবক্ষে আর তরঙ্গ নাই, উচ্ছ্বাস নাই,—তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ ভাবপ্রকাশক কোন ভাবই নাই, মৃদু মৃদু নিয়মিত ভাবে নিঃশব্দে সুখময়ী বহিয়া যাইতেছে। রমেশ এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন—মালতীর কোনও চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। রমেশ উন্মত্তের ন্যায় মালতী মালতী বলিয়া আবার ডাকিলেন। নদী, সৈকত, আকাশ, পৃথিবী তাঁহার আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত হইল—কিন্তু হায়! কোন মালতীই আর উত্তর করিল না।

জীবন অভিনয়।

(১)

মলিনার জন্মদিনে তাহার আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাহার জন্য একটি উপহার লইয়া আসিয়াছেন, জনার্দ্দনও একটি উপহার আনিয়াছে। জনার্দ্দন সম্পর্কে মলিনার কেহ হয় না। সে তাহার পিতার বন্ধুপুত্র মাত্র, তবে বাল্যকাল হইতে এখানে যাতায়াত করে, তাই নিঃসম্পর্ক হইলেও মলিনার পিতামাতা তাহাকে পুত্রতুল্য আত্মীয় বলিয়া মনে করেন। বলা বাহুল্য, সে মলিনাকে ভালবাসে। মলিনার পিতা-মাতা ইহাতে অসন্তুষ্ট নহেন; জনার্দ্দন যদিও ধনিপুত্র নহে, কিন্তু বংশে সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান; বি-এ দিয়ে বি-এল পড়িতেছে, তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইলে ভবিষ্যতে সে যে এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে দাঁড়াইবে, এরূপ তাঁহারা আশা করেন।

মলিনার কিন্তু জনার্দ্দনকে ভাল লাগে না। জনার্দ্দন সদা-সর্ব্বদা তাহার ভালবাসা দিয়া, মলিনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চায়—ইহাতে তাহার অতিশয় বিরক্তি বোধ হয়, মলিনা বাগানে ফুল তুলিতেছে, হঠাৎ জনার্দ্দন আসিয়া তাহাকে একটি সুন্দর ফুল আনিয়া দিল। মলিনা বাজনা বাজাইতেছে, হঠাৎ চাহিয়া দেখিল, জনার্দ্দন গৃহকোণে চুপ করিয়া বসিয়া মলিনার বাজনা শুনিতেছে; মলিনা পাঠ মুখস্থ করিতে করিতে কোন স্থানে কোন কথার একটা অর্থ বুঝিতে পারিতেছে না—অভিধানখানা খুলিতে কষ্ট বোধ হইতেছে, হঠাৎ ঠিক সময়ে জনার্দ্দন আসিয়া হাজির। আবশ্যক হইলে মলিনা জনার্দ্দনের নিকট হইতে সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত হয় না, তবে এজন্য জনার্দ্দন তাহার কৃতজ্ঞতাভাজন নহে। সেবা করা দাসের ধর্ম্ম; কিন্তু সেবা গ্রহণ করিয়া কোন্ প্রভু কবে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন।

যাহা হউক, জনার্দ্দনের এরূপ শত অপরাধও মলিনা মার্জ্জনা করিতে পারিত, যদি হতভাগ্য যুবক জনার্দ্দন না হইয়া ললিতমোহন বা এইরূপ কোন শ্রুতিমধুর নাম ধারণ করিত। যখন মলিনা ভাবে, লোকে তাহাকে মিসেস্ জনার্দ্দন বলিবে,—তখনি এমন বেতর বেসুরা সুরে কথাটা খট্ করিয়া তাহার প্রাণে লাগে যে, পিয়ানোর সমস্ত সুরগুলা একসঙ্গে বেসুরা বাজিলেও তাহার কানে তাহা তত কঠোর বাজিত না। তাহাদের বাগানের মালীর নাম জনার্দ্দন; ভদ্রলোকের এ নাম তাহার বিবেচনায় অসহ্য।

সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন, নামে কি আসে যায়। কিন্তু দেখা যাইতেছে, কবিও ভুল করিয়াছেন, শব্দেরও মাহাত্ম্য আছে বই কি! হায় জনার্দ্দনের পিতা-মাতা যদি ভবিষ্যদ্দর্শক হইতেন!

জনার্দ্দন, মলিনার জন্মদিনে, নিরতিশয় আগ্রহে পূর্ণ হৃদয়ে একটি মুক্তার ব্রোচ আনিয়া টেবিলের অন্যান্য উপহার-দ্রব্যের নিকটে রাখিল। মলিনার মাতা ব্রোচটি হস্তে তুলিয়া দেখিয়া, বলিলেন, "বাঃ, বেশ তো!" বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া মলিনার স্কন্ধবস্ত্রে অঞ্চল আবদ্ধ করিয়া দিলেন।—সেই হইতে মলিনা প্রতিদিনই সেই ব্রোচটি পরিত। আর এই উপহারে প্রতিদিন মলিনাকে সজ্জিত হইতে দেখিয়া জনার্দ্দন যে কিরূপ আনন্দ লাভ করিত, তাহা সে ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিত না।

মলিনা এনট্রেন্স দিবার পর পিতার সহিত পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। অদ্য প্রাতঃকালে বাড়ী ফিরিল। মলিনার পিতা কোন কার্য্যোপলক্ষে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার একটি বন্ধুর বাড়ী নামিলেন। গাড়ী মলিনাকে লইয়া তাহাদের বাটী অভিমুখে চলিল।

বসন্তকাল, সুন্দর বাতাস বহিতেছে—রাস্তার দুই ধারের বড় বড় ফুল-গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরা, পাখীর কূজনে চারিদিক গীতিময়—এই সুমৃদু সুন্দর প্রভাতের ন্যায় মলিনার নব উন্মেষিত হৃদয়েও সুখের উচ্ছ্বাস বহিয়া যাইতেছিল। পশ্চিমে গিয়া এবার শিশির-কুমারের সহিত মলিনার নূতন আলাপ হইয়াছে, মুগ্ধপ্রাণে তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাটী প্রবেশ করিল। বাড়ীর গেটের মধ্যে ঢুকিবামাত্র মলিনা মুখ বাড়াইয়া দেখিল,—সেই চির-পুরাতন, চিরবিরক্তিজনক জনার্দ্দন সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সুখস্বপ্ন সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। চিরদিন কি গাত্রদাহকর জনার্দ্দনই তাহার নয়নপথ এইরূপে অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে?

গাড়ী সিঁড়ির পাশে লাগিল; মলিনা নামিতে না নামিতে জনার্দ্দন প্রফুল্ল হাস্যমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মলিনা, কেমন আছ?" মলিনা গাড়ী হইতে নামিয়া সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুষ্কমুখে উত্তর করিল, "ভাল।" ইত্যবসরে জনার্দ্দন তাহাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার স্কন্ধদেশে সেই ব্রোচটি না দেখিয়া বলিল, "মলিনা, সে ব্রোচটি যে পর নাই?" মলিনা চলিতে চলিত উত্তর করিল, "হারাইয়া ফেলিয়াছি" বলিতে বলিতে উপরে উঠিয়া গেল। সংবৎসর ধরিয়া বহুকষ্টে অর্থসঞ্চয় করিয়া তবে জনার্দ্দন একশত টাকায় এই ব্রোচটি কিনিয়াছিল; তাহার ত্যাগ-স্বীকার কিছুমাত্র উপলব্ধি না করিয়া মলিনা কিরূপ তাচ্ছীল্যভাবে সেই হৃতদ্রব্যের উল্লেখ করিল! সে কথায় জনার্দ্দনের একখানি বক্ষ-পঞ্জর যেন শত চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। মলিনা উপরে চলিয়া গেল, জনার্দ্দন তাহার নয়নের অনলাশ্রু-রাশি অঙ্গুলি দ্বারা সজোরে ভূমিনিক্ষিপ্ত করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর? সে কি মনে মনে মলিনার নিকট চিরবিদায় লইয়া জন্মের মত সগর্ব্বে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল? হায়, তাহা নহে। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে হৃদয়মধ্যে যে অপ্রফুল্লতারাশি বহন করিয়া সে মলিনাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল, সেই প্রফুল্লতাটুকুমাত্র বিসর্জ্জন দিয়া ধীরে ধীরে সে আবার মলিনার নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইল!

এই তো জীবন অভিনয়!
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, দাঁড়াইয়া পাশে পাশে,
তবুও কাহার কেহ নয়।

পেনে প্রীতি

আমরা এখন 'টুরে' ফিরিতেছি, অর্থাৎ ঘুরে বেড়াচ্ছি, বেদিয়া জাতির জীবনযাপন করিতেছি! আজ কোন এক গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষচ্ছায়া-সঙ্কুল নিস্তব্ধ নিভৃত বিজন ক্ষেত্রস্থল আমাদিগের বস্ত্রাবাস-মণ্ডলী এবং সিপাই, শাস্ত্রী ভৃত্যাদিবর্গে পরিবৃত হইয়া জাগরিত মুখরিত জনালয় হইয়া উঠিল, সেখানে আবেদনপত্রধারী গ্রাম্যলোকের দলে দলে সমাগম চলিল; শুষ্ক বিবর্ণ চিন্তাপীড়িত আসামীর নীরব বেদনায়, ফরিয়াদীর ক্রোধ ও ঈর্ষ্যাজনিত অব্যক্ত আস্ফালনে. উভয় পক্ষীয় উকীল-মোক্তারের বক্তৃতা-কলরবে এবং একই সাক্ষীর তিন তিন বার নাম-ডাক-চীৎকারে বনতল ব্যথিত কম্পিত হইতে লাগিল, আবার দু'দিনে সমস্তই অন্তর্দ্ধান! প্রান্ত-প্রদেশ পূর্ব্ববৎ বিজনতা বক্ষে ধারণ করিয়া একাকী ধ্যাননিমগ্ন, আর আমরা আমাদের গড়া-বাসা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গাবাসা পুনর্ব্বার গড়িতে, কভু ক্ষেত্র, কভু প্রান্তর, কভু চড়াই, কভু উৎরাই, কভু সজল, কভু শিলাকঙ্করময় শুষ্ক নদীগহ্বর দিয়া সমান অগম্য পথে বিষম ঝাঁকানি খাইতে খাইতে টঙ্গা গাড়ীতে ধাবিত। ইহাই 'ক্যাম্প লাইফ!' আয়াস আছে বলিয়া ইহাতে আয়াসও আছে। নিত্য নবদৃশ্য, বিশ্ব তাই বড় মধুর, নিত্য নবগতিতে স্থিতিটুকু অতীব শান্তিজনক। অন্যান্যরূপ সুখস্বচ্ছন্দতারই বা এখানে অভাব কি? ভৃত্যগণ অবিরাম আরাম যোগাইয়া চলিয়াছে। আমরা নূতন কোন্ জায়গায় যাইব, আমাদের এক দিন বা এক বেলা পূর্ব্বে অধিকাংশ তাম্বু ও আসবাব-দ্রব্যাদি গরুর গাড়ীর উপর বোঝাই দিয়া সিপাহী এবং বাবুর্চ্চি-খানসামা এক দল নির্দ্দিষ্ট স্থানে আড্ডা বাঁধিয়া, আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে চলিল, আমরা পরে সেখানে পৌঁছিয়া সমস্ত ঠিক পাইলাম। আমাদের শেষ পরিত্যক্ত তাম্বু প্রভৃতি লইয়া অন্য ভৃত্যদল পরে আসিতেছে। অসুবিধার মধ্যে ভৃত্য এবং ভ্রমণ-সরঞ্জাম এজন্য বা কিছু অধিক সংখ্যায় রাখিতে হয়!

এইরূপে আসিষ্টাণ্ট কলেক্টরগণ এ দেশে বৎসরে সাত মাস ধরিয়া বনচারী যদি বা না হন, বিজনচারী হেড কোয়ার্টার ছাড়িয়া এ কয় মাসকাল ইঁহাদিগকে সব্‌'ডভিসনের গ্রামে গ্রামে অধীনস্থ ক্ষুদ্রতম কর্ম্ম-চারী হইতে উচ্চপদ মামলাদারের পর্য্যন্ত রাজকার্য্য তত্ত্বাবধান এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রামনিবাসিগণের আর্জ্জি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ডিষ্ট্রীক্টের সুবিচার রক্ষায় ভ্রমণে নিযুক্ত থাকিতে হয়। বৎসরের অন্য পাঁচ মাস বৃষ্টির কাল, সেই জন্য সেই সময় হেড কোয়ার্টারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আপাততঃ এই সঙ্গে ইঁহাদিগের আর একটি কার্য্য বাড়িয়াছে।

প্লেগের তদারক, তাহার সংক্রামক কোপপ্রশমন-সম্বন্ধে সুনিয়ম প্রচার এবং সেই সকল নিয়মাবলী যাহাতে পালিত হয় তদ্দর্শন, ইঁহাদের অধুনাতন একটি প্রধান কর্ত্তব্য। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সবডিভি-সনপ্রান্ত শব্দে অনুবাদিত, ইহা হইতে আসিষ্টেণ্ট কলেক্‌টরগণ প্রান্তসাহেব নামে অভিহিত। অনুবাদ কি সুসঙ্গত?

কোলাবা জেলা বম্বে সহরের খুবই কাছে, আলিবাগ ইহার হেডকোয়ার্টার। আলিবাগ সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান, বম্বে সহর হইতে ষ্টীমারে এক ঘণ্টার পথ মাত্র; আমি অতি অল্প দিন এ জেলায় আসিয়াছি, একমাসও এখনো হয় নাই, আসিয়া অবধি ইহার পদপ্রান্তেই ঘুরিতেছি। তবে মস্তক্ সন্নিকট, শীঘ্রই মাথায় চড়িব, এরূপ আশা করি-তেছি, প্রতি গ্রাম ছাড়িয়া সমুদ্রের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতেছি, এখন আমরা মাতা-পুত্রে পেন নামক স্থানে আসিয়াছি, এখান হইতে বম্বের তোপ শুনা যায়।

কলিকাতা হইতে একখানা মেলট্রেণে কল্যাণ-জংশনে পৌঁছিতে প্রায় ৪৪ ঘণ্টা লাগে। সেখান হইতে ভিন্ন লাইন ধরিয়া আরো দুই ঘণ্টায় মধ্যে আমরা দুইজনে কর্জ্জত ষ্টেশনে নামিয়া এক-খানি ডাগ্‌কার্টে উঠিলাম। গাড়ীতে উঠিবার অবসরটুকুমাত্র দিয়া, তৎযোজিত, ঘনঘোর লোহিত-কান্তি (bay) সুচিক্কণ, সুগঠন, সুদর্শন অশ্বাশ্ব মুহূর্ত্তে কেশগুচ্ছ বিকম্পিত, বক্র গ্রীবা স্ফীত করিয়া, সুবঙ্কিম সুঠাম পদবিক্ষেপে বায়ুগতিতেই যেন ধাবিত হইয়া, দুই চারি মিনিটের মধ্যে এক নিভৃত নিকুঞ্জ-তলস্থাপিত বস্ত্রাবাস মণ্ডলীর নিকট আমাদিগকে আনিয়া ফেলিল।

প্রায় এক মাইল ধরিয়া আম্রকানন, নিবিড় নহে, বৃক্ষদল শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভক্ত ও বিরাজিত হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ভ্রমণপথ রাখিয়া দিয়াছে। কাননের এক প্রান্তে সুনির্ম্মিত গ্রাম্যপথ, অন্তপ্রান্তে জলপূর্ণ নদী; নদীর তীরে একদিকে কর্জ্জতের গ্রাম্য সহর, অন্য দিকে স্থানে স্থানে কুটিরাবলী; দূরে চতুর্দ্দিকে ছবির মত পাহাড় চিত্র। কাননাভ্যন্তরে এক একটি তরুচ্ছায়াতলে আমাদিগের এক একটি তাম্বু স্থাপিত। ইহা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নহে; আফিস, আফিসের লোকদিগের ঘর, ভৃত্যদিগের ঘর, স্নানাগার, রন্ধনশালা আমাদিগের দুইজনের স্বতন্ত্র শয়নকক্ষ প্রভৃতিতে এই আবাসকুঞ্জ বহুদূর বিস্তৃত। এখানে পদার্পণ করিবামাত্র সুকণ্ঠ পক্ষিগণ শাখার মধ্যে লুকাইয়া তাহাদের এই শান্তিনিকেতনে আমাদিগকে স্বাগত করিয়া লইল, কি এক অমৃতময় ভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

বনতলে একটি বস্ত্রছাউনির মধ্যে একাকী এই আমার প্রথম শয়ন। আমার তাম্বুটি খুব ছোট এবং অন্যগুলি হইতে খানিকটা তফাতে। ছায়া-বহুল গাছ বাছিয়া তাহার নীচে তাম্বু খাটাইতে হয়, এই কারণে আমার তাম্বু অন্য তাম্বু হইতে কিছু দূরে পড়িয়াছে। রাত্রিকালে সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, জনমানবের ত্রিসীমায় আছি, ইহা বুঝিতে পারি না; পরিপূর্ণ বিজনতার মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া সহসা স্নায়ু-প্রণালীতে কি এক প্রকার নূতনতর অনুভূতির ক্রিয়াতরঙ্গ সঞ্চারিত হইয়া আবার মিলাইয়া পড়ে; চিরাভ্যস্ত মনুষ্যশ্বাসনিঃশ্বাসপূর্ণ বদ্ধ প্রাসাদভবনে, তাহার রঞ্জিত কড়ি-বরগা, মার্জ্জিত মেজিয়াতল, কাষ্ঠময় দ্বার, বাতায়ন ও প্রজ্জ্বলিত দীপালোক দেখিতে গিয়া উন্মুক্ত বস্ত্রদ্বারপথে তরু-লতা গুল্মতৃণময় স্তব্ধ মাঠের অন্ধকার ও আকাশের শান্ত ম্লান তারকালোক নয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। দ্বিতল ত্রিতল গৃহের পরিবর্ত্তে ভূমির সমতলে একাকী আপনাকে খট্টাঙ্গ-শায়িত দেখিয়া প্রথমে কেমন যেন একটা বিস্ময়-বিভ্রমভাবে সমস্ত ভুল হইয়া যায়, পরে ঈষৎ আতঙ্কে যেন দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে, ক্রমশঃ সম্পূর্ণ জাগরণে এই অজ্ঞাত আতঙ্ক স্পষ্ট আশঙ্কায় পরিণত হয়। কোন বন্যপশু গৃহে প্রবেশ করিয়া যদি আক্রমণ করে, এইরূপ ভয় হইতে থাকে। কিন্তু চারিদিকের পরিপূর্ণ শান্তিময় নিস্তব্ধতায় সে ভয় ধীরে ধীরে অতি শীঘ্রই আবার নিদ্রাবিলুপ্ত হইয়া পড়ে। বলিব কি, এতদিন তাম্বুবাস করিতেছি, একটি শৃগালের ডাক পর্য্যন্ত শুনি নাই।

কর্জ্জতে আমরা ছয় দিন ছিলাম। মধ্যাহ্ন হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সেখানে কি ভয়ানক গরম। উষ্ণ বাতাস দেহের কোন স্থল স্পর্শ করিলে মনে হইত, ফোস্কা পড়িতেছে। এই শান্তিকাননের সহিত বিদায়-গ্রহণের সময়ও তাই শান্তিভঙ্গ হয় নাই! তখন মনে হয় নাই,—এখন মনে হইতেছে, গরমের সময় দ্বিপ্রহরে তাম্বুর পর্দা কেন ফেলিয়া রাখিতাম না। আমি দেখিতেছি, সব সময়ে প্রায় চোর পলাইলে আমার বুদ্ধি যোগায়।

কর্জ্জত হইতে চৌক্ ছয় মাইল, চৌক্ হইতে পান্বয়েল ১২ মাইল। আমরা দুই রাত্র চৌকের বাঙ্গলোয় বাস করিয়া এক রাত্র পান্বয়েলে কাটাইয়া পরে 'পেনে' আসিয়াছি। চৌকের বাঙ্গলোটি বেশ উচ্চ স্থানের উপর। ইহার চারিদিকে গোলক-চাঁপার গাছ, নিষ্পত্র গাছের শাখায় শাখায় স্তরে স্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে কেবল ফুলে ফুলে ঢাকা। প্রবল বাতাসে সেই ফুলদল উড়িয়া আমাদের পূজা লইয়াই যেন বারান্দায় আসিয়া জমা হইত।

পান্বয়েলের চিঠিপত্রাদি বহিয়া সমুদ্র-খালের যে বন্দর হইতে ষ্টীমার বহে যাতায়াত করে, সেই বন্দরের নাম উলুবা বন্দর—ইহা পান্বয়েল হইতে সাত মাইল দূরে। উলুবা গ্রামের পুরাতন অংশ এখন কি শোচনীয় দৃশ্যময়। গ্রামকে গ্রাম শূন্য, পরি-ত্যক্ত; ভগ্ন কুটীরের মৃত্তিকা-প্রাচীর মাত্র অবশিষ্ট,

প্লেগের প্রাদুর্ভাবেই ইহার এইরূপ দশা। কয়েকখানি অবরুদ্ধ সুন্দর বাঙ্গলো দেখিলাম—শুনিলাম, এক সময় এক দিনের জন্যও এগুলি খালি পড়িয়া থাকিত না। তৎসংলগ্ন বহুদূরবিস্তৃত আম্রকাননে অসংখ্য আম ফলিয়াছে, বৃক্ষরাশি ফলভারে অবনত; কিন্তু সে সকল ফল ভোগ করিবে কে, কে জানে? দেখিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়।

পান্বয়েল ও পেন বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, বাড়ী, ঘর, দোকান প্রভৃতিতে ক্ষুদ্র সহর তুল্য। এমন কি, এখানে রাস্তায় কলের জল ও স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠিত দীপাবলী আছে।

পান্বয়েলে আমরা যেখানে ছিলাম, আর পেন গ্রামপ্রান্তে যেখানে আছি, ইহার মধ্যে পথ-ব্যবধান বাইশ মাইল। যাতায়াতে দুইবার দুটি জল পার হইতে হয়। পান্বয়েল হইতে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা প্রথমে জলের নিকট পৌঁছিলাম। শুনিয়াছিলাম, জল এখানে খুবই কম, ঘোড়া, মানুষ ইহার উপর দিয়া পায়ে চলিয়া যায়। কিন্তু তীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বিপরীত; সুবিস্তৃত সুগভীর ভরা নদী কূলে কূলে ছাপিয়া স্রোতের বেগে বহিয়া চলিয়াছে। টঙ্গায় পার হইব কিরূপে? তখন জানিলাম, আসলে ইহা নদী নহে, সমুদ্রের খাল; জোয়ারে বড় নদীর মত জলে ভরিয়া উঠে; ভাটায় ঘোড়া, মানুষ স্বচ্ছন্দে ইহার উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হয়। আমরা যখন পৌঁছিলাম, তখন ভরা জোয়ার, এক জন কৌপীনধারী প্রবীণ মাঝির সহিত কথা কহিয়া জানা গেল, পাঁচটার আগে এ জলে গাড়ী যাইবে না। আমরা একটার সময় তীরে আসিয়াছি, তাহা হইলে আর চার ঘণ্টা কাল এই রৌদ্রে বসিয়া থাকিতে হইবে। সে বড় সুখের কল্পনা নহে। আমাদিগের বিপন্ন ভাব দেখিয়া মাঝি বলিল, "পার হইবে তো নৌকায় চল না, টঙ্গা, ঘোড়া সবই পার করিতেছি।" দেখিলাম, ক্ষুদ্র একখানি ডোঙ্গা তীরের নিকট জলে ভাসিতেছে। দেড় হাত পরিসর হইবে কি না সন্দেহ, লম্বায় হাত আটেক দশ হইতে পারে। এ নৌকায় টঙ্গা, ঘোড়া সব পার করিবে প্রান্তসাহেব অবিশ্বাসজনক বিস্ময়দৃষ্টিতে নীরব রহিলেন। সে তাঁহার অবিশ্বাস বুঝিয়া সদর্পে গম্ভীর ভাবে কহিল, "বড় বড় বয়েল ও বয়েলগাড়ী আমি অনায়াসে পার করি।" তথাপি টঙ্গা পারের হুকুম না পাইয়া আর দিরুক্তি না করিয়া নিশ্চয়োয়াভাবে অদূরে গাছের তলায় গিয়া তামাক টানিতে বসিল। তাহার ভাবটা এই—"ভাল পরামর্শ দিলাম, শুনিলে না, আচ্ছা, সেই ৫টা পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া থাক না, আমার তো ভারী গরজ।" তাহার সেই খাতিরনদারৎ ভাবটা লাগিল ভাল, আমার তো মনে হইল, ইহার হাতে আত্মসমর্পণ করা যায়। তাহা ছাড়া ৫টা পর্য্যন্ত তীরে বসিয়া থাকাটাও কিছু বিশেষ লোভনীয় নহে; আমাদের আপনাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটু কথাবার্ত্তা হইবার পর টঙ্গাওয়ালাকে বলা গেল, "মাঝিকে বল, নৌকায় টঙ্গা পার করুক।" তাহারা গাড়ী ভাসাইতে গেল, আমি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম, ঐটুকু ছোট ডিঙ্গিতে অত বড় গাড়ী উঠায় কিরূপে? দেখিলাম, অতি সহজ। গাড়ী ঠেলিয়া তাহার দুই চাকার মধ্যে নৌকাখানি প্রবেশ করাইয়া দিল, তাহার পর টঙ্গাওয়ালা ডিঙ্গিতে উঠিয়া গাড়ী ধরিয়া বসিলে, মাঝি তাহার বাঁশের লগী ঠেলিয়া নৌকা তীরে লাগাইল। তখন এত জল যে, একবাঁশে ঠাঁই পাওয়া যাইতেছিল না। নৌকা চলিবার সময় গাড়ীর দুই চাকা, নৌকার চাকার মত তাহার দুই পাশে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া পার করা আরও সহজ। ঘোড়ার মুখের লাগাম মাঝির হাতে রহিল, ঘোড়া দুইটি নৌকার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিয়া তীরে উঠিল। সর্ব্বশেষে আমরা পার হইলাম।

এই সমস্ত ক্ষণের মধ্যে মাঝিকে একবার গাম্ভীর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই। কিন্তু ওপারে গিয়া প্রান্তসাহেব বক্‌সিসসমেত মেহনতি যখন তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, তখন সহসা তাহার আত্মবিস্মৃতি জন্মিল, ছেলেমানুষের মত গালভরা হাসিতে তাহার আকর্ণ কুঞ্চিত হইয়া পড়িল।

ইহার পর আরো একবার ডিঙ্গিতে সমুদ্রখাল পার হইয়া, দুইবার টঙ্গা চক্রে দুইটি ছোট নালা উত্তীর্ণ হইয়া, ঘোড়াকে বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত দুইবার সেই রৌদ্রে পদব্রজে দুইটি চড়াই পথ ভাঙ্গিয়া অবশেষে বাইশ মাইল পথ পাঁচ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া অপরাহ্নে পেনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

এখানে আমাদের বাসক্ষেত্রে আসিয়াই প্রথমে নজরে পড়িল একটি ভাঙ্গা কুটীর; কুটীরখানি

আমাদের তাম্বুর খুবই কাছে। শুনিলাম, এইখানে কোন ব্রাহ্মণ-পরিবার বাস করিত, এক জনের প্লেগ হওয়াতে সকলকেই গৃহ ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে. এখন কুটীরের এই ভগ্ন দশা, তাহাদের দশা কি হইয়াছে, কে জানে।

এখানেও আম্র'নিকুঞ্জতলে আমাদের বস্ত্রাবাস; কিন্তু কর্জ্জতের ন্যায় ইহা পরিষ্কার সুমার্জ্জিত নিকুঞ্জ-কানন নহে। শুষ্ক ক্ষেত্রপ্রান্তরের সর্ব্বত্রই প্রায় লাঙ্গল চষা উচ্চ-নীচ ভূমি; এক পা বাড়াইতে শুষ্ক তৃণগুল্মে পদ আটকিয়ে যায়। তরুরাজি এখানে অসংলগ্ন অসংবদ্ধভাবে যত্র তত্র বিক্ষিপ্ত; এক একটি আমগাছ বহু পুরাতন, বহুল শাখাকাণ্ডে বিপুল ও প্রকাণ্ড আয়তন; তাহার এক একটি সুবিস্তৃত শাখার নীচে সুবিশাল ছায়া! গাছগুলি পরগাছায় ভরা, কোনটির উপরে বা অশ্বত্থ তরু আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এত আমগাছের মধ্যে মোটে দুইটি গাছে দুই চারিটি করিয়া আম ঝুলিতে দেখিলাম. আর সবে মাত্র এ ক্ষেত্রে যে একটি কাঁঠাল গাছ, তাহা কাঁঠালে ভরা। এখানে নানাজাতীয় সুকণ্ঠ পক্ষী নাই, দয়েলেরই ডাক সারাদিন শুনিতে পাই, এমন বনভল কোকিল-পাপিয়ার গীত-রবে ধ্বনিত হইয়া উঠে না। এখন শুক্লপক্ষ, হঠাৎ দুই দিন হইতে সন্ধ্যার ম্লান জ্যোৎস্নায় একটা পাপিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিয়া উঠে, ডাকিয়াই আবার নীরব হইয়া পড়ে, বুঝি তাহার প্রতিধ্বনি-গীতি শুনিতে পায় না বলিয়া! কর্জ্জতের ন্যায় এখানেও এই কেন্দ্রস্থলের এক প্রান্তে গ্রাম্য পথ অহরহ গরুর গাড়ীর চক্রঘর্ষণে নিনাদিত, আর অন্য প্রান্তে নদী, কিন্তু কর্জ্জতের সে ভরা নদী নহে, ইহা শিলা-কঙ্করময় শুষ্ক গহ্বর-সার। দূর-দূরান্তর-প্রসারিত এই শুষ্ক গহ্বরের কদাচ কোন অংশে একটুখানি জলের চিহ্ন দেখা যায়; কোন শিলাতলে বা একটুখানি জল গুপ্তভাবে বিরাজিত। এপারে ওপারে পরস্পর হইতে দূরদূরান্তর সংস্থিত দুই চারিখানি করিয়া যে কুটীর-গৃহ দেখা যাইতেছে, তাহার লোকেরা এই গুপ্ত স্থানের সন্ধান জানে।

পেনে আসিয়াছি বটে, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহার সহিত আমার সম্পর্ক-রহিত। পেন হইতে এই বিজন ক্ষেত্রস্থল প্রায় দুই মাইল দূরে, কিন্তু আমি ইহাকেই পেন বলিয়া জানি। নাগরিকবন্ধন আরাম-বিলাসের চিহ্নমাত্র এখানে নাই, তথাপি লোকালয়-চিহ্ন আছে। এক দিকে সুদূরব্যাপী মাঠ, অন্য দিকে স্তরে স্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রমোন্নত শ্যাম-কান্তিশূন্য শুষ্ক শৈলমালার পদপ্রান্তে, বক্ষে, চূড়ায় পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে কুটীর; এবং এই পার্ব্বত্য দুর্গম পথেও এক একখানি গরুর গাড়ী মাঝে মাঝে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর-গ্রামের কোন একখানির উদ্দেশ্যে চলিয়াছে দেখা যায়। সাহস দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। রেলগাড়ীর গতি সুনির্ম্মিত যন্ত্রগঠিত মসৃণ পথে, আর গরুর গাড়ীর গতি, সম-অসম, সুগম-দুর্গম সর্ব্বস্থানে, কাহার কার্য্যকারিতা অধিক, বলা দুঃসাধ্য।

এ দেশে কাটকরী বলিয়া একরূপ আদিম অসভ্য জাতি আছে, পাহাড়চূড়ার কুটীরগুলি তাহা-দেরই বাসস্থান। ইহারা সভ্যজাতির সংস্রবে বড় একটা আসিতে চাহে না, মাঝে মাঝে কেবল কাষ্ঠ, ফল মূল প্রভৃতি বনজাত দ্রব্যাদি সহরে বিক্রয়ার্থ আনে। তীরধনুক বন্যপশুশীকার করিয়া প্রায় ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নদীর ধারে উচ্চ পাড়ে একটুখানি বেশ সমতল মসৃণ বেড়াইবার স্থান আছে। আমি রোজ বিকালে ঐখানে বেড়াইতে বেড়াইতে শৈলপ্রদেশস্থিত দূর-দূরান্তর-বিক্ষিপ্ত ঐ কুটীরগুলির প্রতি চাহিয়া ভাবি, এখানেও লোক আছে! কে জানে, কোনও অজ্ঞাত অনুপম সুকোমল রূপচ্ছায়ায় এই নীরস শুষ্ক রুদ্র কঠোরতাও তাহাদের নেত্রে সুকুমার কমনীয় কান্তিতে বিভাসিত কি না? কে বলিবে, কোনও সুদুর্লভ স্নিগ্ধ সুধাসিঞ্চিত হইয়া এখানকার শত অভাব-অসুখ লইয়াও তাহারা পুলক-পরিপূর্ণ কি না!

আমার পার্শ্বদেশে যূথিকার ন্যায় একরূপ বনফুল একবৃন্তে রাশি রাশি ফুটিয়া দুলিতে থাকে, দুলিয়া দুলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া যেন উত্তরে কহে—এখান-কার এই রুদ্র প্রকৃতির মধ্যে সুকোমল সুখ চাহিয়া দেখ।

খাতা একখানা কোলে, কলমটা হাতে লইয়া তাম্বুর মধ্যে আরাম-চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছি, কি লিখি, অনেক দিন হইতে গল্প লিখিতে অনুরুদ্ধ, লিখিতে ইচ্ছাও খুব, কিন্তু শূন্য মস্তিষ্ক-মন্থনে বিবা-মৃত, না কিছুই উঠাইতে পারিতেছি, নিরাশচিত্তে

যুক্ত দ্বারপথে চাহিয়া আছি। দেখিলাম, পুষ্পগুচ্ছ-হস্তা, পীতবসনা একটি মহারাষ্ট্রীয় কন্যা—এই আম্র-নিকুঞ্জতলে প্রবেশ করিয়া অদূরে তাম্বুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন সিপাহী তাহাকে আমার তাম্বু দেখাইয়া কি বলিল, সে প্রফুল্ল হরিণীর ন্যায় দ্রুতপদে দ্বারবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ একটু যেন থম-কিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর হাস্যমুখে সেলাম করিয়া ফুলের তোড়াটি আমাকে সমর্পণ করিল। দেখিলাম, বালা কিশোরী, শ্যামা, সুবদনী, ললিতা। তাহার সুকোমল সহাস্য আনন, তাহার সু-হাবভাব, এমন কি, ফুল সমর্পণে তাহার সেই যে ভঙ্গিটি, তাহাতে পর্য্যন্ত আমার প্রীতি উৎপাদন করিল। কেবল তাহাই নহে, আমাকে দেখিয়া লজ্জাবতী লতাটির মত সহসা সে যে একটু কুণ্ঠিতভাব ধারণ করিয়াছিল, পরিচিত প্রার্থিতের স্থলে অপরিচিত অজ্ঞাত মূর্ত্তি-দর্শনে তাহার যে একটুখানি হতাশ ভাব জন্মিয়া-ছিল, তাহা পর্য্যন্ত আমার লাগিল ভাল। আমি ফুল লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় থেকে ফুল নিয়ে এলে ?" সে বলিল, "গাঁ থেকে।" অবশ্যই গাঁ থেকে। এই ক্ষেত্র-প্রান্তরের ত্রিসীমায় গোলাপ, বেল প্রভৃতি কাননফুলের চিহ্নও দেখিতে পাই না। কিন্তু—"কোন্ গাঁ থেকে ? গাঁ কি কাছে ? ও পারে ?" ভাবিয়াছিলাম, নিকটে গ্রাম হইতে আসিয়াছে। সে বলিল, "অনেক দূরে"—আর কিছু জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়া অতঃপর অভিবাদনপূর্ব্বক সে চলিয়া গেল। প্রান্তসাহেব প্লেগ-তদারকী হইতে গৃহে ফিরিলে তাঁহাকে বলিলাম, "একটি মেয়ে একটি ফুলের তোড়া এনেছিল।"

তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "নিয়েছ ত ?"

"ঐ যে টেবিলের উপর।"

"তাঁর সঙ্গে ভাল ক'রে দু'চারটে কথা কইলে ? শুনেছি, বেচারী অনেক দূর থেকে ফুল আনে।"

"তা অবশ্য কইলুম। কিন্তু আমাকে নতুন লোক দেখে সে যেন একটু থমকে গেল। পুরান লোকের হাতেই ফুলটি দিতে পারলে যেন বেশী খুসী হতো!"

"সত্যি নাকি ?"

"আমি কি ঠাট্টা করছি ? ও মেয়েটি কে ? কেন ফুল আনে ?" আমাকে তিনি চেনেন, এক জন গরীব ফুলবিক্রেত্রীর সম্বন্ধে এইরূপ অপরূপ প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। হাসিয়া বলিলেন,—

"বলতে পারছিনে, ও মেয়েটি কে ?"

"তা যেন নাই পারলে, কিন্তু ফুল দেয় কেন, তা তো বলতে পার ?"

"খুব সম্ভব, ওদের ফুলের বাগান আছে।"

"ফুলের বাগান ত অমন অনেকের আছে !"

নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের কোনরূপ নির্ব্বন্ধফেরে এই ব্যক্তিটিই বোধ হয় পূর্ব্বে কলেক্টারের ফুল যোগাত।"

"কিন্তু কোন্ নির্ব্বন্ধে—"

"আমাকে যোগাচ্ছে ? সেটা নির্ব্বন্ধ নয়, নিতা-ন্তই বিধির বিপাক। কিছুদিন আগে আমি যখন এখানে কলেক্টারের অতিথি হয়ে আসি, তখন এক দিন কলেক্টারের ফুল দিতে এসে মেয়েটি দেখলে, আমি এখানে তাদের ছবি তুলছি, আমাকেও একটি দিলে।"

"সে দিনও তা হ'লে একটি বাড়তি তোড়া ওর হাতে ছিল বুঝি ? আজও একটি বাড়তি তোড়া ওর হাতে দেখলুম। আমাকে ফুল দিয়ে সেটি নিয়ে চ'লে গেল। যেন আর কারো উদ্দেশ্যে সেটি এনেছিল, তাকে না দেখে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।"

"হয় তো বা পরে আর কাউকে দিয়েছে! কিংবা নদীর জলে মানৎ ভাসাবার জন্যেও নিয়ে আসতে পারে; যে জন্যই আসুক, সে দিন কিন্তু আমার জন্য সেটি আনে নি।"

"তা কি ক'রে বলা যায়! সে দিন হয় তো শুনেছিল—"

"আমি আসব ? বেশ, ফুলগুলি আমার উদ্দেশ্যেই যদি সে দিন গুচ্ছাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাতেই বা এত দুঃখ কি ?"

"সুখ হবারই তো কথা!

"তা যদিও হচ্ছে না। বক্‌সিসটা দিয়ে যাওয়া হয় নি—তাই মনে মনে একটু অপরাধী আছি।"

"এবার সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সহজেই হবে।"

"হাঁ, এবার তো আমাকে কলেক্টারের পদবীতে বসিয়ে রীতিমত খরিদ্দারভুক্ত ক'রে ফেলেছে। যা হোক, বেচারা অনেক দূর থেকে ফুল আনে, ওকে একখানি ভাল কাপড় দিও, তার উপর আর

যা দাও" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম,—"তা যেন দেব, কিন্তু সবই মিথ্যা! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তার কিছুই নয়। সুন্দরী মালিনীর ফুলোপহারে মধুর সুন্দর কোন ভাবেরই বিজড়ন নাই! পয়সার জন্য এ শুধু ফুল বিক্রয়!" অত্যন্ত নিরাশ হইলাম। আমি সত্যই ইতিমধ্যে বাতাসে মস্ত প্রাসাদ ফাঁদিয়া বসিয়াছিলাম। প্লেগ সম্বন্ধে ইহার খুব সুনাম আছে জানি। এখানে অবশ্য অল্পদিন আসিয়াছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যেখানে ছিলেন, সেখানে ইঁহার সকরুণ যত্নে গরীব গ্রামবাসিগণ কিরূপ বশীভূত ছিল, সে সব গল্প শুনিয়াছি, তাহাই স্মরণ করিয়া, সেই ভিত্তির উপর ঐ ভগ্ন কুটীরে—প্লেগশুশ্রূষানিরত এই বিপন্ন বালিকার সহিত তাহার বিপদভঞ্জন পুরুষপ্রবরকে ঔপন্যাসিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গাঁথিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ এই ফুলোপহার গরীব ফুলওয়ালীর অসীম কৃতজ্ঞতা-বিভব উৎসর্গীকৃত দেখিয়া মনে মনে দিব্য আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিলাম। ভ্রম-সংশোধনে তাই বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলাম। এতক্ষণ ধরিয়া ফুলওয়ালীর সম্বন্ধে এত যে কৌতূহল, এতটা যে ভাবোচ্ছ্বাস, কল্পনাভঙ্গে সে সমস্তই যে শূন্যে বিলীন হইল, এমন নহে, অধিকন্তু তাহার প্রতি এতটা অশ্রদ্ধা জন্মিল যে, পরদিন তাহার মূর্ত্তির মাধুর্য্য, বৈশিষ্ট্যটুকু পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, অন্নচেষ্টারত সাধারণ গ্রাম্যকন্যার ভাব ধরিয়াই সে আমার নেত্রগোচর হইল।

তথাপি ভদ্রতার নিয়ম সর্ব্বস্থলেই অভঙ্গনীয়, আমি তৎপ্রদত্ত ফুলগুচ্ছ হস্তে লইয়া পূর্ব্বদিনের মত সাদরে বলিলাম,—

"চমৎকার ফুল! বাগান তোমার নিজের হাতের?"

সে সেলাম করিয়া কহিল, "না সাব, মালী আছে। আমরা শুধু দেখি।"

"বাড়ীতে তোমার কে কে আছে?"

"মা।"

"আর কেউ নাই তোমার?"

"আছে। বিদেশে।"

"ফুল বিক্রীতে যা পাও, তাতে তোমাদের বেশ চলে?"

"না—আমাদের ধানের ক্ষেত আছে।"

"ফুল কি তুমিই রোজ বাজারে বিক্রয় করিতে নিয়ে যাও?"

সে ইহার উত্তরে কোন কথা কহিল না। কেবল জিহ্বা ও তালুকার সংস্পর্শে একরূপ শব্দ করিয়া জানাইল, বাজারে ফুল বিক্রয় করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে অপমানজনক। আমি ভাবিলাম, স্বার্থকুশল-বুদ্ধিতে মানুষ কিরূপ যুক্তিবিরোধী। বাজারে ফুল বিক্রয় করিতে যাওয়া যদি অপমানজনক হয়, তাহা হইলে এখানে বিক্রয় করিতে আসাই বা সম্মানজনক কিসে! বলিয়াও ফেলিলাম, "এখানে যে আস তবে?" সে তাম্বুর স্তম্ভে ঠেসান দিয় নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। এই নীরবতা তাহার হৃদয়লুকায়িত গুপ্ত-রহস্যের সন্ধান বলিয়া দিল, আমার স্বাভাবিক কৌতূহল আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; আমি বলিলাম, "তুমি বাজারে যাও না; আর একলাটি ছেলেমানুষ এত দূরে ফুল বিক্রী করতে এস; তাতে তোমার মা কিছু বলেন না?"

"তিনি জানেন না।"

"তিনি জানেন না? তুমি নিজে লুকিয়ে আস কেন?" সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, যেন যাহা বলিবার আছে, বলিবে কি না ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমি তাই বিশেষ অনুনয়ের ভাবে মিষ্ট করিয়া বলিলাম—

"বল না, বল, তাতে তোমার কিছুই ক্ষতি হবে না, আমিও খুব খুসী হব।" সে বলিল,—

"যদি তাঁর দেখা পাই—দেখতে।"

"কার?"

"প্রান্তসাহেবের!"

কি আবার আজগুবি কথা! আস্পর্দ্ধাও কম নহে,—যদিও আমি প্রান্তসাহেবের সহিত এ বিষয়ে কৌতুক করিয়াছি, এখন ভারী রাগ ধরিল, অথচ কি বলিব, হঠাৎ যোগাইল না। সে আমার ভুল বুঝিয়াই বোধ হয় তাড়াতাড়ি কহিল,—

"এ প্রান্তসাব নন, আর এক জন।"

"কে তিনি?"

"আমার বোনের স্বামী।"

"তিনি প্রান্তসাহেব? বিলাত-ফেরত মহারাষ্ট্রীয় বুঝি?"

"না, ইংরেজ?"

"ইংরেজ।" কিছুদিন পূর্ব্বে এক জন পারসি

ইঞ্জিনিয়ার আমাদের ক্যাম্পে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি এদেশে উচ্চপদধারী গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীদিগের নানারূপ গল্প করিতেন, তন্মধ্যে দু-একজনের সম্বন্ধে এইরূপ "নেটিভ" বিবাহ রহস্যের কথাও বলেন। ফুলওয়ালীর কথায় তাই আমার দ্বিগুণ কৌতূহল জন্মিল। বলিলাম,—

"ইংরেজ তোমার ভগিনীপতি,তোমরা তো হিন্দু ?"

"না, মুসলমান। আমরা বিজাপুর নবাব-কন্যার বংশ।"

"মুসলমান ? কিন্তু ঠিক হিন্দু-কন্যারই বেশ।" ইহার আগে আমি এদেশে মুসলমানী দেখি নাই।"

নবাব-বংশীয় হউক বা না হউক ; সে যে ভদ্র-বংশীয়, তাহাতে বিশ্বাস জন্মিল। হাবভাব, ধরণ ধারণ, কথাবার্ত্তা সবেতেই একটি আভিজাত্য প্রকাশ পাইতেছিল বটে।

"তোমার দিদিকে তিনি কি ক'রে জানলেন ?"

"আমার বাবা তাঁর সিপাই ছিলেন, মৃত্যুর সময় আমাদের ভার তাঁকে দিয়ে যান।"

"তখন তোমার দিদির বয়স কত ?"

"ষোল। দিদিকে প্রান্তসাহেব পুনার স্কুলে দিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁদের দেখা-শুনা হোত।"

"বিয়ে হোল কত দিন পরে ?"

"এক বছর পরে পুনাতেই। তার পর এই 'পেনেই এই বাগানে প্রান্তসাহেব দিদিকে নিয়ে এসেছিলেন, আমরা সবাই এসে দেখা করলাম। সে সব কথা আমার খুবই মনে আছে।

"তখন তোমার বয়স কত ?"

"সাত বৎসর। মা আমার হাত ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন,—"সাহেব—তোমার জন্য আমাদের জাতকুল গেল, আমার এ মেয়েকে এখন ভাল লোকে কেউ বিয়ে করবে না, এটিকেও নাও, তা হ'লেই আমি নিশ্চিন্ত হই !"

"তিনি কি বল্লেন ?"

তিনি তাঁর চৌকির কাছে আমাকে টেনে নিয়ে আমার চুলে হাত দিতে দিতে বল্লেন—"এখন এর বিয়ে কি ? এখনো খুব ছোট।"

"তা তো ঠিকই বলেছিলেন।" ফুলওয়ালী আমার কথা শুনিয়াই আপন মনে কহিয়া গেল,—

"আমার হাতে একটি ফুলের তোড়া ছিল, আমি সেইটে তাঁকে দিয়ে বল্লেম,—বড় হ'লে যে করবে ?"

"তিনি কি উত্তর দিলেন ?"

"তিনি হেসে আমাকে চুমো খেয়ে বল্লেন—"করব।" বলিতে বলিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিল। আমি তাহার দুঃখের কারণ ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলিলাম,—"দিদিকে বুঝি খুব ভালবাসতে ? তার পর আর দেখা-শুনা হয়েছে ?"

"না। তাঁরা সেই যে চ'লে গেছেন, আর আসেন নি। দশবৎসর থেকে আমি তাঁদের পথ চেয়ে আছি, এখানে তাম্বু পড়লেই তাঁদের দেখতে প্রত্যাশা ক'রে আসি।"

"ফুল বুঝি তাঁদের জন্যই আন ?"

"হ্যাঁ, তাঁদের জন্যই এনে অন্যকে দিয়ে যাই।"

"তা দেও কেন ? ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই হয়।"

"কি ছুতায় তা হ'লে ফের এখানে আসব যাব ? যেটি তাঁরই জন্যে মনে ক'রে আনি, সেটি কি ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।"

ফুলওয়ালীর বাড়তি তোড়ার ইতিহাস এতক্ষণে পাওয়া গেল। বলিলাম, "কি কর সেটি ?"

"বাবার গোরের উপর রেখে দিই।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, সে কহিল, "রোজ ফিরে যাই, রোজ মনে হয়, পরদিন তাঁকে দেখব, সাহেব লোকদের কাছে কত বন্ধুলোক আসে, এক দিন তিনিও আসতে পারেন।" বহুবচন ছাড়িয়া সে দেখিলাম, এইবার একবচনে আসিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে তো কথা কহা চলে না, কি তবে বলি ; বলিলাম, "তোমার বয়স এখন সতের, না ?"

"হাঁ সাহেব !"

"এখনো বিয়ে হয় নি ?"

সে নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কি ক'রে হবে ; তিনি ত এখনো আসেন নি ?"

বালিকার মনের কথা সকল এতক্ষণে বুঝিলাম। সে তাহার ভগিনীপতির উপহাসবাক্য অঙ্গীকাররূপে হৃদয়ে গাঁথিয়া তাহাতে নিজে অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেই ভ্রান্তময় সরল বিশ্বাসে মুগ্ধ ব্যথিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি জান না, ইংরেজেরা এক স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে না, আর শালীকে বিয়ে করার নিয়মও তাঁদের মধ্যে নেই।"

"তিনিও মুসলমান। দিদিকে বিয়ে করার জন্যে

তিনিও মুসলমান হয়েছিলেন। আমাদের বংশে ত অন্য বিয়ে হবার যো নেই।"

বিয়ে করবার জন্যে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। সম্প্রতি "বিগামির" চার্জ্জে যে সিলন সিভিলিয়ান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কর্ম্মচ্যুত হইয়া বিলাতে দরখাস্ত করিয়াছেন, তিনিই কি তবে ইহার ভগিনীপতি? তিনি তো ইংরাজ-পত্নী থাকিতে মুসলমান হইয়া মুসলমানী বিবাহ করেন, কিংবা ভুলিতেছি, প্রথম বিবাহিতা মুসলমানী ভার্য্যা ত্যাগ করিয়াই বুঝি পুনরায় স্বদেশীয় ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এই দ্বিজাতি দ্বিপত্নী পরিবারের পর্য্যায়-পরম্পরায় আবৃত্তিতে আমার ভুল-চুক হউক, কিন্তু মূল ঘটনাটি সত্য। উক্ত শোচনীয় পরিণাম ফুলওয়ালীকে কহিয়া তাহার মনঃক্ষোভ জন্মাইতে আমার প্রবৃত্তি হইল না, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কি সিলনের সিভিলিয়ান হইয়া যান?" সে বলিল, "সে কোথা? আমি জানি না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ভগিনীপতির নাম কি?"

সে যাহা বলিল, সিলন সিভিলিয়ানের নামের সহিত মিলিল না। সম্ভবতঃ তবে এ আর এক জন, —যদি না ইহারা নাম বিকৃতি করিয়া থাকে। আমি চুপ করিয়া এ সম্বন্ধেই ভাবিতেছি,—সে সহসা বলিল, "সাব, একটি আরজি আছে।"

"কি বল।"

"প্রান্তসাহেব তসবীর তোলেন—না?"

"হাঁ।"

"তাঁর তসবীর এর কাছে আছে কি?"

হাসিয়া বলিলাম, "এ প্রান্তসাহেব সবে চার বৎসর এ দেশে এসেছেন, আর তুমি বল্‌ছ, তোমার প্রান্ত সাহেব দশ বছর এখানে আসেন নি।"

"অন্য জায়গায় তো দেখা হ'তে পারে?"

"তা বটে, কিন্তু তিনি ও-নামের কাউকে চেনেন ব'লে আমি তো জানিনে। জিজ্ঞাসা করব এখন!"

সে বহুদিন হইতে ভবিষ্যতের মুখের দিকে চাহিয়া নিরাশ, ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, সুতরাং এই আকাঙ্ক্ষাটি পুরণের জন্য পরদিন পর্য্যন্তও আর ধৈর্য্য ধরিতে চাহিল না, বলিল "সাব, প্রান্তসাহেবের ছবিগুলি আমাকে দেখান না।" আমি তাহাতে অসম্মত হইবার কোন কারণ না দেখিয়া, সিপাইকে ডাকিয়া তাঁহার টেবিল হইতে ছবিগুলি আনিতে আদেশ করিলাম। জানিতাম, অবশ্য তাহাকে নিরাশ হইতে হইবে, কিন্তু কি করিব।

সিপাই ছবির রাশি আনিয়া আমার শয্যার উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। ফুলওয়ালী আমার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই সোৎসুকে একের পর একে ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একবার বিস্ময়ে আহ্লাদে "এই এই" করিয়া উঠিল।

আমি এতক্ষণ ছবির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তাহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। তাহার কথায় ছবির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অন্যান্য অনেকগুলি ছবির সঙ্গে দু'চারখানি রং-জলা ফটোগ্রাফ রহিয়াছে, সেগুলি সেই পার্শি ইঞ্জিনিয়ারের সম্পত্তি। তিনি এক দিন আমাদের দেখাইবার জন্য বাক্স হইতে বাহির করিয়াছিলেন, তাহার পর দেখিতেছি, ভুলিয়া ফেলিয়া গেছেন। সেই ছবিরই একখানি দেখিয়া সে হর্ষবিহ্বল হইয়া উঠিল, তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "সাব, আমাকে এইখানি দিতে হুকুম হোক।" আমি বলিলাম, "ছবিখানি আমাদের নয়, আমাদের এক জন বন্ধুর, তিনি ফেলে গেছেন। আচ্ছা তাঁকে চিঠি লিখব, যদি তিনি দিতে বলেন তো তোমাকে দিব।"

সে বলিল, "কবে জান্‌তে পারব, সাব?"

"কাল না হয় পরশুই উত্তর পাওয়া যাবে।"

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ছবিখানা রাখিল। শয্যার উপর অন্যান্য ছবির সহিত একত্রে না রাখিয়া আমার ক্ষুদ্র বেতের টেবিলটির উপর রাখিয়া তাহার বাড়তি ফুলের তোড়াটি তাহাকে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

তৃতীয় দিনে নহে, আজ চতুর্থ দিনে পার্সি সাহেবের উত্তর পাইয়াছি, তিনি ছবিখানি আমাকে লইতে বলিয়াছেন। আমি তাই আগ্রহ-সহকারে ফুলওয়ালীর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি। সে প্রতিদিন সর্ব্বাগ্রে তাম্বু প্রবেশ করিয়াই সাভিবাদনে সর্ব্বাগ্রে ঐ প্রশ্ন করে,—উত্তরে হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে আমার ফুলের তোড়া আমাকে দিয়া অস্ফুট ছবিখানির পদপ্রান্তে রাখিয়া সজলনয়নে তৎপ্রতি চাহিয়া থাকে। তাহার পর মুখ তুলিয়া আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে সেলাম করিয়া চলিয়া যায়।

ঐ সে আসিতেছে। তাহার ফুলের রূপে, তাহার নিজের রূপে ফুল্লপ্রভাত ফুল্লতর করিয়া ঐ সে চঞ্চল-চরণে আসিতেছে। এই তাম্বু-প্রবেশ করিয়া সাভি-বাদনে আমার নিকটে দাঁড়াইয়া ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, আমি তাহার হৃৎকম্পন অনুভব করিতেছি!

আজ সে প্রথমেই ফুলের তোড়াগুলির যথা-বিহিত ব্যবস্থা করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল, "খবর পেয়েছেন আর?" আমি বলিলাম,—"পেয়েছি, ছবিখানি তোমার।"

তাহার নয়নে, আননে কি আনন্দ বিভাসিত হইল, সর্ব্বাঙ্গে কি প্রীতি-পুলক সঞ্চারিত হইয়া উঠিল, সেই তরঙ্গাবেগ আমাকেও স্পর্শ করিতেছে। সে মুখে কিছু কহিল না, কিন্তু তাহার নীরব, কৃত-জ্ঞতা-অভিবাদন অধিকতর মর্ম্মগ্রাহী। তাহার সে সুখে আমি কেমন দুঃখিত হইয়া পড়িলাম—ভাবি-লাম, "কি অপরূপ ঘটনা! এই যৌবনবতী রূপবতী রমণী কি ঐ নির্জ্জীব ছবিখানি দর্শনে, পূজায় আপনার জলন্ত জীবন্ত শতপ্রাণবন্ত অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা চিরসমাধিস্থ করিবে?"

ফুলওয়ালীর মুখে এরূপ কোন দুঃখের ছায়াও দেখিলাম না, প্রীতিময়ী রমণী তাহার চির-আকা-ঙ্ক্ষিত ধনলাভেই যেন অসীম প্রীতিপূর্ণ হইয়া অঞ্চল-হিল্লোলে দিগ্‌দিগন্তে সে আনন্দপ্রীতি বিস্তার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

শুষ্ক নীরস ফটোর পেন্‌ কাহার রূপে নবীন সরস সুকোমল, এখানকার শত অভাব শত অসুখ কোন্‌ স্নিগ্ধতা-সিঞ্চনে পুলক-প্রচ্ছন্ন, তাহা আমি এইবার হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

মিউটিনি

বম্বে প্রদেশের সিন্ধুতীরবর্ত্তী আলিবাগ নামক স্থানে আমরা বাস করিতেছিলাম। মিসেস এ-র বাঙ্গলোর আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ। আহারান্তে ইংরাজিদস্তুরমত পুরুষদিগকে ধূমপান, মদ্যপান এবং তজ্জাতিসুলভ গল্পের বিরল অবসর প্রদান জন্য কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদিগকে ডিনার-টেবিলেই রাখিয়া আমরা কয়েকজন স্ত্রীলোক বাহির-বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছি।

শুক্লপক্ষ রজনী। সম্মুখে জোয়ারের স্ফীত উচ্ছ্বসিত চন্দ্রকিরণে খচিত-বিখচিত নীলাম্বু নিজের প্রাণের আবেগ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখিতে অক্ষম হইয়া বিশ্বপ্লাবন ইচ্ছায় যেন মাতিয়া উঠিয়াছে, অদূরে কোলাবার দুর্গ জলে ভাসাইয়া, দূরদূরান্তব্যাপী শুভ্র বালুচর আচ্ছন্ন করিয়া ঠিক বাঙ্গলোপ্রান্তের কৃষ্ণ-প্রস্তর-স্তূপের সন্নিকটে যেখানে দুইটি সতীস্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পাদদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, সহসা সাগরের সফেন-তরঙ্গ-ভীম গর্জ্জন মুহূর্ত্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছে; তৎস্পর্শে সাহসহীন সিন্ধুবর যেন সেখান হইতেই সবিস্ময়ে শত নমস্কার শত স্তুতিগানে তাহাদিগের চরণ-বন্দনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে আবার পিছাইয়া পড়িতেছে।

সুদূর পশ্চিমে সমুদ্রবক্ষে আন্ধারী ও কাণ্ডারী দুর্গদ্বীপ দুইটির অন্ধকার কায়া জ্যোৎস্নালোকে অস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। এক সময়ে কোন্‌হোজি আংগ্রিয়ে নাকি তাঁহার বন্দীদিগকে এই দ্বীপে আবদ্ধ রাখিতেন। এখন আন্ধারী দুর্গ একেবারে জনশূন্য, কাণ্ডারী দুর্গ একটি লাইট হাউসরূপে পরিণত। লাইট হাউসের কর্ত্তা একাকী এই বিজন দ্বীপে তাঁহার একটিমাত্র সহচর ভৃত্য ফ্রাইডের সহিত রবিন্‌সন ক্রুসোর ন্যায় জীবন যাপন করেন। উক্ত দীপস্তম্ভাগ্রের ঘূর্ণ্যমান আলোক এখন খোনাকি-ভাতির ন্যায় মাঝে মাঝে আমাদের নেত্রে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার হীনপ্রভ হইতে হইতে মুহূর্ত্তকাল একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছিল।

এইরূপ দৃশ্যসমূহ সম্মুখে রাখিয়া আমরা নানারূপ গল্প করিতে করিতে পুরুষদিগের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাঁহারা আসিলে তবে গানবাদ্য অথবা নীরব হেঁয়ালি-নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইবে।

আপাততঃ আমাদের গল্প চলিতেছিল। ট্রানসভ্যাল যুদ্ধের ঐকান্তিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে জাতীয় বীরত্বের কথা আসিয়া পড়িল; গৃহকর্ত্রী সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন,—তিন জন ফ্রেঞ্চম্যান পাঁচ জন জার্ম্মাণের সমান, আর এক জন ইংরাজ সেই তিন জন ফ্রাঞ্চম্যানের সমান। খুবই গর্ব্বপূর্ণ কথা এবং অযথাও নহে। ইংরাজসংস্পর্শে আমি ইতিপূর্ব্বে জাতিগত অসমকক্ষতা কখনো অনুভব করি নাই, বরাবরই তাঁহাদিগের নিকট হইতে সম্যক্ সম্মান ও বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজ এই স্বাধীন বীর-ললনার উক্তরূপ জাতীয় আত্মগৌরবে আমার হীনতা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। লজ্জায় অপমানে আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে শুধু বাকী রহিল। মনে মনে দগ্ধ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে দাস-জীবনের একমাত্র সান্ত্বনাস্বরূপ পুরাতন আর্য্যগৌরব স্মরণ করিতে করিতে সহসা বলিলাম,—"ঐ যে সতীস্তম্ভ উহা আংগ্রীরাজরাণীদিগের—না।"

মিসেস বি—আর এক জন নিমন্ত্রিতা, তিনি বলিলেন,—"এই রকম তো শোনা যায়, কি ভয়ানক নিষ্ঠুর আচার।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু কি ভয়ানক সাহস!"

কেহ আর এ কথায় কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু মিসেস বি-র নীরব অধরোষ্ঠভঙ্গী

দেখিয়া মনে হইল, তিনি মুখে কিছু না বলুন—যেন মনে মনে হাসিয়া বলিতেছেন—ভারি তো সাহস! পোড়াইয়া মারিতেছে; ইহাতেও কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই, ইহাই তোমাদের সাহস বটে। আর অধীনতা-পেষণে পেষিত হইয়া পুণ্যসুখ জ্ঞান করা তোমাদের মত সাহসী লোকেরই স্বভাবসুলভ বটে।

ভাবিলাম, তিনি যদি এইরূপ বলেন, আমি কি উত্তর দিতে পারি? যাহা হউক, সে কথা সেই-খানেই বন্ধ হইল, আমি বলিলাম—"ঐ দ্বীপ ছুটি আংরের বন্দীখানা ছিল—না? উঃ,আংরে কি কাণ্ডই করিয়াছিল, পেশোয়া, ইংরাজ, মুসলমান, পর্ত্তুগীজ কেহই তাহাকে হার মানাইতে পারেন নাই।"

মিসেস এ বলিলেন—"Horrible! But he was only a perfect!" তাহা সত্য! এক জন স্বাধীন ইংরাজের পক্ষে যাহা বীরত্ব, এক জন দাস নিগরের পক্ষে তাহা ঘৃণ্য সাহস, দস্যুতা নয় তো আর কি?"

মিস্ সি—সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়া মিসেস এর অতিথি হইয়া আছেন। তিনি উক্ত দস্যুতা সিপাহি-বিদ্রোহেরই একটি অঙ্গীভূত ঘটনা ভাবিয়া বলিলেন,—"Oh how dreadful! মিসেস এ, —আপনি ইণ্ডিয়ান মিউটিনির সময় এ দেশে ছিলেন?"

মিসেস্ এ—হাসিয়া বলিলেন—"না আমি ছিলাম না, তার প্রধান কারণ, আমি তখনো জন্মাই নাই—কিন্তু আমার বাপ তখন এ দেশে ছিলেন।"

মিস সি এক জন স্কচ ললনা—স্কট্‌লণ্ডবাসিগণের রহস্যজ্ঞান কম—ইংরেজগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। গৃহকর্ত্রীর এই ব্যঙ্গোক্তিতে তাই আমরা সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিলাম—কিন্তু তিনি এ ঠাট্টাটা বুঝিলেন কি না, জানি না,—সহজ ভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাবা কি মিউটিনির মধ্যে কখনও পড়িয়াছিলেন?"

মিসেস্ এ বলিলেন, "না, আমার বাবা সৈনিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি না পড়ুন—আমি একবার একটা মিউটিনির মধ্যে পড়িয়াছিলাম! উঃ, সে কি ভয়ানক!"

আমাদের আর কৌতূহলের সীমা রহিল না। মিসেস্ বি—বলিলেন, "সত্যি? কিন্তু এ অঞ্চলে আবার কবে মিউটিনি হোল?"

মিস সি—বলিলেন, "ওঃ! না শুনেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত!"

আমি বলিলাম—"যা হ'ক, বিপদ থেকে তো ইনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, এখন গল্পটা শুনলে কৌতূহল থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পারি।" এইরূপে সকলেই আমরা সংক্ষেপে নিজ নিজ কৌতূহল ব্যক্ত করিয়া তাঁহার মিউটিনির অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। তিনি আনুপূর্ব্বিক বলিয়া গেলেন, আমরা ভীত, স্তম্ভিত, নির্ব্বাক হইয়া শুনিলাম। যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য ঘটনা; শুনিয়া কাঁদিব কি হাসিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা পাঠককে অনুভব করাইবার ইচ্ছায় গল্পটি যেমন শুনিয়াছি—নিম্নে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলাম।

মিসেস এ-র কথা

"আমি বিবাহের পর সবে মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছি। ছেলেবেলায় কিছুদিন বাঙ্গালা দেশে ছিলাম বটে, কিন্তু তখন আমি এত ছোট যে, সে কথা মনে পড়ে না, এ দেশের সহিত সজ্ঞানপরিচয় আমার এই প্রথম। বম্বে আসিয়া স্বামী শহরের আসিষ্টেণ্ট কলেক্‌টার নিযুক্ত হইলেন; আমরা দু'জনে সিন্ধুদেশের রাজধানীতে আসিয়া ঘরকন্না গুছাইয়া বসিলাম। স্বামী মাঝে মাঝে যখন টুরে গমন করেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই; কিছুদিন গ্রামে ঘুরিয়া ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাটাই, আবার শহরে ফিরিয়া স্থিতির আরাম অনুভব করি। কিন্তু একবার স্বামীর শুধু দুই চারিদিনের জন্য মাত্র কোন একটি গ্রাম তত্ত্বাবধানে যাইতে হইল, আমি আর এই অল্প সময়ের জন্য তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা না করিয়া বাঙ্গলোতেই একাকী রহিয়া গেলাম। একাকী কথাটা এখানে কতদূর সঙ্গত, তাহা লইয়া যদিও তর্ক উঠিতে পারে, কেন না—দাসদাসী সিপাই-শাস্ত্রীতে বাঙ্গলো সমানই পূর্ণ রহিল। তথাপি স্বামীর অনুপস্থিতিকালে আমার একাকিত্ব বিনা আপত্তিতে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে ধার্য্য হইয়া গেল এবং পূর্ব্ব হইতেই আমার অরক্ষিতাবস্থা কল্পনা করিয়া অনেকেই খুব ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন, এমন কি, পুলিসকর্ত্তা স্বয়ং অনুকম্পা করিয়া সে

কয়দিনের জন্য তাঁহার কতকগুলি সিপাহী পর্য্যন্ত আমার রক্ষকতাকার্য্যে প্রদান করিতে চাহিলেন। আমি কিন্তু তাহা আবশুক বিবেচনা করিলাম না। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে আমার নিজের সিপাহীদের প্রতি অন্যায় সন্দেহ দেখান হইবে; তাহারা ভাবিবে, তাহাদের উপর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস নাই। তাহাদিগের মনে দুঃখ দিতে আমার ইচ্ছা হইল না, ধন্যবাদ প্রদানে পুলিসকর্ত্তাকে তাঁহার দানে নিরস্ত করিলাম।

দেশে থাকিতে এ দেশের ভৃত্যদিগের সম্বন্ধে নানা রূপ-কথা শুনিয়া মনে হইত বটে, তাহারা না জানি কিরূপ কিম্ভূতকিমাকার। নির্ব্বুদ্ধি বর্ব্বর তো বটেই—উপরন্তু সিপাহী সৈনিকের দল পশুবৎ নিষ্ঠুর ভীষণ প্রকৃতি ও বিশ্বাসঘাতক। আমাদের দেশের সৈনিকের আদর্শে এবং মিউটিনের নানারূপ বীভৎস অত্যাচারের কথা হইতে বোধ হয় আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশে আসিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। দেখিলাম, আমাদের দেশের তুলনায় এ দেশের ছোট লোকেরা এবং সৈনিকেরাও বহুগুণে শিষ্টশান্ত; চাকর-দাসীরা নির্ব্বোধ তো নহেই, অধিকন্তু খুবই প্রভুপরায়ণ। নিজের সিপাহী পাটাওয়ালাদের উপর আমার একান্ত বিশ্বাস জন্মিল, এরূপ প্রভুভক্ত ভৃত্যবেষ্টিত থাকিয়া আমি যে সম্পূর্ণ নিরাপদ, তাহা বেশ জানিতাম। তাই পুলিসকর্ত্তার প্রস্তাবে মনে মনে বরঞ্চ উত্ত্যক্ত বোধ করিলাম, কিন্তু তাঁহার সৌজন্যে তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলাম, "আমার সিপাহীরা থাকিতে আমি অরক্ষিতা নই—তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" স্বামী আমার উচ্ছ্বাসে হাসিতে লাগিলেন, আর পুলিস সাহেব মনে মনে চটিয়া নানা তর্ক-যুক্তিতে আমার মত-পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু কিছুতেই আমার সঙ্কল্প টলিল না। পুলিস-সাহেবের অনুগ্রহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর গমনের পর রাত্রে শুধু আমাদিগের নিজের প্রহরীর প্রহরায় নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে শয়ন করিতে গেলাম। আয়া আমার কক্ষেই রহিল।

কিন্তু হা বিধাতঃ! কর্ম্মফল এত হাতে হাতে ফলিবে, তাহা কে জানিত! রাত্রি যখন গভীর, তখন একটা ভয়ানক কলরবে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তখনো সম্পূর্ণ চৈতন্য হয় নাই, নিদ্রার ঘোর তাগে নাই; সেই অর্দ্ধ-জ্ঞান অর্দ্ধ-মোহের অবস্থায় বাহিরের চীৎকার-কোলাহল যেন শত কামানের ধ্বনিতে আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনাও আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম। সেই ভীষণ ধ্বনিতে জ্ঞাত অজ্ঞাত যত কিছু বিভীষিকারাশি আমার মানস-নয়নে নৃত্য করিয়া উঠিল; আতঙ্কের বিদ্যুৎশিখা সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত, তরঙ্গিত হইল, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের মিউটিনির কথা মনে পড়িল। তাহার সূচনাও স্থানে স্থানে এইরূপেই হইয়াছিল। বুঝিলাম, ইহাও সেইরূপ একটি মিউটিনির আরম্ভ—আর রক্ষা নাই।

অকূল সমুদ্রে মানুষ যেমন তৃণ ধরিতে চেষ্টা করে, আমিও প্রাণভয়ে ভীত হইয়া আয়া আয়া করিয়া চীৎকার করিয়া বিছনায় উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু আয়াই বা এখন কোথায়? কই, এ ঘরে তো সে নাই? সে-ও কি তবে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে? আমার এত বিশ্বাসের কি প্রতিফল ইহাই? হায়! কেন পুলিসের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম? যাঁহারা বহুদিন এ দেশে থাকিয়া ইহাদের ধাত ঠিক বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের সাবধানতায় কেন কর্ণপাত করিলাম না।

আসন্নমৃত্যু-কল্পনায় ভয়াতিশয্যে আমার সমস্ত শক্তি যেন অবসিত হইল। উঠিয়া আত্মরক্ষার যে কোনরূপ চেষ্টা করিব, তাহার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারাইলাম। ভয়বিহ্বল জ্ঞানহীনভাবে শয্যাসীনা হইয়া শেষ দিন স্মরণ করিতে করিতে একমনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। এই সময় আয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—"মাদাম সাব!" তাহার স্বর পূর্ব্বের ন্যায় সমান সম্মানসূচক, সমান ভক্তিপূর্ণ, তাহাতে আমি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া উঠিলাম;—হাতের কাছে একটা সহায় বন্ধু দেখিয়া সহসা বিবেচনা-শক্তি ফিরিয়া পাইলাম, এতক্ষণ ভয়ে আর সমস্ত মানসিকশক্তি যেন লোপ পাইয়া গিয়াছিল। আয়ার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়া আসায় সিপাহীদের প্রতিও বিশ্বাস ফিরিল। ভাবিলাম, আমার সিপাহী নহে, শত্রুর সৈনিকগণ বিদ্রোহী হইয়া আমার বাঙলো আক্রমণ করিয়াছে। আমার কয়েক-জন সিপাহী তাহাদের তুলনায় নিতান্ত সামান্য-সংখ্যক, আমাকে রক্ষা করিবে কি করিয়া?

চকিতের মত এই অনুমান আমার মাথার মধ্য দিয়া চলিয়া গেল, আমি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাহিরে কিসের কলরব? কি হইয়াছে? আমার সিপাহীরা কোথায়?" আয়া ইহার উত্তরে অনেক কথাই বলিল, কিন্তু আমি কি ছাই তাহার ভাষা বুঝি? অল্পদিন এ দেশে আসিয়াছি, দু একটা কথার টুকরা বুঝিতে ও কহিতে শিখিয়া তাহার সাহায্যে আকার ইঙ্গিতে কোনরূপে কাজ চালাই মাত্র। আয়া যাহা বলিল, তাহার মধ্যে তিনটি কথা আমার বোধগম্য হইল,—"পুলিস, সিপাই, লড়াই।" আমার অনুমানই ত তবে ঠিক! শুনিয়াছিলাম, শঙ্করের গুপ্তদুর্গে বহুসংখ্যক সৈন্য আছে, তাহারাই যে বিদ্রোহী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। পুলিশসিপাহী আর সৈনিকসিপাহী যে স্বতন্ত্র, তখন সে জ্ঞান ছিল না। আয়ার কথায় আমার পূর্ব্বাশঙ্কা আবার সবলে ফিরিয়া আসিল, পাগলের মত বলিলাম, "লড়াই, মিউটিনি? তাহারা আমাকে হত্যা করিবে? oh help help!" আয়া আমার সমস্ত কথা না বুঝুক, আমি যে খুব ভয় পাইয়াছি, তাহা বুঝিয়া বলিল, "নেহি নেহি মাদাম সাব।"

"নেহি নেহি? no help! no help! Oh God save me! Oh save me!

বাহিরে অস্ত্রের ঝনঝনা যেন আরো বাড়িয়া উঠিল, কলরব ভীষণতররূপে আমার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, help me oh god বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া আমি বিছানার বাহির হইতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না, সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। উঃ, কি ভীষণ রাত্রি!"

বলিয়া তিনি থামিলেন। আমরা এতক্ষণ নীরব ঔৎসুক্যে তাঁহার কাহিনী শুনিয়া যাইতেছিলাম। তিনি থামিলে বলিলাম, "কি ভয়ানক, তার পর?"

তিনি বলিলেন, "তার পর আমি মরি নাই, তাহা হইলে এ গল্প আর শুনিতে পাইতেন না।"

"কিন্তু শেষে কি হইল? সত্যই কি মিউটিনি—"

"না। এতটা ঝড় শুধু চা-দানীর মধ্যেই বহিয়াছিল।

আমরা আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন,—মূর্চ্ছাভঙ্গে বা নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, আয়া তখনো আমার সেবা করিতেছে—রাত্রিও ভোর হইয়াছে, আর বাহিরের কোলাহলও একেবারে নিস্তব্ধ। আমি যেন দুঃস্বপ্নভঙ্গে সহসা জাগিয়া উঠিয়া প্রশান্ত প্রভাতালোকে বিস্মিত হইয়া চাহিলাম। কিন্তু তখনো কেমন মনে করিতে পারিলাম না যে, রাত্রের অত কোলাহল, অত ভয় সমস্তই মিথ্যা স্বপ্ন, একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আয়া, এতক্ষণ না একটা ভয়ানক চীৎকার গোলযোগ চলিয়াছিল?"

আয়া স্নেহকণ্ঠে বলিল,—"না সাব, তুমি ঘুমাও।" রাত্রি ত প্রভাত হইয়াছে—তখন আর ঘুমাইব কি, আমি প্রাতর্বেশ পরিধান-অভিপ্রায়ে বিছানা হইতে উঠিতে উঠিতে তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আয়া, আমার যেন মনে হইতেছে, রাত্রে খুব একটা গোলমাল হইতেছিল—কি হইয়াছিল?"

আয়া আবার কত কি বকিয়া গেল—তাহার সেই বাক্যসমষ্টির মধ্য হইতে আমি আবার পূর্ব্বরাত্রের সেই কয়টি কথা সংগ্রহ করিলাম—"পুলিস, সিপাই, লড়াই।" কিন্তু শান্ত প্রভাতে আর পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় সে কথায় আমাকে ভয়াভিভূত করিল না। আসল ঘটনা কি, জানিবার জন্য শুধু কৌতূহলী হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আয়ার কথা হইতে তাহা বুঝিবার আশা করিতে গেলে পুনর্জ্জন্মের জন্য অর্থাৎ doom's day পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, অতদিন সবুর করিতে আমার ধৈর্য্য নাই। কাজেই আমাকে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল। এক জন সিপাহী কিছু কিছু ইংরাজী বলিতে পারিত—আমি তাহাকেই ডাকিতে বলিলাম।

তাহার কাছে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বুঝিলাম, যত অনর্থের মূল আমাদের পুলিস-সাব। আমার কথা না মানিয়া রাত্রিকালে তিনি তাঁহার কতগুলি সিপাই আমার রক্ষার জন্য পাঠান, ইহাতে আমার সিপাইরা অপমানিত জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে কহে, এই কারণে ক্রমশঃ উভয়পক্ষে রীতিমত বাক্য-সংগ্রাম আরম্ভ হয়; সেই কলরবে নিদ্রোত্থিত হইয়া আমি ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ি।

পুলিস-কর্ত্তার উপর ভয়ানক রাগ হইল। তাঁহার মূর্খতাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে ক্রটি করিলাম না! আমাকে রক্ষা করিতে গিয়াই তিনি অর্দ্ধমৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন!

কিন্তু পশ্চাৎ জানিতে পারিলাম, তিনি একাই দোষী নহেন, প্রণয়দেবতারও ইহাতে কিছু হাত ছিল। আমার পাটাওয়ালাদের একজন আমার প্রতি অনুরাগী, তাহাদের রোমান কাথলিক মতে শীঘ্রই বিবাহ হইবে। পুলিস-সিপাহীর মধ্যে একটি যুবকের সে আরাধ্যা, কিন্তু সে বেচারা অল্পদিন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, বেশী অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে নাই, তাই আমার অভিভাবকেরা তাহার বিবাহপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার আশা নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে। তথাপি তাহাকে আমার বাঙ্গলোর আমার এত সন্নিকটে দেখিয়াই উহার ভাবী স্বামীর মন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। প্রণয়িদ্বয়ের এই ঈর্ষ্যা-স্ফুলিঙ্গেই সে রাত্রের দুই পক্ষের সিপাহীগণের বিদ্বেষানল প্রথম জ্বলিয়া উঠে।

অমর গুচ্ছ

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:০:—

আমি বালবিধবা। বিবাহের আনন্দ-সঙ্গীত নীরব হইতে না হইতে নিরানন্দ-ক্রন্দনে আমাদের গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তখন শিশু বলিলেও হয়। আমার বয়স তখনও বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই। পিতার সেই শোকপীড়িত মূর্ত্তি, মাতার সেই হৃদয়-বিদারক বিলাপধ্বনি মনে পড়িলে এখন আমি যন্ত্রণাকাতর হইয়া পড়ি, কিন্তু তখন সে সকল কিছুই আমার মর্ম্মভেদ করিতে পারে নাই; নিজের পরিণাম বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্ত তখন আমার জন্মে নাই।

আমি পিতার একটিমাত্র কন্যা; বড় সাধের আদরের কন্যা। আমার দুঃখে পিতামাতা আমা হইতেও অধিক কাতর। তাঁহাদের অজস্র করুণা শতসহস্রধারে অহরহঃ আমার প্রতি বর্ষিত, আমার কোন একটি সামান্য আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া তাঁহারা অসামান্য আনন্দ অনুভব করেন, কিন্তু এত আদর-যত্নে কি আমি সুখী!

বলা বাহুল্য, বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত আমি আর শ্বশুর-গৃহে যাই নাই। বিধাতার বিধানে পিত্রালয়ই চিরদিন আমার আলয়। আহারে, সাজসজ্জায় পিতা মাতা আমাকে এতদিন বিধবার আচার পালন করিতে দেন নাই। কিন্তু আমি বুঝিতে শিখিয়া অবধি তাঁহাদিগের মনে কষ্ট দিয়াও বিধবার আচার রক্ষা করিয়া চলি। ইহাতে লোকে আমাকে প্রশংসা করে; কিন্তু সে জন্য আমি চরিতার্থ জ্ঞান করি না। যাহার আনন্দ সুখসম্পদ চলিয়া গিয়াছে, সকল সুখ-সম্পদে তাহার তৃপ্তি কোথায়! তাহাতে কেবল অতিরিক্ত অনুতোপবেদনা জাগাইয়া তুলে। ভগবান্ আমাকে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তব্যপথে চলা আমার আয়ত্তাধীন, তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিব কেন?

স্বামীকে আমার মনে পড়ে না। যাঁহার অভাবে আমার সমস্ত জীবন শূন্য, তিনি কে, তাহা আমি ঠিক জানি না। তবুও তাঁহার স্মৃতিতে, তাঁহার ধ্যানে হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিতে চাই। ইহাই আমাদের আজন্ম শিক্ষা, চিরন্তন সংস্কার। তাহা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, পুণ্য কি পাপ, সে তর্ক পর্য্যন্ত আমার মনে উদয় হয় না।—দূরা-তীত সুখস্বপ্নের ন্যায় কখনও কখনও বিবাহের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে একটি ছায়াময় মূর্ত্তি মানসপটে বিভাসিত হয়। তাহা জীবন্ত আকারে প্রত্যক্ষ করি-বার জন্য দারুণ আকুলতা জন্মে, কিন্তু মনের আবেগ মনে রুদ্ধ করিয়া, অশ্রু-মলিন নয়নের সমক্ষে তখন একখানি ফটোগ্রাফ আনিয়া ধরি।

ফটোগ্রাফখানি আমার স্বামিদেবের, বহুদিনের তোলা, তাই রেখা বিলীন, অস্পষ্ট, লুপ্তপ্রায়। এই ছবি তাঁহার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন, সুতরাং ইহার মত মূল্যবান্ বস্তু আমার আর কিছুই নাই। একটি ক্ষুদ্র চন্দনকাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে ইহা আমি বহুযত্নে তুলিয়া রাখি। বাক্সটি আমার শয়ন-কক্ষের কোলঙ্গায় থাকে। আমি যেখানেই যাই, ইহাকে সঙ্গ ছাড়া করি না।

এই ছবিখানি অকূলসমুদ্রে ভাসমানা আমার জীবন-তরণীর পক্ষে ধ্রুবতারা-স্বরূপ। যে কারণেই হউক, যখন হৃদয়-প্রাণ নিতান্ত শ্রান্ত, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারের প্রতি বিশ্বাস লোপ পায়, জীবন অসহ্য যন্ত্রণাময় এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকার-নিরাশা বলিয়া মনে হয়, তখন আমি এই ছবিখানি দেখি। ইহা সম্মোহন মন্ত্রপূত জানি, দেখিতে দেখিতে আমার দুর্ব্বল হৃদয় সবল হইয়া উঠে, নৈরাশ্যাভিভূত প্রাণে আশা সঞ্চারিত হয়, অন্ধকার ভবিষ্যৎ আলোকরেখায় রঞ্জিত হইতে থাকে। মনে

হয়, ভগবান্ সত্যই নিষ্ঠুর নহেন, চির-দুঃখ সংসারে নাই। অন্ধকার রজনীশেষে উষার আলোক অবশ্যম্ভাবী; ঝটিকাবসানে শান্তিমঙ্গল স্বতঃ উৎসারিত, আর এই বালিকার অদৃষ্টেই কি ভগবান্ চিরদুঃখ লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই পারে না। মনুষ্যের জীবন জন্মজন্মান্তররূপ বৃহৎ উন্নতি গ্রন্থের এক একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ, এক পরিচ্ছেদে যদি বা হাহাকার, অন্য পরিচ্ছেদে মহানন্দ। বিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আলয় নহে, হইতেই পারে না।

একবার আমি এই চন্দন-বাক্সে আমার দেবপদতলে কতকগুলি ফুল-অর্ঘ্য রাখিয়াছিলাম। সচরাচর যেরূপ ফুলে লোকে দেবপূজা করে, ইহা সেরূপ কোন ফুল নহে। জবার সৌন্দর্য্য কিংবা গোলাপ বা শতদলের সুগন্ধ তাহাতে ছিল না। সেগুলি সামান্য শোভাময়, নির্গন্ধ, ক্ষুদ্র, পর্ব্বত-কুসুম। সহজে শুকায় না, তাই তাহার নাম অমর পুষ্প। আমাকে আনন্দদানের জন্য এক নির্ভীক হস্তে তাহা আহৃত হইয়াছিল।

আমি তখন বয়সে ষোড়শী, আমার ভ্রাতার সহিত নৈনিতাল পাহাড়ে বাস করি। দাদা পশ্চিম প্রদেশের সিভিলিয়ান, প্রায় প্রতি বৎসরেই গ্রীষ্মের ছুটী এই পাহাড়ে অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য, দাদা দেশে ফিরিয়া বিদেশী আচরণ গ্রহণ করিয়াছেন। আমি যখন তাঁহার কাছে থাকি, ইংরাজের সহিত আমার আলাপ করিতে হয়। তবে এখানেও স্বদেশী পুরুষের নিকট আমি বাহির হই না।

সে দিন রবিবার। আহারান্তে আমরা কাচের বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছি। দাদা আরাম-চৌকিতে শুইয়া গুড়গুড়ির নল টানিতে টানিতে ছবির কাগজ দেখিতেছেন—আর আমি তাঁহার পদপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মোড়ায় বসিয়া, তাঁহার মুখনির্গত ধূমপুঞ্জের দিকে চাহিয়া তাহা হইতে নানারূপ ছবি সৃজনের প্রয়াস করিতেছি। এই সময় চাপরাশী আসিয়া দাদাকে একখানি কার্ড আনিয়া দিল। দাদা নাম পড়িয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন "হ্যালো! কে এসেছে বল্ দেখি! এঞ্জেল! সিপয়, তাঁকে এখানে আন।"

এঞ্জেল দাদার একটি বিলাতী বন্ধু। ইঁহার গল্প দাদার মুখে যখন তখন শুনিতে পাই। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া আমিও আনন্দ-সহকারে বলিলাম, "মিষ্টার চাটার্জ্জি, সত্য নাকি? তুমি দেখছি এবার তা হ'লে দেশে বসেই বিলাত উপভোগ করবে?"

এই বলিয়া আমি সে ঘর হইতে চলিয়া যাইবার মানসে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দাদা আমার অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "সে হবে না। তুই যেতে পাবি নে। এখানে ইংরাজের সঙ্গে দেখা-শুনা করিস, আর এঞ্জেল আমার এত অন্তরঙ্গ বন্ধু—তার সঙ্গে দেখা না করলে সে কি মনে করবে বল দেখি? তোর থাকতেই হবে।"

এইরূপে আমি সেখানে রহিয়া গেলাম। অল্প ক্ষণ পরেই দাদার বন্ধু গৃহাগত হইলেন, এতদিন যাঁহার গল্প শুনিয়া আসিতেছি, তাঁহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:০:—

এক সপ্তাহ তিনি আমাদের অতিথি হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তের মত ক্ষণস্থায়ী অতি ক্ষুদ্র একটিমাত্র সপ্তাহ; কিন্তু এই বুদবুদবিন্দুর সংস্পর্শে আমার সুপ্ত-হৃদয় কি অভিনব মধুর অভিজ্ঞতায়, কি অসীম সুখ-হিল্লোলে চঞ্চল ও জাগরিত হইয়া উঠিল। বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে—সে সপ্তাহ এমন আত্মহারাভাবে কাটিয়াছিল যে, আমার সেই প্রতিদিন পূজ্য ছবিখানি পর্য্যন্ত দেখিতে মনে পড়ে নাই।

অতিথি যে কয়দিন ছিলেন, প্রায়ই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইত, কিন্তু কথাবার্ত্তা কিছুই প্রায় হইত না। দাদাতে, তাঁহাতে ইংলণ্ডের গল্প করিতেন, আমি মুগ্ধকর্ণে শুনিয়া যাইতাম। কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইত,—কিন্তু কে জানে, কেন জিহ্বাগ্রে আসিয়াই সমস্তই নীরব হইয়া পড়িত।

অতিথি দূরে থাকিলে কত প্রশ্ন, কত কথা মনে মনে রচনা করিয়া রাখিতাম, কিন্তু তাঁহার পদশব্দ শুনিলেই হৃৎপিণ্ডে শোণিতরাশি এমন বেগে উথলিয়া উঠিত যে, মনে হইত, সে শব্দ যেন কানে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিতেছে। আমি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতাম। অতিথি নিকটে আসিয়া প্রতিদিন

একটি দীনা, মলিনা, বাক্‌শক্তিহীনা বালিকাকে মাত্র দেখিতেন! দেখিয়া কি মনে করিতেন, তিনিই জানেন।

সকলেই বলিত, আমাদের অতিথি বেশ সুপুরুষ! আমি মনে করিতাম, তাঁহার মত সুন্দর পুরুষ সংসারে দ্বিতীয় নাই। যখন ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাকে দেখিতাম, তখন আমার নয়নে নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তিনি শোভা পাইতেন। কিন্তু পূর্ণ-দৃষ্টিতে ভাল করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আমার কখনও সাহস হইত না। নয়নে নয়ন সংলগ্ন হইলেই দৃষ্টি আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়িত। এই চকিত দর্শনেই কি মহাপুলক শিরায়-শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উঠিত! জানি না, পূর্ণদর্শনে—পূর্ণবাক্যালাপে অধিকতর সুখ-সম্ভব কি না!

সপ্তাহ প্রায় কাটিয়া আসিল। অতিথির বিদায়ের আর একটি দিনমাত্র বাকী আছে, দাদা সেই দিন আমাদিগকে লইয়া টাইগার হিলে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নাইনিতালের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম টাইগার হিল। এখান হইতে তুষারাচল-শ্রেণী—অতিশয় সুবিস্তৃত ও মনোহররূপে নেত্রগোচর হয়। দারজিলিং গিয়া সিঞ্চলশিখর হইতে প্রত্যূষে মেঘ-শূন্য নির্ম্মল দিগন্তে নব সূর্য্যকিরণদীপ্ত তুষারশৃঙ্গ-রাজির শোভা যিনি না দেখেন, তাঁহার যেমন দারজিলিংযাত্রা বৃথা, টাইগার হিল হইতে হিমালয়-শোভা না দেখিলে নাইনিতাল-যাত্রাও সেইরূপ সুসিদ্ধ হয় না।

আমরা পরদিন স্নিগ্ধ সূর্য্যালোকসিঞ্চিত প্রাতঃ-কালে ফুল্ল-বসন্তশোভিত পার্ব্বত্যপথে সুন্দর দৃশ্য ও সুন্দর বায়ু উপভোগ করিতে করিতে শিখর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

শিখর-পথ স্থানে স্থানে অতিশয় সঙ্কীর্ণ এবং সর্ব্ব-ত্রই কষ্টকর চড়াই। যাত্রাকালে দাদারা অশ্বারোহণে আমার ডাণ্ডির দুই পার্শ্ব গ্রহণ করিয়া চলিলেন,—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তফাৎ হইয়া পড়ি-লাম। অশ্বারোহী দুই জন কখনও আমার পাশে, কখনও সম্মুখে, কখনও নিকটে, কখনও দূরে, কখনও আবার বাঁক্ পথে, একেবারেই অদৃশ্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু পথিপার্শ্বের দৃশ্যমান্ গোলাপ পুষ্পোত্থিত সুরভির ন্যায় এবং দূরাগত অদৃশ্য বসন্তহিল্লোলের ন্যায় দূরে বা নিকটে সর্ব্ব সময়েই আমি তাঁহাদের নৈকট্য অনুভব করিতে ছিলাম।

বসন্তকালে নাইনিতালের মত রমণীয় শোভা অন্য কোন পাহাড়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না পর্ব্বতের ঢালু অঙ্গে, উচ্চশৈলে, পথের পার্শ্বে পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, যেখানে সেখানে নবপল্লবিত শৈবালজড়িত, শ্যামকান্তি তরুরাজি। তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, শাখায়পাতায়, বন্য গোলাপলতা জড়িত বিজড়িত হইয়া একে দুয়ে, স্তবকে গুচ্ছে, ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। আমার মনে হইতে লাগিল না জানি, এ কোন মায়াকাননের মধ্য দিয়া কোন পরীরাজ্যের দিকে প্রধাবিত হইয়াছি।

নয়নদৃষ্টিতে পলকে পলকে অলকার এই সৌন্দর্য্য-বিকাশ, নিশ্বাসের আকর্ষণে এই সুরভি উচ্ছ্বাস এবং জানি না, ইহা ছাড়া আর কি, আমাকে সুখোন্মত্ত করিয়া তুলিল। অতি সুখে আত্মহারা হইয়া ভুলিয়া গেলাম, আমি বিধবা। এতদিনের সযত্ন-অভ্যস্ত আত্মসংযম এক মুহূর্ত্তে হারাইয়া ফেলিয়া, বালিকাস্বভাবসুলভ চপল বাস-নায় আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল! আমি স্বহস্তে কতকগুলি গোলাপ তুলিবার মানসে ডাণ্ডি-ওয়ালাদিগকে ক্ষণকালের জন্য ডাণ্ডি নামাইতে বলিলাম।

কিন্তু ডাণ্ডিওয়ালাদিগের এখন গোলাপ বাগানে কাটাইবার সময় নহে। স্কন্ধের বোঝা যথাস্থানে নামাইতে পারিলেই, তাহারা আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচে। অতএব আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে চলিতে তাহারা বলিল, "উপরে ঢের ফুল আছে, সেখানে গিয়া তুলিলেই হইবে।"

কি করিব? সেই আশাতেই প্রলুব্ধ হইয়া অগত্যা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:০:—

কখন যে শিখরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সহসা এক স্থানে ডণ্ডিওয়ালাদের সমতান শব্দ অকারণে যেন নীরব হইয়া গেল, আর তন্মুহূর্ত্তে ডাণ্ডিখানাও তাহাদের স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূমে নামিয়া পড়িল। চমকিয়া উঠিলাম, মনে হইল—একি, এ কোথায় নামাইতেছ! কিন্তু অশ্বারোহিগণকে নিকটে দেখিয়া মুহূর্ত্তে আশ্বস্ত বোধ করিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। কি মনোমুগ্ধকর চমৎকার দৃশ্য! চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলাম, কি যেন ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে আমাদের পদতলের পাহাড় দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, আমরা তুষারদৃশ্য সম্মুখে করিয়া এক সমুচ্চ চূড়ায় চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি। তুষারাচল শ্রেণী দিগ্বলয় বিলোপ করিয়া উচ্চনীচ শত শৃঙ্গে, স্তরে স্তরে, পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে, নীল শুভ্র মেঘাম্বরে—হীরকমণ্ডিত চিত্রশোভায়, শতনক্ষত্রদীপ্তিতে অপূর্ব্ব স্তব্ধ-গম্ভীর মহিমায় বিভাসিত! ইহাই কি কৈলাস! আমরা কি সহসা জীবন্মুক্ত, সশরীরে দেবনিকেতনে আগমন করিলাম! সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল, ভয় হইতে লাগিল, এখনি এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ভৃত্যগণ আগে হইতে আসিয়া একটি ক্ষুদ্র শিবিরে খাতাদি প্রস্তুত রাখিয়াছিল।—সেখানে সেখানে বিস্তর কালক্ষেপ না করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র আমরা বাহিরে প্রত্যাগমন করিলাম। ডাণ্ডিওয়ালাদিগের আশ্বাসবাক্য তখন স্মরণ হইল; আমি চারিদিকে গোলাপ-লতার অন্বেষণে নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু হা অদৃষ্ট! গোলাপফুল ত দূরের কথা, কোন ফুলই সেখানে দৃষ্টিগোচর হইল না। এমন কি, শিখরতলে তরুলতার শ্যামশোভা পর্য্যন্ত নাই, ক্ষুদ্র তৃণগুল্মাদিতেই মাত্র তাহা আবরিত।

ডাণ্ডিওয়ালাদিগের প্রতারণা বুঝিয়া, তাহাদের উপর মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলাম।—কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাই তাহাদের চূড়ান্ত অপরাধ হইলেও বাঁচিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিতে না বাজিতে তাহারা আমাদিগকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।—বলিল, সিরপথে অন্ধকার হইয়া গেলে, বিপদ্ সম্ভাবনা। আমি ভাবিলাম,—আবার একটা প্রতারণা, কেবল এ আমাদিগকে শীঘ্র গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ফন্দী মাত্র।

কি করিয়া আমি তাহাদের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা কি করিয়া তখন আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে? আমি যে তখন সংসারানভিজ্ঞ, নিতান্ত অদূরদর্শী, ষোড়শবর্ষের বালিকামাত্র। আমি তখন অনুভব করিতেছিলাম, আমার অন্তর-বাহিরের মধুরতা, আমার মোহময়, সুখময় অস্তিত্ব। তাহার পরপার দর্শনের ক্ষমতা আমার তখন কোথায়? বর্ত্তমান সুখে মাত্র আমি তখন পূর্ণভাবে জাগ্রত,জীবন্ত, মগ্ন।

কিন্তু আমার ইচ্ছা, আমার অসন্তোষ প্রকাশের সাহস নাই। বালিকা হইলেও আমি যে বিধবা চিরদিন সুখের ইচ্ছা গোপন করিতে অভ্যস্ত। আজ সহসা এ বাসনা জানাইলে দাদা কি মনে করিবেন? আর অতিথিই বা কি মনে করিবেন? তথাপি আমি আজ মৌন থাকিতে পারিলাম না, দাদাকে আগ্রহে বলিলাম, "দাদা আর একটু বেড়ান যাক্, নিদেন আমরা একটুখানি বরঞ্চ হাঁটিয়া নামি, ঐ মাইল ষ্টোনের কাছে গিয়ে ডাণ্ডিতে উঠব।" দাদা তাহাতে হাসিয়া সম্মত হইলেন। আমরা তিনজনে হাঁটিয়া নামিতে লাগিলাম, ভৃত্যেরা আমাদের অনুবর্ত্তী হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:০:—

আমরা শতপদ নামিয়াছি কি না সন্দেহ, দেখিলাম, আমাদের বামদিকে, অদূরের একটি শৈলগাত্রে কতকগুলি ফুল ফুটিয়া আছে। আজ আমার কি হইয়াছে কে জানে! এতদিনের সযত্ন-রুদ্ধ মনোদ্বার এই মুক্ত শিখরবায়ুতে সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়া বুঝি আর স্বস্থানে পুনঃস্থাপিত হইতে চাহে না! আমি লজ্জা, সঙ্কোচ ভুলিয়া স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিলাম,—"দেখ দাদা, কি সুন্দর ফুল!"

দাদা বলিলেন,—"তাই ত! কিন্তু তুই গোলাপ খুঁজছিলি, ও ত গোলাপ নয়।" আমি বলিলাম—

"তবুও কি সুন্দর! তুলিবার যো নেই—না! যে দূরে"

ইহাতে কি কাহারও প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরোধ ব্যক্ত হইল? কে জানে। অতিথি আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "এমন কি দূরে; আমি আনিতেছি।" বলিয়া তিনি কাহারো নিষেধবাক্য স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বেই সোৎসাহে ক্ষিপ্রপদে হ্রদে নামিতে আরম্ভ করিলেন।

যে পাহাড়ে ফুল ফুটিয়াছিল, তাহা আমাদের দূরবর্ত্তী না হইলেও একটি স্বতন্ত্র শৈল। এদিক দিয়া সম্ভবতঃ কেহ সেখানে যায় না—উভয় পাহাড়ের মধ্যে কোন পদ-চিহ্নই নাই। অতএব পথ যাহা, তাহা সমস্তই বিপথ, প্রথম কিয়দংশ ঢালু পিচ্ছিল অবরোহণ, পরে দুরূহ আরোহণ এবং উভয় পাহাড়ের সন্ধিস্থলে প্রস্তর-স্তূপ পরিপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র পয়ঃ-প্রণালী। বর্ষাকালে তাহা জলপূর্ণ হইয়া থাকে, এখন উহার কোথাও স্বল্পজল, কোথাও বা একবারে শুষ্ক। তিনি এইরূপ বিপদসঙ্কুল বিপর্য্যয় পথে কখনও দ্রুত অবতরণে, কখনও সুধীর আরোহণে, কখনও বৃক্ষশাখা ধরিয়া, কখনও সাবধানে প্রস্তর-খণ্ডে পদ রক্ষা করিয়া গম্যস্থান-উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন।

প্রশান্ত প্রভাতে সহসা ঝটিকার সূচনা দেখিলে লোকে যেরূপ ত্রস্ত হইয়া উঠে, দাদা এই কাণ্ড দেখিয়া সেইরূপ বিব্রত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমিই এই অনর্থের মূল,—আমাকে তিরস্কার করিতেই ত্রুটি করিলেন না! কিন্তু ক্রোধে তিরস্কারে কিছুতেই এখন আর ত কর্ম্মফল খণ্ডিত হইবার নহে, হঠাৎ যেন এই জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়া, আমার প্রতি তাঁহার জনান্তিকে ভৎর্সনা সংহরণপূর্ব্বক, অতিথিকে প্রকাশ্য উৎসাহবাক্যে এই দুঃসাহসিক কার্য্য সমাধায় উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

আর আমি? পাঠিকা কি আমার তখনকার মনের অবস্থা কল্পনা করিতে পারেন? সত্যই আমি তাঁহার এই বিপদের কারণ। তাহা ভাবিয়া আমি কি ভয়ে অনুতাপে মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিলাম? মোটেই নহে। আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে, মুগ্ধনেত্রে তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেক গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাতে ভয় বা অনুতাপের লেশমাত্র মিশ্রিত ছিল না। যদি শাখা হইতে শাখান্তরে হস্তচালনায় সময় হস্ত স্খলিত হয়, যদি শৈল হইতে শৈলখণ্ডে পদরক্ষায় সময় পদ-চ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে বিপদ অনিবার্য্য। কিন্তু শিশু যেমন অগ্নিকে সম্মুখে দেখিয়াও তাহার দাহিকাশক্তিতে অজ্ঞান থাকে, আমিও সেইরূপ এই বিপদ প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহার সম্ভাবনা করি নাই। তাঁহার এই দুঃসাহসপূর্ণ গতিতে, বীরত্বপূর্ণ অঙ্গচালনায়, আমি কেবল তখন চৌম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া একটি পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার পৌরুষিক তেজ উদ্দীপ্ত করিতে পারিয়া জীবনে এই প্রথম আমি আমার অন্তর্নিহিত রমণী-শক্তির আস্বাদ লাভ করিলাম। তাহা কি সুমধুর! কি উপাদেয়! কি মোহময়!

তিনি যখন এই বিপদরাজ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ফুল আহরণপূর্ব্বক নিরাপদভূমিতে পদার্পণ করিলেন, তখন যেন আমার চৈতন্যোদয় হইল। সেই সম্ভাবিত বিপদ কল্পনা করিয়া তখন আমার ভয়ের সঞ্চার হইল, তাঁহাকে বিপন্মুক্ত দেখিয়া আমি রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলাম।

অতিথি আমাদিগের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই সূর্য্য দিগন্তে নামিয়া পড়িল। তাঁহাকে নিরাপদ দেখিয়াই ভ্রাতা আমাকে ডাণ্ডিতে উঠিতে আজ্ঞা করিলেন। যাহার জন্য এত কষ্ট করিয়া তিনি ফুল তুলিলেন, তখন আর তাহার হস্তে সেগুলি সমর্পণ করিবার অবসর পর্য্যন্ত ঘটিল না। তাঁহার নৈরাশ্য কল্পনা করিয়াই বোধ হয় ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া আমি নিঃশব্দে ডাণ্ডির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশীর চন্দ্র, ঠিক পূর্ণচন্দ্র বলিয়াই ভ্রম হইতেছিল। অসম্পূর্ণকলা—তবুও পূর্ণোজ্জ্বল পরম-সুন্দর শশিকলা কখনও শুভ্র, কখনও নীল, কখনও কৃষ্ণ মেঘের মধ্য দিয়া তরতর বেগে ভাসিয়ে ভাসিতে, ক্ষণে ক্ষণে দূরের ও নিকটের পর্ব্বতমালা ম্লান-মধুর সৌন্দর্য্যে প্লাবিত করিয়া, আবার ক্ষণে ক্ষণে চারিদিক্ জলদ আবরণে সহসা পর্ব্বত-আড়ালে

মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িতেছিল। ডাণ্ডিওয়ালারা যেন চন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাহার অপেক্ষাও তরতর বেগে ছুটিতে ছুটিতে আমাদের উদ্যানতলে আসিয়া ডাণ্ডি নামাইল। জ্যোৎস্না-পুলকিত সুগন্ধ-আকুলিত কাননখানি হাসিতে হাসিতে আমাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রীতিময়, সৌন্দর্য্যময় ও জীবন অস্বাভাবিক সুখময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি একবার অতৃপ্তনয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভৃত্যকে ডিনার আনিতে আদেশ করিয়া, অসমাপ্ত গৃহকার্য্য যথাশীঘ্র সমাপ্ত করিয়া ড্রয়িংরুমে আগমন করিলাম। অতিথিও প্রায় তখনি এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তে সেই ফুলগুচ্ছ, নয়নে বীরগর্ব্ব, অধরে আনন্দ-হাস্য। তাঁহাকে কি সুন্দর, কি সাহসী, কি সুখী দেখাইতেছিল! মানুষ যে এত সুন্দর হইতে পারে, দেব-কল্পনা ছাড়াইয়াও ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহা ইহার আগে জানিতাম না! কেহ বলিলে বিশ্বাসও করিতাম না!

তিনি নিকটে আসিয়া হস্তে ধৃত ফুলগুলি আমার দিকে বাড়াইয়া বলিলেন, "এই নিন্ আপনার ফুল। ইহা কিন্তু গোলাপ নহে, অমর গুচ্ছ।"

ফুলগুলি গ্রহণ করিলাম, নীরবে গ্রহণ করিলাম। একটিও কথা ফুটিল না, আমার জন্য এত কষ্ট করিয়া তিনি ফুল তুলিয়াছেন, একটা মৌখিক ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিতে পারিলাম না। কম্পিতদেহে সজলদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ফুলগুলি গ্রহণ করিলাম। এই প্রথমবার তাঁহার দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি পূর্ণভাবে স্থাপিত হইল, হস্তে হস্তে স্পর্শ হইল, শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক পুলক-প্রবাহ উথলিত হইয়া উঠিল, বায়ুমণ্ডলী কি এক মোহময় ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; তাহার মধ্যে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িয়া বহির্জগতের সহিত আমি যেন সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম।

সহসা সে মোহ—সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ডিনারের ঘণ্টার শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলাম। দাদাও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অতিথির সাহসের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার হাত আপনার বাহুমধ্যে টানিয়া লইয়া ভোজনগৃহে যাত্রা করিলেন। আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। এখানে আসিয়া তাঁহারা খাইতে বসিলেন, আমি বিধবা, তাঁহাদের সহিত একত্রে খাই না; বসিয়া তাঁহাদের আহার দেখিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ সমস্ত দিনের আনন্দভাব কেমন করিয়া কে জানে ধীরে ধীরে অর্দ্ধ-বিষাদভাবে পরিণত হইয়া পড়িল। অতিথিকে যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর মনে হইতে লাগিল। দাদা নানা কথা কহিয়া সে ভাব দূর করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন, কিন্তু অতিথি অন্যদিনের ন্যায় পূর্ণহৃদয়ে তাহাতে যোগদান না করিয়া সংক্ষেপ-উত্তরে মাত্র তাঁহার কথায় সায় দিয়া যাইতেছিলেন। আহারান্তে অধিকক্ষণ তিনি ড্রয়িংরুমে বসিলেন না, জিনিষপত্র গুছাইতে হইবে বলিয়া শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করিলেন। দাদা তাঁহার সঙ্গে গেলেন। আমরা সেক্‌হ্যাণ্ড করিতাম না; যাইবার সময় অন্যদিনের ন্যায় হাসিয়া তিনি আমাকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর একটু থামিয়া Good bye বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সেই হাসির মধ্যে, দৃষ্টির মধ্যে, বিদায়-বাক্যের মধ্যে, এমন কি গমনের মধ্যেও যেন প্রচ্ছন্ন বিষাদ-ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহা কি সত্যই তাঁহার মনের ভাব? না আমার নিজের মনের ছায়ামাত্র! পরদিন প্রত্যূষে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে আমি যখন নিজকক্ষে প্রবেশ করিলাম, তখন আত্মদমন অসাধ্য হইয়া উঠিল। হৃদয় যন্ত্রণায় শতধা বিদীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। বন্যার ধারায় অশ্রু উথলিয়া উঠিতে লাগিল। এতদিন সুখোচ্ছ্বাসে যাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, দুঃখের সময় আবার তাঁহাকে মনে পড়িল। এতদিন পরে পুনরায় আমার চন্দন-বাক্সের সেই ছবিখানি বাহির করিয়া, মেরি-মূর্ত্তির পদতলে অনুতপ্ত রোমানক্যাথলিকের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া আমার মনের পাপ-বেদনা উদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

সেই অনুতাপ-অশ্রুতে কি হৃদয়জ্বালা নিবৃত্তি হইয়া গেল? সেই আন্তরিক প্রার্থনায় কি তখনি আমি অসীম যন্ত্রণা হইতে শান্তিলাভ করিলাম? হায়, কতকাল বাড়িয়া তবে বৃক্ষ ফললাভ করে! কতকাল চলিয়া তবে নদী সমুদ্রে মিলিত হয়! আর মানুষের বাসনাই কি মুহূর্ত্তে সফল হইবে? তাহার প্রার্থনাই কি ভগবান্ তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিবেন?

তপস্যা বিফল হইবার নহে, ভগবৎপ্রসাদ মিথ্যা নহে; কিন্তু সকল সফলতার মূলেই ধৈর্য্য, আত্মদমন ও কালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। আমি ছবিখানি পুনরায় বাক্সে তুলিবার সময় অনুতপ্ত হৃদয়ের উপহারস্বরূপ ফুলগুলিও সেই পুণ্যমন্দিরে রাখিয়া দিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আবার যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি একা নহেন। দাদার বিবাহ উপলক্ষে আমরা বাটী যাত্রা করিতেছিলাম, তিনি তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া এলাহাবাদ যাইতেছিলেন—বাঁকিপুর ষ্টেসনে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা। তখনও ট্রেণ ছাড়িতে কিছু বিলম্ব ছিল, তাঁহারা ততক্ষণ আমাদের গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। দাদা তাঁহাকে বিবাহিত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে, বিবাহের নিমন্ত্রণ পান নাই বলিয়া, সকৌতুক অভিযোগ-বাক্যে কহিলেন, "চিরদিন থেকে এই ভোজটার দিকে হা-প্রত্যাশ ক'রে চেয়ে আছি—আর শেষে কি না ছোক্‌রা বন্ধুবান্ধবের একেবারেই ফাঁকি দিয়ে—একা একাই মেঠাইগুলো পার করলে হে। আপনিই বিচার করুন দেখি, মিসেস্ চাটার্জ্জি—এ কি রকম ভয়ঙ্কর ফাঁকি,—এর শাস্তি আপনি কি ব্যবস্থা করেন?"

মিসেস্ চাটার্জ্জি, নববধূ—নববিবাহের আনন্দ তাহার সুসজ্জিত পরিচ্ছদ হইতে, মুখে চোখে ভাবভঙ্গিতে পরিব্যাপ্ত। তিনি মধুর হাসি হাসিয়া স্বামীর দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া দাদার দিকে চাহিয়া, মৃদু প্রফুল্লস্বরে বলিলেন, "তা হ'লে আমিও বলি আপনি একলা ফাঁকে পড়েন নি, আপনার বন্ধুটি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ না ক'রে, আমাকেই বেশী রকম ফাঁকি দিয়েছেন। যা কিছু যৌতুক পাওয়া যেত, তা' থেকে একেবারেই বঞ্চিত করেছেন!

দাদা তাঁহার বন্ধুর এই অপরাধ—নিতান্তই অমার্জ্জনীয় জ্ঞান করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে ছয় মাস ফাঁসিতে দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বিচারকের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া ফেলিলেন। সকলের হাস্য-কৌতুক থামিলে আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মিসেস্ চাটার্জ্জি, আমি আপনার জন্য একটি যৌতুক রেখেছি।"

আমার খেলার বাক্সটি আমার কাছেই ছিল, মিসেস্ চাটার্জ্জির সহিত কথা কহিতে কহিতে তন্মধ্য হইতেই আমার চন্দন-বাক্সটি লইয়া, অমর ফুলগুলি বাহির করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি সেগুলি হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন,—"কি চমৎকার অনুকরণ! ঠিক যেন আসল ফুল!"

আমি বলিলাম, "সত্যই আসল ফুল!"

"আসল ফুল! আমি ত কখনও এরূপ ফুল দেখি নাই। ইহার নাম কি?"

"অমর পুষ্প!"

"বেশ ত নামটি,—যেমন ফুল তেমনি নাম! কোথায় পাওয়া যায়?"

"ইহা পর্ব্বতের ফুল, পর্ব্বত-ভূমিতে পাওয়া যায়।"

"কত দিন তুলিয়াছেন?"

"প্রায় ছয়মাস।"

"এখনো এমন ভাল আছে, আশ্চর্য্য ত! দেখুন মহাশয়, এমন সুন্দর ফুল কখনও দেখিয়াছেন কি? পরুন না!" স্বামীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া পত্নী এই কথাগুলি বলিলেন। স্বামী চকিত নেত্রে ফুলগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে একবার বলিলেন, "হাঁ বেশ!" কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষার জন্য তাহা গ্রহণে অগ্রসর হইলেন না! স্ত্রী বড় আগ্রহে স্বামীকে তাহা দিতে গিয়াছিলেন, স্বামীর ব্যবহারে নিরুৎসাহ ক্ষুণ্ণ হইয়া অভিমান ভরে বলিলেন—"আচ্ছা বাবু থাক্—পরতে হবে না—আমি না হয়"—তাঁহার কথা অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। সহসা প্রকাণ্ড শব্দে ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তিনি চকিতে নীরব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্বামী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "চল চল, আর সময় নেই, ও-সব হবে এখন।" ত্বরিত বিদায় গ্রহণে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন; একবার, দুইবার, তিনবার বাজিয়া ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গেল, গাড়ীও পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

সে রাত্রে আমি একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখিলাম। —মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনী। চারিদিকের কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই ঘন ঘোর নিবিড় গহনের মধ্যে এক জন দেবপুরুষ আসিয়া আমাকে তুলিয়া শূন্যমার্গে উঠিলেন; আমরা উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে, ব্যোম হইতে ব্যোমে ভাসিয়া চলিলাম। ভাসিতে ভাসিতে একটি অত্যুচ্চ শৈল শিখরে আসিয়া তিনি যখন আমাকে নামাইয়া দিলেন, তখন মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকে তিমির আবরণ অপসৃত হইয়া গেল; দিগ্‌দিগন্ত বিভাসিত এক অপূর্ব্ব আলোকে সেই দেবপুরুষ আমার নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিলেন। এ কি ইনি কে? ইনি যে আমার স্বামী-দেবতা! আমার সেই যত্নরক্ষিত ছবিখানির যে ইনি সাকার প্রতিরূপ! কেন তবে ইহাকে এতদিন মৃত মনে করিয়াছি! ইঁহার জীবন্তমূর্ত্তি যে আজি আমার নয়নে প্রত্যক্ষ বিরাজিত, ইঁহার বরবপু স্পর্শে যে আমি আমার সমস্ত ভ্রান্তি দূর করিতেছে! এতদিন তবে আমি বৃথা কষ্ট করিয়াছি কেন? অতিরিক্ত সুখোচ্ছ্বাসে আমি বিহ্বল হইয়া উঠিলাম, অমনি সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।—জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, অশ্রুধারায় নয়ন ভাসিয়া যাইতেছে। ইহা সুখাশ্রু বা দুঃখাশ্রু, কে বলিবে?

বিবিধ কথা

প্রেম

[১]

আমরা কাহাকেও যখন ভালবাসি; তখনি যে আমাদের ভালবাসার উদয়, তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে ভালবাসিবার বহু পূর্ব্বেই আমরা ভালবাসি কথাটা শুনিতে কিছু অদ্ভুত, কিন্তু তাই বলিয়া অমূলক নয়। ভালবাসিবার আগে ভালবাসার প্রসর অসীম। কোন বস্তুর কাঠাম নির্ম্মিত হইলেই তাহার ছায়াময় অনন্ত পরিসর চলিয়া যায়, তাহা সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে,—সুতরাং ব্যক্তিবিশেষকে ভাল আসিলে ভালবাসার আয়তন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ইহারই পরিচয় প্রদান করে। তাহার পূর্ব্বে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের প্রত্যেক সুদৃশ্য শোভা, প্রত্যেক সঙ্গীত সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রসারিত কল্পনা তরঙ্গ। লতা-পাতা গাছ, ফুল, সূর্য্য, চন্দ্র সকলেই তখন তাহার অনন্ত আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য প্রেমরূপ বিকাশ। বিশ্বের আকাশ তখন তাহার যৌবনস্বপ্নে পরিব্যাপ্ত, সুতরাং স্বপ্নই তখন তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব। স্বপ্নজগতের এই কাল্পনিক মূর্ত্তি তখন আমরা জাগ্রতজীবনে ধরিতে পারি না—তাহারা গোলাপ নহে, রং মাত্র; তাহারা দীপ নহে, শুধু আলোক মাত্র; তাহারা মূর্ত্তি নহে, কেবল ভাবমাত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহাই জীবনের চরম সুখের অবস্থা।

[২]

কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? পরিণতি ভিন্ন সংযতি ভিন্ন প্রকৃত সুখ সম্ভবে না। যখন আমরা ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসি, তখনই আমাদের ভাল-বাসার কেন্দ্র গঠিত হয়, তখনই আমাদের বিশৃঙ্খল অসংযত ছায়াময় ভালবাসা জমাট বাঁধিয়া তাহা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিময় সজ্ঞান পরিস্ফুটাকারে উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্ম্মণ্য হইয়া জগতের কার্য্য সাধিত করে। তখন প্রেমের আকার ক্ষুদ্র হইয়া যায় বটে, তাহার আকাঙ্ক্ষা সংযত হইয়া আসে বটে, কিন্তু তাহার জ্যোতিঃ আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং একজনকে ভালবাসিলে আমরা জগৎকে ভুলিয়া যাই না, বরঞ্চ কেন্দ্রাবলম্বী সংযত প্রেমে জগৎকে পর্য্যন্ত অতিরিক্ত মাত্রায় জ্যোতির্দানে সমর্থ হই। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, যেমন বাষ্পাবস্থা হইতে জমাট সৌরজগৎ এবং তাহা হইতে আবার বাষ্পপ্রবণতা, সেইরূপ আমাদের ভালবাসাও ছায়াময় হইতে মূর্ত্তি-মান্ এবং মূর্ত্তিমান্ হইতে আবার বিশ্বব্যাপী। ইহাতেই ভালবাসার মহত্ত্ব। তবে কেন্দ্রাবলম্বনস্বরূপ না হইয়া সীমার মধ্যেই যে ভালবাসার পর্য্যবসান, সে ভালবাসা নিজের পাশেই নিজে আবদ্ধ। বদ্ধ নদীর ন্যায় তাহা নিজের পক্ষে এবং জগতের পক্ষে সমান অপকারক—তাহাতে কাহারও সুখ নাই, সুতরাং মঙ্গল নাই।

[৩]

ভালবাসা অর্থাৎ ভাল বাসনা করা। আমাদের প্রিয়জনের আমরা মঙ্গল বাসনা করি—তাই আমরা বলি ভালবাসি। কিন্তু মূলে কথাটা যাহা হইতেই আসুক, এখন ভালবাসা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা উহার উপর আরও কিছু! আমি অনেকেরই ভাল ইচ্ছা করিতে পারি—সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হইতে পারি; কিন্তু ভালবাসিতে পারি এক-জনকে মাত্র, সুতরাং সহানুভূতি কিংবা শুভকামনা করাই ভালবাসা নয়, এ সকল ভালবাসা হইতে অনেক কম। সৌন্দর্য্যের প্রতি যে আমাদের এত আকর্ষণ, তাহার অর্থ—আমরা সৌন্দর্য্য পাইতে চাই—তাহার সহিত মিলিত হইয়া নিজে সুন্দর হইতে চাই। সুতরাং যাহা ভালবাসা সহানুভূতি

নহে। ভালবাসাতে এ সকলি আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান! এইখানেই ভালবাসার সহানুভূতির মর্ম্মগত প্রভেদ। মিলনের স্পৃহা যেখানে যত অধিক, সেখানে ভালবাসাও তত গভীর। লোকে বলিবে, সে ভালবাসা তত স্বার্থপর মলিন। তাহা নহে, আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসিয়া তাঁহাকেও পাইতে চাই। সুতরাং প্রেমের মলিনতা আকাঙ্ক্ষায় নহে—নিষ্কাম প্রেমই আদর্শ প্রেম নহে—সেই প্রেমই স্বার্থপর, যাহাতে আত্মত্যাগ নাই। মিলন আকাঙ্ক্ষা ভালবাসার একটি অবশ্যম্ভাবী উপাদান মাত্র।

(৪)

কিন্তু ভালবাসিয়া আমরা যে পাইতে চাই—কি পাইতে চাই? তাহা আমরা নিজেই ঠিক জানি না। আমরা বলি, প্রতিদান চাই—হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় চাই—তাহার অর্থ কি? তাহার অর্থ কিছু নাই—বাস্তবিক কে কাহাকে পাইতে পারে? এ কেবল অপূর্ণ মানবের অদৃশ্য অগোচর কল্পনাময় পরিপূর্ণতার জন্য আকাঙ্ক্ষা।—Phedesire of the moth forth star. সে আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ পূর্ণ হইবার আমাদের কখনও আশা-ভরসা নাই, তাহার অস্পষ্ট ছায়াময় ছবি ধরিবার জন্যই আমরা ব্যগ্র। ভালবাসার সঙ্গে, সন্ধ্যার সঙ্গে, জ্যোৎস্নার সঙ্গে আমরা যে সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তাহার কারণ, ইহাদের সৌন্দর্য্য ছায়াময়, ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার মত ইহাদের ধরা-ছুঁয়া যায় না। যে কবিতা, যে কল্পনা যত অপার্থিব, তাহাই তত এইরূপ ছায়াময় আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপক।

যোগিঋষিগণ বলিলেন, আকাঙ্ক্ষামাত্রেই দুঃখদায়ক, অতএব ভালবাসা ত্যাগ কর, অথবা নিষ্কামভাবে ভালবাস, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাতে সুখের অংশ—আনন্দের অংশ এত অধিক যে, ইহার সংমিশ্রণে দুঃখও নিতান্ত কোমল, সহনীয়, উপভোগ্য ভাব ধারণ করে।—এক জন কবি তাই কহিয়াছেন—

A feeling of sadness and longing
That is not akin to pain—
And resembles sorrow only
As the mist resembles rain.

(৫)

লোকে ভালবাসে—বাসিয়া ভাবে, তাহার ভালবাসার ব্যক্তিকে কিনিয়া রাখিতেছে। কি নির্ব্বোধ! তুমি ভালবাসিতেছ বলিয়াই যে তাহার তোমাকে ভালবাসিতে হইবে, এমন কি কথা! তুমি ভালবাস, অতএব তোমার কষ্টের জন্য সে দায়ী, এ কোন্ দেশী যুক্তি? তুমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছ, সেই জন্যই সে তোমার প্রতি হাসিয়া চাহিবে, এ কিরূপ প্রত্যাশা? তুমি আদর চাহ, সে আদর করে না, অতএব সে নিষ্ঠুর। তুমি আদর করিতে যাও, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্রোধদৃষ্টিতে চাহে, তুমি অপমানিত হইয়া ভাব, সে tyrent; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, tyrant কে? তুমি ভালবাস বলিয়াই ভালবাসা চাহ, ইহা হইতে tyranny কোথায়? যদি ভাল চাও, এ কুবুদ্ধি ত্যাগ কর। যদি প্রত্যাশাহীন হইয়া হাসিমুখে ভালবাসিতে পার ত বাস—কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, নহিলে সরিয়া পড় মর, যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু এই উপদেশটি মনে রাখিও, আপনাকে কাহারও উপর নিক্ষেপ করিও না।

অভাব

(১)

ভাব কোথা? অভাবে।

মিলনের অভাব বিরহ,—বিরহে যতখানি প্রেমের ভাব, এমন কি মিলনে? যে মিলন বিরহ ছাড়া নয় অর্থাৎ মিলনকালেও যেখানে বিরহের অনুভাব, সেইখানেই মিলনের যথার্থ তৃপ্তি। বাস্তবিক পক্ষে এ তৃপ্তি মিলনের নহে, যত বিরহের। তাই ভাবুক কবি গাহিয়াছেন—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে
বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ;
সঙ্গে সৈব যদেকা
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।

তাই চণ্ডিদাস বলিয়াছেন—

রজনী দিবসে, হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।

একত্র থাকিব অথচ তাহাকে স্পর্শ করিব না। কি মধুর! কি সুন্দর! কি পবিত্র! বাহিরের মিলনের অভাবে অন্তরের মিলন, কবি ইহা বুঝেন।

যে কবিতায় হৃদয় যত অভাবের ভাবে পূর্ণ করে, সেই কবিতা তত ভাবময়, তত শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ একটি কবিতাই পড়িয়া যাহা পড়ি নাই, এমন শত শত ভাবে যখন হৃদয় ভরিয়া উঠে, তাহার সেই দৃশ্যত অভাবের সহিত অদৃশ্য ভাবের বন্ধনে হৃদয় এক হইয়া যায়, তখনই কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি হয়, নহিলে যে কবিতায় সেই কবিতাটুকু মাত্র পড়ি, তাহা হইতে আর কোন অভাব হৃদয়ে জাগে না,—তখন সেই অভাবের অভাবে কবিত্বেরই অভাব দেখা যায়।

তাই বলিতেছি, বৈষম্যের মধ্যে যেমন সাম্যের, স্বপ্নের মধ্যে যেমন সত্যের অধিষ্ঠান, তেমনি অভাবের মধ্যেই ভাব বিরাজমান!

(২)

স্বপ্নের মধ্যেই সত্য, এ বড় বিষম কথা। হইলে কি হয়, কথাটি সত্য। সত্য স্বপ্ন-জগতের ধন, যাহাকে আমরা সত্য-জগৎ বলি, তাহার সহিত সত্যের বড় কমই সম্পর্ক। আমরা সত্য-জগৎ বলি কাহাকে? ইন্দ্রিয়-জগৎকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি, তাহাই আমাদের নিকট সত্য-জগৎ। সংসারই আমাদের নিকট সত্য। কিন্তু সংসার সত্য কোথায়? সংসারে পুণ্যের নামে পাপ, মঙ্গলের নামে অমঙ্গলেরই আধিপত্য, সংসার মিথ্যাতেই জর-জর। সংসারে সত্য কেবল স্বপ্নরাজ্যের কল্পনায়। যদি সত্য দেখিতে চাও, তোমাদের সত্যরাজ্য ছাড়িয়া সংসারাতীত ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্নরাজ্যে সত্য অনুসন্ধান কর।

(৩)

অসুখ কাহাকে বলে? অর্থাৎ অভাব। শারীরিক অসুখ শরীরের স্বাস্থ্যের অভাব। মনের অসুখ আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্তিজনিত অভাব। অনেক সময় মনে হয়, এ অভাব, এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইত—যদি কেবল অন্যের অনুগ্রহ পাওয়া যাইত। হায়, ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া জীবন-রক্ষা করিতে যাওয়া! তার চেয়ে মরণ ভাল, এটা কেন লোকে ভাবে না!

জানালায় দিকে চাহিয়া পড়িয়া আছি। দেখিতেছি, গাছপালা আকাশের দিকে চাহিয়া ঊর্দ্ধমুখে মিলনাকাঙ্ক্ষা করিতেছে। সে জানে না যে, আকাশ তাহারই মধ্যে ব্যাপ্ত! না বুঝিয়া তরুলতা কেবল ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে পিপাসিত নেত্রে চাহিয়া আছে। আমরাও ঐরূপ করি। কেবল হাহাকার! কি যে চাই, বুঝি—বুঝি না? মমতা, করুণা সহানুভূতি, প্রেম কি আকৃতিময় বস্তু যে, তাহাকে ধরিতে চাওয়া? সে ত সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত; তবে কেন? শুধু কটাক্ষের জন্য, শুধু কথার জন্য, শুধু ভাষার জন্য, শুধু প্রকাশিত ভাবের জন্য ব্যাকুলতা।

(৪)

সূর্য্যমুখী সকল ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ফুটে, তাহার পর সমস্ত দিন সূর্য্যের আশায় থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা হতাশাস-ভাবে নিম্নমুখী হইয়া ঝরিয়া পড়ে। কতকগুলো মানুষ তেমনই জগতে আছে, যাহারা সারা জীবন যে মুখ-দর্শন প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, সে মুখ আর তাহার দিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফেরে না। কিন্তু গোলাপ, যুঁই প্রভৃতির মত কতকগুলি ফুল আছে, যাহাদের সকলেই আদর করিয়া বুকে পরে। ইহাই সংসারের নিয়ম। তবে সূর্য্যমুখী কাঁদিয়া মরে কেন? সহস্র ক্রন্দনেও সে ত আর গোলাপ হইয়া ফুটিবে না? সূর্য্যমুখী সে চিরদিন সূর্য্যমুখীই থাকিবে।

নৈরাশ্য

(১)

পৃথিবী একটা নীরব দুঃখ-নাট্য। মনুষ্যের প্রত্যেক বাসনা, অনুভূতি, প্রত্যেক হৃৎকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে যে দুঃখাভিনয় হইতেছে, ইহা জানাও যা, অঙ্কুর উদ্গমের শব্দ শোনাও তা। যদি আমরা অন্যের দুঃখ নিজের মত করিয়া অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা হইলে পৃথিবী হয় স্বর্গ, নয় নরক হইয়া উঠিত।

(২)

আমাদের জীবন তৃতীয় খণ্ড উপন্যাসের মধ্যভাগ; গোড়া নাই, আগা নাই, মাঝের খানিকটা; আর ভূতভবিষ্যৎ সমস্তই কল্পনা। এই অবোধ-গম্য রহস্যের মধ্যে একটা বিস্ময় ঔৎসুক্য আছে, তাহাতেই জীবনের জীবনত্ব; যখনই সে ঔৎসুক্য দূর হইবে, তখনই আমাদের সুখ-দুঃখের অবসান—

তখনই নির্ব্বাণ। সুতরাং পূর্ণ জ্ঞান সৃষ্টিতে নাই, স্রষ্টারই তাহা একমাত্র উপাদান।

(৩)

যদি আমরা আমাদের কাতর আর্ত্তনাদের সময় চারিদিক্ প্রফুল্ল দেখি,— তাহা হইলে তখন আমাদের হৃদয় আরও শুষ্ক হইয়া যায়, সে প্রফুল্লতা কেবল মরুর প্রজ্বলন্ত হাসি বলিয়া মনে হয়, আমরা তখন মৃত্যুকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া তাহারই ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সংসার wnsympatric নয়,সংসারে ক্রন্দন বৃথা যায় না,তবে মিথ্যার ভ্রমে পড়িয়া যাহারা কাঁদে—যেমন শিশুর চাঁদের জন্য ক্রন্দন—তাহারই অদৃষ্টে সহানুভূতি নাই। কিন্তু বাসনা মিথ্যা হইলেও কষ্ট মিথ্যা নহে। শিশু যদি তাহার অকারণ কষ্টের মাতার স্নেহসান্ত্বনা না পায়, তাহা হইলে কাঁদিয়া তাহার জীবন শেষ হইতে পারে। আর আমরা ত জীবনে প্রতিদিনই দেখিতেছি, সহানুভূতি অভাবে মানুষ নিঃশব্দে জীবন ত্যাগ করিতেছে। তবে কি করিয়া বল, সংসারে ক্রন্দন বৃথা যায় না।

স্থির নিরাশা ভাল, না সন্দেহ ভাল ? সন্দেহে আশা আছে,কিন্তু নিরাশা আশাহীন—তবুও নিরাশা ভাল, কেন না, সন্দেহে যে আশা আছে, তাহা নিরাশা হইতে ভয়ানক। জর্জ্জ এলিয়টের কথায়— What we often call despair is nothing but the strained eagerness of unfed hope, এই ক্ষুধার্ত্ত আশা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে তফাৎ এই যে, একটা কষ্টের মধ্যে মুক্তি, অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য অদৃষ্টের প্রতি নির্ভরবল ; আর একটা কুলকিনারাহীন যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ। লোকে যখন খেলায় যথাসর্ব্বস্ব পণ করে, তখন হৃৎকম্পমান অবস্থায় যেমন হারজিতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, বাজি হারিয়া গেলে তাহা হইতে অনেক প্রশান্ত হইয়া আসে। আমরা জীবনের অধিকাংশ সময়েই জুয়া খেলিতেছি - সময়ে সময়ে সামান্য জিনিসের জন্য আমাদের সমস্ত সুখ-শান্তি, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব পণ রাখিতেছি, কিন্তু হাত উঠাইয়া গেলে যখন দেখি, আমরা সর্ব্বস্বান্ত, তখন রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। যাহারা হারিবে জানিয়াও সমস্ত পণ করে, তাহারা পাগল, কিন্তু এরূপ পাগলের সংখ্যা পৃথিবীতে অল্প নহে, অন্ততঃ অর্দ্ধেক—নারীজাতি।

[৫]

সবাই মুখে বলে বটে, প্রাণের মত মূল্যবান্ বস্তু আর কিছু নাই, অথচ প্রাণটাই লোকে যেমন কথায় কথায় অন্যকে দিয়া ফেলে, এমন অন্য কিছু ত দিতে দেখি না। আমার এক জন বন্ধুর নিকট চাঁদা চাহায় তিনি বেশ উত্তর দিয়াছিলেন,—"টাকা ত আর প্রাণ নয় যে, চাহিবামাত্র দিয়া ফেলিব।" ঠিক কথা! মৃত্যু লোকে যেমন কঠিন ভাবে, আসলে তেমন নয় আমরা বাঁচিয়া থাকি কেবল মরিবার আশায়।

[৬]

আঃ, কি প্রশান্তি! মৃত-মুখ কি প্রশান্ত! সংসারে প্রার্থনা করার কিছুই নাই, আদরণীয় কিছুই নাই। কেবল মৃত্যু। মুহূর্ত্তে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান। আচ্ছা, জ্বালা-যন্ত্রণা ? সংসারে কি আনন্দ নাই ? আছে মৃত্যুতে। সেই আনন্দের ছায়া মাত্র জীবনে অনুভব করা যায়। যদি অত আনন্দ সম্মুখে, যদি অত প্রশান্তি সম্মুখে, তাহা হইলে কষ্টই বা কেন ? এ সমস্ত দুদিনের জন্য, তাহার পর চিরনির্ব্বাণ! দুদিনের জন্য কেন হিংসা-দ্বেষ, কেন মানাভিমান, কেন অহঙ্কার, কেন বাসনা-কামনা ? প্রশান্তি আনন্দ—পূর্ণানন্দ আমাদের সম্মুখে বিরাজিত! সমস্ত ভুলিয়া কেবল মৃত্যুর প্রশান্ত মূর্ত্তি ধ্যান কর!

কাজ

[১]

ছোট নহিলে বড় হয় না, ছোট আগে, বড় পিছে। তিল হইতে তাল হয়, কিন্তু একেবারে তালটা হইয়া উঠিবার খুব কমই সম্ভাবনা।

তবে ছোট কাজের, অল্প কাজের এত আদর কেন ? যাহারা এতটুকু কাজ করিতেছে, তাহারাও কাজ করিতেছে, আর যিনি প্রকাণ্ড একটা কাজ করিবার আশায় চুপ করিয়া বসিয়া ঐ ছোট কাজগুলির দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঁকড়িয়া হাসিতেছেন, আর বলিতেছেন, "ভারী ত কাজ"—তাঁহার কাজ হইবার ত কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

পাখীরা যখন বাসা করে, এক একটি ক্ষুদ্র কুটা বহন করিয়া আনে, কুটা কুড়াইতে যাহার লজ্জা, সে কি কোন জন্মে বাসা বানাইতে পারে? তাই বলিতেছি, ছোট কাজ বলিয়া উপেক্ষা করিও না, মহৎ উদ্দেশ্য চোখের সাম্‌নে ধরিয়া ছোট হইতে আরম্ভ কর, বড় আপনা হইতে হইবে - না হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।

"সিদ্ধি নহে মানুষের আজ্ঞার অধীন,
বিফল হ'তেই পারে হৃদয় যতন,
তা ব'লে মানুষ কি গো হবে লক্ষ্যহীন?
শুধুই কি স্বপনেতে কাটাবে জীবন!
উদ্দেশ্যে দোষিব কি গো সিদ্ধির শিখরে
উঠিবারে আমি আজ বিফল বলিয়া?
পর্ব্বতের পদতলে থাকি যদি ম'রে,
অন্যে ত উঠিতে পারে উপরে চড়িয়া!"

[২]

যেখানে কম কাজ, সেইখানেই বৃথা গর্ব্ব। কিন্তু আমাদের দেখিতেছি উল্টা। আমাদের যেমন লম্বা-চৌড়া গর্ব্ব—তেমনই লম্বা-চৌড়া কাজ। ছোট কাজের ভার আমরা বহিতে পারি না, বড় কাজের বেলুনের মধ্যে চড়িয়া সর্ব্বদা আপনাকে উড়াইয়া লইয়া চলি। আমরা নিজের কুসংস্কার দূর করিতে চাহি না, পরের কুসংস্কারের প্রতি সদাই দৃষ্টি রাখি, ঘরের অজ্ঞানতা দূর করিতে আমাদের আদপে প্রয়াস নাই, পরের অজ্ঞান-তিমির দূর করিতে আমরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত! তাই কাজের ভিড় আমাদের বড় বেশী। একটি গল্প আছে,—একজনের বাগানের একটি গছে অত্যন্ত মুকুল ধরিত, কিন্তু ফল কিছুই হইত না, ইহা দেখিয়া তাহার বন্ধু পরামর্শ দিলেন, গাছটির কতকগুলি শাখা কাটিয়া ফেল, মুকুল কম ধরিবে—কিন্তু সেই মুকুলে ফল ফলিবে। তাহাই হইল। আমাদেরও কাজ বড় বেশী রকম ফলাও হইয়া পড়িয়াছে—কিছু কমান আবশ্যক।

[৩]

একজন ধোবার একটি গাধা ছিল। নদীর কিনারায় একখানি জেলে-নৌকা ছিল, গাধা নদীতে জল খাইবার জন্য নৌকাখানিতে যেমন লাফাইয়া পড়িল—নৌকাখানি অমনই ভাসিয়া গেল। এইরূপ নৌকা ও গাধা উভয়ে মিলিয়া-মিশিয়া ত গঙ্গাযাত্রা করিলেন, এদিকে ধোবা ও জেলে উভয়ে বিবাদ আরম্ভ করিল। ধোবা বলিল, "তোর দোষে আমার গাধা গেল, তুই কেন নৌকা অমন আলগা করিয়া বাঁধিয়াছিলি?"

জেলে বলিল,—"তোর দোষে আমার নৌকা গেল, তোর গাধা আমার নৌকায় না চড়িলে ত আর আমার নৌকা যাইত না।"

এখন দোষ কার? দোষ যাহারই হোক—প্রত্যেকেই যদি আপনার দোষ বুঝিয়া ভবিষ্যতে তাহা হইতে সাবধান হইতে চেষ্টা করে,—তাহা হইলে কাজ অনেক সোজা হইয়া আসে, কাজের বোঝাও হালকা হইয়া পড়ে। কিন্তু উল্লিখিত ধোবা ও জেলের মত আমরা কেহ নিজের দোষ দেখি না, কেবল পরস্পরকে দোষারোপ করি মাত্র, তাই আমাদের কাজের কিছু অভাব নাই, কিন্তু কাজও কিছু হয় না।

[৪]

গ্রিন ডাউয়ার। আমি বলিতেছি—গভীর সমুদ্রের ভূত আমি ডাকিতে পারি।

হটস্পার। কে না পারে, আমিও পারি, প্রত্যেক মানুষেই পারে। কিন্তু তুমি ডাকিলে তাহারা কি আসিবে?

গ্রিন ডাউয়ার! আমি বলিতেছি--ভূতকে কি করিয়া আজ্ঞা করিতে হয়, আমি তাহা তোমাকে শিখাইতে পারি।

হটস্পার। আর সত্য কথা বলিয়া কিরূপে ভূত তাড়াইতে হয়, আমি তাহা তোমাকে শিখাইতে পারি। সত্য কথা বলিলেই ভূত লজ্জায় পলাইবে। যদি ভূতকে জাগাইতে তোমার ক্ষমতা থাকে—তাহাকে এখানে আন—আমিও শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি তাহাকে লজ্জা দিয়া এখান হইতে তাড়াইব। যতদিন বাঁচিয়া থাক, সত্য কথা বল, আর ভূতকে লজ্জা দাও।

[আমরাও গ্রিন ডাউওয়ারের মত অবিরত বৃথা গর্ব্ব দ্বারা ভূত ডাকিতেছি, কিন্তু তফাৎ এই, কেহ সত্য কথা বলিলে আমরা ভূত ছাড়া হই না। আমাদের ভূতের লজ্জা নাই।

[৫]

জীবনের বাকী কখনো পূরে না। বাকীতেই জীবন। মুহূর্ত্তের বাকী পূরাইতে দিবস, দিবসের বাকী পূরাইতে মাস, মাসের বাকী পূরাইতে বৎসর চলিয়া যায়। এই ক্ষুদ্র বাকীর স্থলে কেবল অন... বাকী জমা হইতে থাকে। জীবনের বাকী পূরাইতে শেষে জীবনটাই বাকী পড়িয়া যায়। সেই ভাগ্যবান্, যাহার জীবনের মুহূর্ত্তও বাকী পড়ে নাই।

[৬]

সেণ্ট ফিলিপ নেরি রোমের রাস্তায় এক জন যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে বিনয়ী যুবক, আমাকে বল, তুমি কেন রোমে আসিয়াছ?"

যুবক। মহাশয়, আমি পণ্ডিত হইতে আসিয়াছি।

ফিলিপ। যখন তুমি পণ্ডিত হইবে, তখন তুমি কি করিবে?

যুবক। আমি এক জন পাদরী হইতে ইচ্ছা করি।

ফিলিপ। মনে কর, তুমি হইলে, তার পর?

যুবক। তার পর আমি উচ্চ কানন হইতে পারি।

ফিলিপ। আচ্ছা, তাহাই যেন হইলে, তার পর?

যুবক। তার পর? আমি একজন বিসপও হইতে পারি।

ফিলিপ। আচ্ছা, তাহাই হউক, তার পর?

যুবক। কার্ডিনেল তাহা অপেক্ষাও উচ্চ পদ—ওরূপ সৌভাগ্যও আমার হইতে পারে।

ফিলিপ। অনুমান কর, তাহাই হইল, তার পর।

যুবক। কে বলিতে পারে—আমি এক জন পোপই বা কেন না হইব?

ফিলিপ। বেশ—পোপের দণ্ড, লাল টুপি, আর ত্রিকোণ মুকুট যেন ধারণ করিলে, তার পর?

যুবক। এই পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উচ্চ বাসনা আর কিছু দেখিতেছি না। ঈশ্বর যত দিন এই পদমর্য্যাদা উপভোগ করিতে দিবেন, তাহা করিয়া তাহার পর আমাকে মরিতে হইবে।

তখন সেণ্ট নেরি বলিলেন—

What! must you die? Fond
Youth! and at the best
But wish and hope and may be all the
rest?
Take my advice—whatever may betide,
For that which must be first all provide,
Then think of that which may be, and
indeed,
When well prepared who knows
what may succeed,
But you may be as you are pleased to
hope
Priest, Canon, Bishop, Cardinal and
Pope.

সিদ্ধি

নদীতীরে আসিয়া বসিলাম, দেখিলাম, তরঙ্গগুলি কত না আকুলভাবে তীরে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। তাহাদের প্রাণের দুরন্ত বাসনা ঐ শ্যামসুন্দর দূর্ব্বাময় তীরে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া থাকে। নিষ্ঠুর চরণ-আঘাতে উপকূল তাহাদিগকে যতই দূরে ছুড়িয়া ফেলিতেছে, ততই আবার আবার, ঘুরিয়া ফিরিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই চরণে আসিয়া তাহারা মাথা কোটাকুটী করিতেছে; আর অটল গম্ভীর ভ্রূক্ষেপহীন নেত্রে নিষ্ঠুর উপকূল তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে, কটাক্ষে শত শত তরঙ্গ হৃদয় চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া আপনার মহিমায় আপনি অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে। আমিও অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম; প্রাণের এ দারুণ বাসনা কেন উহাদের পূরে না, কত যুগ-যুগান্তর হইতে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণপণ করিয়াও কেন তবে উহাদের ইচ্ছা সফল হয় না? সেইদিন বুঝিলাম, ইচ্ছা কথাটার অর্থ আমরা ভুল বুঝি। যাহা বাসনা, তাহা ইচ্ছা নহে, ইচ্ছায় আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, কিন্তু বাসনায় তাহা পারি না। অনেক দিন পূর্ব্বে ফরাসিস দার্শনিক এলিফাশ লিবাইএর এই কথাগুলি পড়িয়াছিলাম—The will accomplishes everything which it does not desire, সেই দিন কথাগুলি মনে পড়িয়া গেল, সেই দিন ইহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, পূর্ব্বে ঐ কথাগুলি একটা যেন অর্থশূন্য হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

আগে যখন সকলের মুখে শুনিতাম, ইচ্ছাই

সিদ্ধিলাভের উপায়—তখন ভাবিতাম—সত্যই বটে, ইচ্ছা না থাকিলে কিছুই হয় না, কিন্তু ইচ্ছা থাকিয়াই বা আমরা কয়টা কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করি? সেই দিন বুঝিলাম, প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। তবে অনেক সময় তাহার বিপরীত দেখি—সে কেবল বাসনাকে আমরা ইচ্ছা বলিয়া ভুল বুঝি, এই জন্য। রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করা যেমন দারুণ ভ্রম, বাসনাকে ইচ্ছা মনে করা তেমনই। বাস্তবিকপক্ষে ইচ্ছা ও বাসনা দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। ইচ্ছার সহিত বাসনা মিশাইয়া দেখ—তখনই সে ইচ্ছার কার্য্যকারিতা কমিয়া যাইবে। যেখানে বাসনার যত প্রভাব, সেখানে ইচ্ছার বল তত অল্প। তাই বলিতেছি, সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে বাসনাহীন ইচ্ছা চাই, না চাহিয়া যাহা চাই। কথাটা শুনিতে বিপরীত শুনায় বটে, কিন্তু আমার কাছে সেইদিন অঙ্কশাস্ত্রের সমস্যার মত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এখন কথা এই—ইচ্ছা যদি বাসনা না হয় ত তাহা কি? আমি ত বলি, ইচ্ছা আর কিছুই নহে, কেন্দ্রাকর্ষণী শক্তি, যাহাতে নিজের দিকে আমরা সকলকে টানিতেছি; আর বাসনা কেন্দ্রাতিগত শক্তি, সে শক্তি আমাদিগকে নিজের কাছ হইতে অন্যের দিকে লইয়া যাইতেছে; কাজেই ইচ্ছা ও বাসনার সংগ্রামে যাহার বল অধিক, সেই জয়ী হইবে। যখন বাসনার বিন্দুমাত্র না রাখিয়া আমরা ইচ্ছা করিতে পারিব, তখনই আমরা ইচ্ছা মাত্রে সিদ্ধি পাইব।

বাসনা—অর্থাৎ আমি টানিতেছি না আমাকে অন্যে টানিতেছে। আমি ধনের বাসনা করি, অর্থাৎ ধন আমাকে তাহার দিকে টানিতেছে। আমার প্রতি তাহার এই আকর্ষণের যতই প্রভাব বাড়িতেছে, অর্থাৎ আমার ধনের বাসনা যতই বাড়িতেছে, ততই আমার নিজের তাহার উপর আকর্ষণ-শক্তি কমিয়া পড়িতেছে—অবশেষে সূর্য্যাকৃষ্ট একটা শক্তিহীন গ্রহের মত তাহা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সবলে যখন তাহার উপর ছুটিয়া আসিয়া পড়িতেছি, তখনও সে আমাকে গ্রহণ না করিয়া দ্বিগুণ বেগে—ঘৃণার সহিত আবার দূরে ফেলিয়া দিতেছে।

প্রকৃতির এই মহা নিয়ম—যে যতটা বলে আকৃষ্ট হইবে—ততটা বলে যদি সে আকর্ষণ করিতে না পারে—ত তাহার দুঃখ অনিবার্য্য। তাই ঐ তরঙ্গগুলির মত কতশত হৃদয় তাহাদের নিষ্ঠুর প্রণয়ীর চরণে সমস্ত হৃদয় বলিদান দিয়াও কেবলমাত্র ভ্রূকুটী উপহার পাইতেছে, কত দুরাকাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষার আরাধনা করিয়া তাহার পদতলে শুধু দলিত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা যে পথে যাইতে চাহে, তাহার উল্টাই চলিতেছে—যাহার নিকট প্রতিপদে অগ্রসর হইতে চাহে, প্রতিপদে তাহার নিকট হইতে পিছাইয়া পড়িতেছে। যে নিয়মে ধূলাটি হইতে সূর্য্য নক্ষত্র পরিচালিত, সেই নিয়মেই এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া অন্যকে তুমি দোষী করিতে পার না, নিজের অক্ষমতা, নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের অজ্ঞতাই তোমার এ কষ্টের কারণ। সেই জন্য বলিতেছি, যাহা চাও, তাহা চাহিও না। তাহা হইলেই তাহা পাইবে—অর্থাৎ যাহা সিদ্ধি ইচ্ছা কর তাহা কামনাপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিও না, অথবা যাহা একই কথা—যাহা চাও, তাহাকে আকর্ষণ কর তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হইও না—তাহা হইলেই তুমি প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করিবে। এক আকর্ষণেই বিশ্বসংসার চলিতেছে,—তুমি এই যে ক্ষুদ্র—তুমিও বিশ্বসংসারকে আকর্ষণে বাঁধিয়াছ, এমন কি, একটা অতি ক্ষুদ্রতম অণুও প্রতিক্ষণে সমস্ত বিশ্বের উপর আকর্ষণ-বল নিক্ষেপ করিতেছে—তবে কি না বিশ্বসংসারের একত্রীভূত বল এত অধিক যে, তাহার নিকট তোমার আকর্ষণ অতি সামান্য হইয়া পড়িয়াছে। যে মুহূর্ত্তে তুমি অন্যের আকর্ষণের অতীত হইতে পারিবে—সে মুহূর্ত্তে তোমার আকর্ষণবল বিশ্বসংসার ছাড়াইয়া উঠিবে, তখন তোমার আকর্ষণের যে কত প্রভূত ক্ষমতা হইবে, তাহা এখন কল্পনাতেও আনা যায় না। এই আকর্ষণাতীত অবস্থাই যোগিঋষির সমাধি অবস্থা, কৈবল্যাবস্থা, তখনই পূর্ণ জ্ঞানের উদয়,—যাহার অতীত কোন লাভ নাই, তখনই সেই পরব্রহ্ম লাভ হয়। সংযম কাহাকে বলে? যখন আমার আকর্ষণ-বল বিশ্বসংসারের উপর অধিক—অর্থাৎ বিশ্বসংসার যখন আমাকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না, আমি তাহাকে আকর্ষণ করিতেছি, তখন আমি সংযত। সুতরাং সংযত অবস্থাতে যে ইচ্ছার প্রভূত শক্তি হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। সেই জন্যই স্বার্থ যথার্থ

স্বার্থের প্রতিবন্ধকবাসনা ইচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বী, সিদ্ধিলাভের বিঘ্ন। এই জন্যই আর্য্য মহাত্মাগণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন—কেন না, নিষ্কাম না হইলে ধর্ম্মলাভই ঘটে না।

মায়া

মায়া আর কিছুই নহে, গতিই সংসারের মায়া। এই পরিবর্ত্তনশীল মায়াময় জগতে এক মুহূর্ত্ত যাহা আছে, অন্য মুহূর্ত্তে তাহা নাই; এমন কি, তোমার নিজের অস্তিত্বেও তোমার নিকট সর্ব্বে-সর্ব্বা অক্ষুণ্ণ সত্য নহে, আজ তোমার যাহা আছে, আজ তুমি যা আছ, কাল তাহা ঠিক থাকিবে কি না সন্দেহ; আর একদিন যে বেঠিক হইয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চয়ই, কেন না, তোমার অস্তিত্বেও গতি রহিয়াছে।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, জগৎ-সংসারে আর সকলই নশ্বর, মিথ্যা, স্থায়ী, সত্য কেবল তাহার মায়াটুক্ অর্থাৎ তাহার গতি; এই গতিতেই একমাত্র ইহার স্থিতি।

তুমি আজ যাহা আছ, কাল তাহা থাকিবে না, ইহাও যেমন সত্য, তোমাতে যে গতি বর্ত্তমান, তাহা সর্ব্বকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অর্থাৎ গতিরূপে তুমি চিরবিরাজিত থাকিবে, ইহাও তেমনই সত্য। অন্তকথায় তোমার কিছুই চিরকাল একইরূপ থাকিবে না, অথচ তোমার কিছুই বিনষ্ট হইবে না। চেতন অচেতন সকল পদার্থই এই নিয়মের অন্তর্গত। বস্তুতঃ জড় ও জীবন্ত পদার্থের মূলগত বস্তুগত স্বাতন্ত্র্য আর কিছুই নাই, গতির মাত্রাভেদে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বিকাশ মাত্র। সূর্য্যালোকে যেমন তাহার তরঙ্গ-বেগের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উদয়, সেইরূপ গতির মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ গতি, অর্থাৎ নিজে গতি হইয়া যাহা অন্য গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাই চেতনা বা বুদ্ধিশক্তি। তোমার ক্ষুদ্র জড়শক্তি, তোমার দেহ, তোমার সচেতন বুদ্ধিশক্তি দ্বারা চালিত; আর উক্ত চেতনাচেতন ক্ষুদ্র শক্তিকণাসমূহ বিশ্বনিহিত যে মহান্ সমষ্টি বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইতেছে, তাহাই জগতের পরাবুদ্ধি ব্রহ্মশক্তি। এইরূপে অনন্তগতিতে অনন্ত মায়াতে, অনন্ত সত্য বিরাজমান। ইহাই মায়াবাদের নিগূঢ় তত্ত্ব।

যাঁহারা অন্যরূপ মনে করেন, যাঁহারা ভাবেন, সংসার অবহেলা করিতে পারিলেই, সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই, মায়ামুক্ত হইতে পারিবেন, তাঁহারা নিতান্তই মায়া কথা ভাবেন। কেন না, তাহাতে কাহারও সাধ্য নাই, সহস্র চেষ্টাতেও কেহ আপনাকে সংসার হইতে লোপ করিতে পারিবে না, অর্থাৎ নিজের গতিরোধ করিতে পারিবে না। কেবল স্রোতের বিমুখে চলিতে গিয়া পরাজিত দুর্ব্বল আত্মহারা হইয়া অবশেষে সবল দ্রুতগতির সমষ্টিভুক্ত হইয়া রূপান্তরিত হইবেন মাত্র।

কনে-বদল

প্রহসন

—:*:—

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

উপহার

বৎস !

কর কাজ চিরোৎসাহে, অশ্রান্ত অটল ;
ধন্য কর, ধন্য হও, সাধ সুমঙ্গল।
হাসি-খুসী এ কৌতুক,
ক্ষণিকের খেলাটুক,
বিশ্রাম-আরাম শুধু—শুধু নব বল।

ন্যট্যোল্লিখিত স্ত্রী-পুরুষগণ।

শ্রীধর ও শশিনাথ	... ...	বিবাহযোগ্য যুবকদ্বয়।
ভোলানাথ	... ...	শ্রীধরের গরীব আত্মীয় ও মোসাহেব।
মালতী ও চন্দ্রাবতী	... ...	বিবাহযোগ্যা কন্যাদ্বয়।
ললিতা	... ...	শ্রীধরের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধু।
প্রভাবতী	... ...	চন্দ্রাবতীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

মালতীর মাতা, ক্ষেপী, ক্ষেপীর মা, দাস, দাসী,
ঘটকী, নর্ত্তকী প্রভৃতি।

কনে-বদল

প্রথম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

—০—

অপরাহ্নকাল

(শ্রীধর কবিতা পাঠে মগ্ন, ভোলাদাদার কমলানেবু খাইতে খাইতে ও গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

তুমি আমার কমলা-নেবু প্রাণ।
সিলেটে জন্ম তোমার বেলেঘাটায় স্থান।
যখন তুমি নৌকায় এস,
অর্দ্ধেক কাঁচা অর্দ্ধেক টুঁসো
তোমার ভিতর এত রস না জানি সন্ধান।

শ্রী। বাহা 'রে ভোলাদাদা, এ গান কোথায় শিখলে?

ভো। দাদা, হবে হবে, তুমিও শিখবে। বের তত্ত্ব নিয়ে এসেছে, শীগ্‌গিরই প্রাণটা রসে টুগ্‌বুকে হয়ে উঠবে।

শ্রী। বের তত্ত্ব? কোথা থেকে?

ভো। কেন, শিশিরবাবুর বাড়ী থেকে। তোমায় তারা ছাড়বে না হে ছাড়বে না।

এতদিনে পেলেম দেখা,
আর না সখা ছাড়া।
তোমায়—প্রেমের ডোরে,
হৃৎপিঞ্জরে বন্দী করে রাখব।
তোমায়—পিয়াইব সোহাগ-মধু
অঘোর হয়ে থাকবে বঁধু,
তখন—কেমন ক'রে যাও হে দূরে,
দেখবো হে শ্যাম দেখবো।

শ্রী। আর গান গাইতে হবে না, আমি মরছি আপনার জ্বালায়, আর উনি এলেন কি না গান গাইতে। আমি কখনই তাকে বিয়ে করবো না। এত ক'রে বৌ-দিদিকে বলছি,—কিছুতেই যদি বুঝবেন! বেশ, শেষে নিজেই ঠকবেন—আমার কি।

ভো। বিয়ে করবে না দাদা! যে সওগাদ দিয়েছে. যদি দেখ, তা হ'লে আর ও কথা বলবে না। চন্দ্রপুলি ত একেবারে স্বর্গের চাঁদ মর্ত্ত্যে, দুঃখের মধ্যে কেবল পূর্ণচন্দ্র না হয়ে অর্দ্ধচন্দ্র; আর মনোহরাতে একেবারে মন মাৎ! আমি বরঞ্চ দু একটা নিয়ে আসি।

তোমাতেই মজিয়াছি হে মনোহরণ,
তোমাতেই স'পিয়াছি জীবন-যৌবন;
তোমারি চরণ-তলে. প্রাণ বলি দিব বলে—
আসিয়াছি ওহে মম মরণ-স্মরণ।

[তুড়ি দিয়া গাইতে গাইতে প্রস্থান।

(ললিতার প্রবেশ)

ল। ঠাকুরপো, কি হচ্ছে? বর দেখতে এসেছে যে,—একবার দেখা দাও।

শ্রী। দেখ বৌ-দিদি, আমি হাজারবার বলছি,—আরও না হয় হাজারবার,—হাজারবার ছেড়ে লক্ষবার—কোটিবার বলতে রাজি আছি যে, আমি কিছুতেই তোমাদের ফরমাসী মেয়ে বিয়ে করতে পারব না; তা তোমার মাসতুত বোন কেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মামাত বোন হ'লেও হবে না। 'লভে' না পড়লে আমি কিছুতেই বিয়ে করছিনে।

বৌ। ক্ষেপালে দেখছি! দেখা-শুনা না হ'লে 'লভে পড়বে কি ক'রে বল দেখি। আমিও ত তোমাকে হাজারবার বলেছি, তাকে দেখলেই লভে পড়বে।

শ্রী। তুমি বল্লেই হোল! আমি জানি, তা পড়ব না। দুধপোষ্যা মেয়ের সঙ্গে আমি অমনি লভে পড়ে গেলুম! বল না কেন, আমার মাকে

দড়ি দিলেই আমি অমনি গরু ব'নে যাব! তোমার লজিক দেখছি ঠিক ঐ রকম!

বৌ। তুমি যখন তাকে দেখেছিলে, তখন সে ছোটটি ছিল বটে, কিন্তু এই ক'বছরে কি সে বাড়েনি ভাবছ? এখন সে পনেরতে পড়তে চল্লো। তোমার জন্য বলে কয়ে এতদিন পর্য্যন্ত আমি আর কোথাও তার সম্বন্ধ করতে দিই নি। আর ত মাসীমা তাকে আয়বড় রাখতে পারেন না। এর চেয়ে বড় মেয়ে আমাদের মধ্যে আর কোথায় পাবে বল দেখি?

শ্রী। তোমাদের মধ্যে নেই ব'লে, সংসারে ত আর বড় মেয়ের দুর্ভিক্ষ হয় নি। আমি ত তোমাকে স্পষ্টই বলেছি,—আমি চাই কোর্টসিপ—প্রেমালাপ, কবিতায় কবিতায় ভাব প্রকাশ; আমি চোখে চোখে চেয়ে বলতে,—

দেখি দেখি আবার দেখি,
দেখিবার সাধ মেটে না ত,
যত দেখি ও মুখখানি দেখিবার
সাধ বাড়ে তত!

এক কথায় আমি চাই, গানে গানে, প্রাণে প্রাণে, মধুর মিলন। ১৪।১৫ বছরের মেয়েতে এ রকম প্রেম হ'তেই পারে না। তুমি যদি আমার মনের মত লেখাপড়া জানা একটি বড় মেয়ে দিতে পার, তবেই বিয়ের কথা বলতে এসে, নহিলে—

বৌ। অমন অবুঝ হয়ো না ঠাকুরপো। একটু ছোট মেয়ে ত ভালই। তুমি যা বলবে, তাই করবে, যা শেখাবে, তাই শিখবে। নিতান্ত বড় মেয়ে কি সহজে পোষ মানে? আর সে যে লেখাপড়া জানে না, তাও না; কবিতার বই-টই প'ড়ে থাকে, আর ঘরকন্নার কাজকর্ম্মও বেশ শিখেছে, সব রকমই তোমার মনের মত হবে, একটিবার তুমি শুধু দেখ।

শ্রী। অমন পোষ মানান আমি চাই না; চোখে চেয়ে দেখে শুনে আমার লভে পড়বে, তাই চাই। আর ঘরকন্নার কাজ জানে, তবেই ত আমার প্রাণটা সুশীতল হয়ে গেল! সে তোমার ঘরকন্নার কাজ করুক আর আমি আকাশের দিকে চেয়ে কবিতা আওড়াই, এই আর কি তোমার মতলব! না বৌ-দিদি, এ বিয়ে আমি কখনই করব না।

বৌ। দেখ ঠাকুরপো,—কতদিন থেকে মাসীমাকে কথা দেওয়া হয়েছে, এখন যদি তুমি বিয়ে না কর, তা হ'লে আমাদের কতদূর লজ্জায় পড়তে হবে, একবার ভেবে দেখ দেখি।

শ্রী। তোমরা কথা দিয়েছ, অতএব আমার বিয়ে করতে হবে, এ রকম লজিক্ ত আমি বুঝি নে। তোমরা কথা দিয়েছ, বিয়ে করতে হয় তোমরাই কর, আমাকে কেন বিয়ে করতে হবে? কি আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী গো!

বৌ। (রাগিয়া) অদৃষ্টে না থাকলে অমন মেয়ে কি ক'রে পাবে বল। তোমার ভাগ্যে একটা বুড় ধাড়ীই আছে দেখছি। কিন্তু আমি এই তোমাকে ঠিক বলে দিচ্ছি, এখন হাতের রত্ন পায়ে ঠেলছ, এর জন্য পরে আপশোষ করতে হবেই। (স্বগত) এর শোধ আমি তুলবই তুলব।

[সক্রোধে প্রস্থান।

(শশিনাথের প্রবেশ)

শ। ব্যাপার কি হে ভায়া! মুখখানা অমন লম্বা হয়ে পড়েছে কেন?

শ্রী। এই যে শশী দাদা! বস। মুখখানা তেড়াচে হয়ে পড়েনি, এই ঢের! যে বিপদে পড়া গেছে।

শ। বটে! তোমারও বিপদ। কি জ্বালা! আমি জানি আমিই বিপদে পড়েছি!

শ্রী। তুমিও বিপদে পড়েছ!

শ। ঘোর বিপদ্ ভায়া—ঘোর বিপদ্।

শ্রী। সত্যি নাকি! তা যাই বল; আমার মত বিপদ্ হতেই পারে না, আমার দাদা মহা বিপদ,—ভয়ঙ্কর বিপদ্!

শ। অমনি বল্লেই হলো! আমার বিপদ যদি শোন।

শ্রী। তার চেয়ে আমার বিপদটাই কেন আগে শোন না।

শ। তবে তাই বল; কিন্তু একটু শীঘ্র শীঘ্র বলে যাও!

শ্রী। তুমিই ত দেরী করাচ্ছ!

শ। আমি দেরী করাচ্ছি, না তুমি?

শ্রী। জ্বালালে দেখছি, তবে আমাকেই বলতে দাও।

শ। তুমি একটু চুপ করলেই আমি ব'লে যাই।

শ্রী। তা আমি কিছুতেই পারব না, আমার

মাথার মধ্যে কথাগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে; তুমি বল দেখি দাদা, করমাসী মেয়ে কি বিয়ে করা যায়?

শ। কিছুতে না—কিছুতে না, তোমারো ঐ বিপদ! আমিও যে ঠিক ঐ বিপদে পড়েছি ভায়া।

শ্রী। সে কথা এতক্ষণ বল্‌তে হয়। দু'জনেই তা হ'লে এক ঘাটে জল খাচ্ছি বল। (উভয়ের আলিঙ্গন)—দুঃখের কথা বলব কি। একটি দুগ্ধ-পোষ্যা মেয়ে জুটিয়ে দাদারা বলছেন, তাকে বিয়ে কর্‌তে হবে।

শ। এই তোমার দুঃখ! হা,—হা,—হা! আমার দুঃখের কথা শুন্‌লে পাষাণও গ'লে যায়। একটি কুড়িবছরের বুড়ীকে ধরে আমাকে গছাবার চেষ্টা। অপরাধের মধ্যে বিলাত যাওয়ার আগে আমি তাকে like কর্‌তুম, আর আমার যেমন গ্রহ—সেই যুগ যুগ পূর্ব্বে নিতান্ত কাঁচা বয়সে বলেও ফেলেছিলুম যে, আমি তাকেই বিয়ে করব। সেই কথা ধ'রে আম ফির্‌তে না ফির্‌তে আমাকে পাকড়া করেছে। এ'কেই না বলে কর্ম্মফল!

শ্রী। হা,—হা,—হা; হা ভগবান্! এই তোমার দুঃখ! বিধাতা যদি এমন দুঃখ আমার অদৃষ্টে ঘটাতেন, তা হ'লে ত আমি বেঁচে যেতুম। মেয়ে বড়—বেশ লেখা জানে?

শ। ভয়ানক লেখা-পড়া জানে। সেই ত আরো বিপদ।

শ্রী। সেক্সপিয়ার, বায়রণ, সেলি, টেনিসন্, এ সব পড়্‌লে বেশ বুঝতে পারে?

শ। খুব পারে, বি-এ, এম্-এরাও তার কাছে হার মেনে যায়।

শ্রী। উঃ, বল কি হে! আর তুমি তাকে চাও না। আমার প্রাণের মধ্যে হুহু ক'রে উঠছে। (ক্রন্দন) এমনতর সব মেয়ে থাকতে দাদারা কি না আমার জন্ত এক নাবালিকা মেয়ে জুটিয়ে বলেন, বিয়ে কর; না জানে সে কথা কইতে, না জানে সে হেসে চাইতে—আমার যেন আর কোন কাজকর্ম্ম নেই, তাকে নিয়ে আমি এখন মানুষ করি! ঘরের কাজ বেশ জানে, কথার বেশ বশ হবে, এ সব কথা শুন্‌তে ভাল, কিন্তু তাতে ত আর প্রাণের আশা মেটে না।

শ। বল কি হে! অল্প বয়স—ঘরকন্নার কাজ বেশ জানে?

শ্রী। ঘরকন্নার কাজ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব নাকি?

শ। তুমি যা বলবে, তাই সে মেনে নেবে? তুমি যদি বল, সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে আর পূর্ব্বে অস্ত যায়, তাই সে বুঝে যাবে?

শ্রী। যাবে বই কি? তাতেই ত আমার আপত্তি।

শ। হায় হায়! এমন মেয়েকে তুমি ছাড়ছ? ভগবান তোমাকে এমন সৌভাগ্য দিচ্চেন, আর তা তুমি বুঝছ না? দেখ ভাই, চাউনিতে মজা, কবিতাতে প্রেমালাপ, এ সব ছেলে বয়সেই সাজে, কিন্তু ওতে পেট ভরে না,ভায়া! বিলাত গিয়ে ও-সব ঢের করা গেছে। এখন আমি চাই একটি ছোট মেয়ে—উঠতে বল্লে সে উঠবে, আর বসতে বল্লে সে বসবে; যে আমার জন্ত স্বহস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধবে, আমাকে আগে খাইয়ে পাতে খাবে, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে ঘুমুবে—

শ্রী। বটে! আমার একটা idea মনে আসছে।

শ। কি idea? আঃ, আমাকে যদি এ যাত্রায় উদ্ধার কর্‌তে পার ভাই!

শ্রী। আমরা কেন কনে বদল করি না, আমার কনেটি আমি তোমাকে দিচ্ছি, তোমার কনেটি আমাকে দাও।

শ। ঠিক ঠিক! grand idea! আঃ, বাঁচালে' ভায়া! তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলুম।

শ্রী। (আহ্লাদে) আমি যাই, এখনি বৌ-দিদিকে বলি, কালকেই আমি কনে দেখতে যাব। আজ হ'লেই হতো ভাল, কিন্তু তার ত আর সময় নেই। কটার সময় যাবে হে?

শ। কোর্ট থেকে এসে সন্ধ্যার সময় ছুটব। তার পর রাস্তায় বেরিয়ে আমরা ঠিক সময়ে নিজেদের বদল করে নেব; হা হা—আমি হব শ্রীধর গড়গড়ি, আর তুমি হবে, শশিনাথ পাকড়াশি।

শ্রী। উঃ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হবে? আমি কেন আগেই যাই না।

শ। তা যাও না,তাতে আর আমার আপত্তি কি?

শ্রী। সেই ভাল! আমি যাব চারটার সময়। কোন্ বাড়ীতে?

শ। ১০ নম্বর হাড়কাটা গলি, জগৎ বাবুর বাড়ী।

শ্রী। আর তুমি যাবে সন্ধ্যার সময় ২০ নম্বর আমড়াতলার গলি, শিশির বাবুর বাড়ী।

শ। যদি তারা আমাকে ধ'রে ফেলে ?

শ্রী। তা কি করে পারবে ? শর্ম্মা ৪।৫ বছর কি ও-মুখো হয়েছে ? কিন্তু আমাকে যদি তারা—

শ। হা, হা,—হা। আমি কি আর বিলাত থেকে ফিরে সেখানে গেছি ভায়া। চিঠির উপর চিঠি আসছে, কিন্তু আমার এখনো সময় হয় নি। তোমাকে ঠিকই শশিনাথ ভাববে!

শ্রী। কিন্তু আমি ত তোমাদের পুরাণ ইতিহাস আওড়াতে পারব না।

শ। সে সব আমি তোমাকে ভাল ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে দেব এখন।

শ্রী। বেশ বেশ, কালই তবে যাওয়া যাবে। আমি বৌদিদিকে দিয়ে এখনি তাদের ব'লে পাঠাচ্ছি।

শ। আমাকেও দেখছি কাল সকালেই এক-খানা চিঠি লিখে পাঠাতে হবে। আমি কি না এই একটু আগে অন্য রকম চিঠি লিখে ডাকে দিয়ে ব'সে আছি। হা হা! কাল থেকে আমি শ্রীধর গড়াগড়ি।

শ্রী। আর আমি শশিনাথ পাকড়াশি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—:০:—

শিশির বাবুর অন্তঃপুর

ললিতা ও তাঁহার মাসীমা

মাসী। শুনছি নাকি বাছা, তোর দেওরের মন নেই। আমার ত আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়েছে! তোর কথাতেই এতদিন মালতীকে বড় ক'রে রাখা, এখন যদি শ্রীধরের সঙ্গে বিয়ে না হয় ত লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

ল। একটু সবুর কর না, অত ব্যস্ত হও কেন ?

মা। চিরকালই ত বাছা ঐ কথা বলছিস। কিন্তু এতদিন সম্বন্ধ হোয়েছে, একদিনও ত সে এ-মুখো হোল না। চাকর-বাকর তোদের বাড়ী গেলে একটিবার তার দেখা পর্য্যন্ত পায় না। সেই ছেলে-বেলায় যা দেখেছি, নইলে কাণা কি খোঁড়া, কিছুই বুঝতে পারতুম না,—তবুও বলিস্ হবে হবে।

ল। হবে না ত কি, তবে অত ব্যস্ত হ'লে চলবে না।

মা। কি যে বলিস্ বা, কিছুই বুঝতে পারিনে। আমার পোড়া কপাল বলেই এত ভাবনা। আজ যদি তিনি থাকতেন, তা হ'লে কি আমার এত ব্যস্ত হ'তে হোত। অভিভাবকের মধ্যে এক ও-বাড়ীর বড়-ঠাকুর, তিনি ত নিজের মেয়ের বিয়ের ভাবনায় অস্থির, আমার ভাবনা আর কে ভাবে বল ?

ল। ক্ষেপীর কি এখনো বিয়ে হয় নি ?

মা। কি ক'রে হবে বাছা। এত বড় মেয়ে হয়ে উঠেছে, এখনো না হ'ল জ্ঞান, না হ'ল বুদ্ধি। দেখতে ত ঢের লোকে আসে; কিন্তু একবার দেখলে কেউ যে আর এগোয় না। বড় ঠাকুর বলেন, আমাদের মালতীকে দেখিয়ে ক্ষেপীর সম্বন্ধ করতে;—এমন অধর্ম্মে কাজ কি আমি করতে পারি বাছা ?

ল। আমার এক বুদ্ধি জোগাচ্ছে মাসীমা। আমি যা বলব, তোমায় কিন্তু তা করতে হবে বাছা।

মা। তা আর করবা না, -তুমিই হ'লে আমার প্রকৃত অভিভাবক।

ল। দেখ, ঠাকুরপো এক আপত্তি তুলেছে, আমাদের মালতী ছোট। সে বড় মেয়ে বড় মেয়ে ক'রে পাগল হয়েছে। আমি ক্ষেপীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ করতে চাই।

মা। ও মা, ওকি কথা গো।

ল। ভয় কি মাসীমা! কনে দেখলেই তার বড় মেয়ে বিয়ের সাধ মিটে যাবে। তখন বলবে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, আর আপনি যেচে যদি মালতীকে তখন বিয়ে না করে, তা হলে আমার নাম নেই।

মা। ওমা, কি বল গো, শেষে কি করতে কি হবে।

ল। তুমি থাম না, আমার উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক। যদি ঠাকুর-পো ক্ষেপীকে বিয়ে ক'রেই ফেলে, আমি তোমার মেয়ের অন্য ভাল বর জুটিয়ে দেব, সে জন্য কিছু ভাবনা করো না।

মা। তা বাছা, যা ভাল বোঝ, তাই কর, শেষে

কেন হিতে বিপরীত না হয়। এই যে বল্‌তে বল্‌তে দিদি এসে উপস্থিত।

(ক্ষেপীর সহিত তার মার প্রবেশ)

এস দিদি, তোমরা বসে গল্পগুজব কর, আমি ধোবার কাপড়গুলো গুণে তুলে রেখে আসি। মালতী ক'দিন থেকে কি না তার পিসীর বাড়ী গিয়ে আছে, তাই আমার আর এক তিল ফুরসৎ নেই।

[প্রস্থান।

ক্ষে-মা। ললিতা, কতক্ষণ এলি বাছা! সব ভাল ত?

ল। হ্যাঁ মাসীমা, তোমরা ভাল আছ ত?

ক্ষেপী। ভায়ো—ভায়ো।

ক্ষে-মা। আর বাছা ভাল, এখনো যে বেঁচে আছি, এই আশ্চর্য্য! এত বড় মেয়ে হোল, এখনো বে হোল না, মনের কষ্টে মরে আছি বাছা, একটি বর জুটিয়ে দে না মা আমার।

ক্ষে। আমি চাত্তে বল খাব মা, কান বল মা কান বল।

(সকলের হাস্য)

ক্ষে-মা। দেখদেখি বাছা কথার শ্রী; ও চাত্তে ক্যানিংবল খাবে। পোড়ারমুখী, যা খুড়ীমার কাছ থেকে পান-দোক্তা চেয়ে আন।

ক্ষে। আমি পান খাব—আমি পান খাব।

[প্রস্থান।

ল। (স্বগত) একে ঠাকুরপোর কনে সাজাতেই হবে। (প্রকাশ্যে) তা আমি চেষ্টা দেখব বাছা, ঠাকুরপো বড় মেয়ে খুঁজছে, তাকে একবার বলব।

ক্ষে-মা। বাছা চিরজীবী হ, হাতের নো ক্ষয় যাক। তুই যদি বলিস তো দেওর কখনই সে কথা ঠেল্‌তে পারবে না শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই ২৩ বছর চল্‌ছে। সে কথা অবিশ্যি আমি আর কাউকে বলিনে। এত বড় মেয়ে বাছা তোর দেওর আর কোথায় পাবে বল। তা মালতীর সঙ্গে না তার সম্বন্ধ হয়েছিল?

ল। ঠাকুরপো অত ছোট মেয়ে বিয়ে কর্‌বে না।

ক্ষে-মা। তা বেশ,—বেশ; আমার মালতীও যা, ক্ষেপীও তাই, এক মেয়েকে বিয়ে করলেই হলো, কি বলিস্ বাছা?

ল। তা ত ঠিকই। তা আমি আজই ঠাকুরপোকে বল্‌ব এখন। তবে আজকালকার ছেলেরা তো কারো কথায় ভোলে না, নিজেরা সব যাচাই ক'রে নিতে চায়। এ কথা শুন্‌লেই কিন্তু ঠাকুরপো মেয়ে দেখতে চাবে।

ক্ষে-মা। তা বাছা, যখন বলিস্, আমি কনে দেখাতে রাজি, তবে দেখলে পাছে পিছয়, এই ভয় হয়। জানিস্ ত বাছা, ওর কথার বড় একটা বাঁধুনি নেই। কনে দেখতে এলে যদি চুপ ক'রে থাকে, তা হলেও হয়, তা কিছুতেই ওকে চুপ করিয়ে রাখতে পারি না।

ল। আচ্ছা সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রে নেব এখন, সে জন্য তুমি ভেবো না।

ক্ষে-মা। তা যদি পারিস বাছা। ঐ দেখ না, একমুখ পান ক'রে কাপড় সব পানের দাগে ভরিয়ে সং সেজে আস্‌ছে।

ল। না পার্‌লে চলবে কেন বাছা, তুমি বরঞ্চ একটু ওদিকে যাও, আমি ওকে এখনি শেখাই।

ক্ষে-মা। আঃ, আমার ধড়ে প্রাণ এল। বেঁচে থাক বাছা, বেঁচে থাক। শেখান হ'লেই ডাকিস বাছা, একটু শীগ্‌গির যেতে হবে।

[প্রস্থান।

(ক্ষেপীর প্রবেশ)

ল। দেখ ক্ষেপী, তোর বর আস্‌ছে।

ক্ষে। (একমুখ হাসিয়া) আমি বল ভায়ো বাসি।

ল। বর ভালবাসিস্ —তা আমি তোকে দেব।

ক্ষে। চাত্তে চাত্তে বল—

ল। আচ্ছা চারটে বরই দেব—আমি যা বল্‌ব, তাই করবি?

ক্ষে। কল্‌ব কল্‌ব!

ল। দেখ, তোর নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি বল্‌বি বল্ দেখি?

ক্ষে। অস—মিছলি।

ল। না, রসমঞ্জরী না—বলবি প্রাণকান্ত, আমি তোমারি।

ক্ষে। পান—পান—ভোজাল পান খাব।

ল। না, আমি যা বলি ঠিক বল। প্রাণকান্ত, আমি তোমারি।

ক্ষে। পান কাঁদত, আমি তোয়ারি পান।

ল। আচ্ছা, ওতেই চল্‌বে,- তার পর তোকে যদি জিজ্ঞাসা করে, কি বই পড়িস্—ত কি বল্‌বি বল্ দেখি?

ক্ষে। পালম শাক।

ল। কেবল খেতেই জন্মেছ—প্রথমভাগ খানা তোমার পালম শাক হয়ে পড়েছে। না পালম্ শাক নয়। বল্‌বি, তোমা বই আমি জানিনে।

ক্ষে। তোয়া বই আনিনে।

(ভোলাদাদার প্রবেশ)

ল। এই যে ভোলাদাদা, কি মনে ক'রে?

ভোলা। আর ভাই বল্‌ব কি, শ্রীধর ভায়া তোমার জন্ম ছটফট কর্‌ছে। শুন্‌লে এখানে এসেছ, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

ল। কেন, ব্যাপারটা কি?

ভো। ভায়া ক'নে দেখতে রাজি, আজ ত আর সময় হোল না, কালই সন্ধ্যার সময় মেয়ে দেখতে আসবে।

ল। কা'লই সন্ধ্যার সময়? (স্বগত) বিপদ্ ঘটালে দেখ্‌ছি কাল ত থাকতে পার্‌ব না, কাল সন্ধ্যাবেলায় আবার ছোটবৌদের খেতে বলেছি। যা হোক ভাল ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা যাবে।

ভো। এ মেয়েটি কে গা?

ল। ওকেই নাম জিজ্ঞাসা কর না, উত্তর পাবে।

ভো। তোমার নাম কি দেবি!

ক্ষে। অসমিছলি—

ল। (চিম্‌টি কাটিয়া) আবার।

ক্ষে। অস অস—তোয়ারি পান—

ভো। আহা ম'রে যাই, এমন মিছরি-মাখান কথা ত জীবনে কখনো শুনি নি। বেঁচে থাক রস—

—আমি রসোগোল্লা দেব।

ক্ষে। (হাঁ করিয়া, হাসিতে হাসিতে) আমি অসোগোয়া খাব।

ভো। আহা, কি কচি কথা গা।

ল। ভোলাদাদা, জিজ্ঞাসা কর,— কি বই পড়েছে।

ক্ষে। তোয়া বই আনিনে পান—

ভো। একি শুন্‌ছি, আমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে?

ল। না দাদা, আমাদের ভাগ্যিতে এখনো মর্ত্ত্যেই আছ, আর তুমি স্বর্গে যেতে চাইলেও যমের সঙ্গে লাঠালাঠি ক'রে আমরা তোমায় ধ'রে রাখব। তুমি এখন ঠাকুরপোর কাছে যাও, বল গে, তাঁর ক'নে ঠিক থাক্‌বে, কাল সন্ধ্যাবেলা যেন দেখতে আসেন। (স্বগত) ভাল ক'রে রিহারশেল দিলে কাল নাগাদ বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে রাখতে পারব। যাও দাদা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

ভো। কি ক'রে যাই, পা যে সরে না; কি কথাই শুন্‌লুম!

ল। এই কথা ঠাকুরপোও শুন্‌বে এখন।

ভোলা। আঁা আঁা, এ কি তার ক'নে! আমাকে বল্‌তে হয়। চমৎকার মেয়ে, আমি গিয়েই বল্‌ছি। একবার চার চক্ষুর মিলন হ'লে তখন আর জন্মে ভুল্‌তে পার্‌বে না দাদা। কি রূপ গা! চোখ ঠিক্‌রে যায়

কে গো রমণী কালবরণী,
অপাঙ্গে-চাহিনী নয়নধাঁধিনী,
প্রলয়-হাসিনী প্রাণ-বিনাশিনী,
গজেন্দ্রগামিনী যেন রে,
সিংহবাহিনী যেন রে।
কানে স্বর্ণ-পাশা, নাকে নথ খাসা,
বাউটিধারিণী ভুজ দৈত্যনাশা,
চরণ-তাড়নে, নূপুর বাদনে,
মহিষমর্দ্দিনী যেন রে!
মুণ্ডমালিনী যেন রে।

[তুড়ি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

—:০:—

জগচ্চন্দ্রের অন্তঃপুর।

(ভাণ্ডার ঘরে প্রভাবতী নিম্‌কি প্রস্তুত করিতে-ছেন—নিকটে থালায় নানারকম তরকারীর ভাগ সাজান)

প্র। (নিম্‌কি বেলিতে বেলিতে) এত ত আয়োজন কর্‌ছি, এবার আবার না জানি কি ব'লে বসে। এই ত তিন তিনবার ডাক্‌লুম, দু'বার ত ওজর ক'রে কাটালে। কি ভাগ্য ইনি তা জানেন

না, জানলে রক্ষে রাখতেম না। এবার এলে হয়। এবার বোধ হয় নিশ্চয় আসবে। না এলে কালই উত্তর দিত।

(হাবীদাসীর প্রবেশ)

হাবী। উনুন ধরিয়ে এলক মা, কি হবেক সব বলেক দাও, বামুনকে দিয়েক আসি।

প্র। (নিমকি বেলা বন্ধ রাখিয়া ও তরকারীর থালা টানিয়া) দেখ, এই আলুপটলগুলোর দম হবে, এইগুলো কালিয়াতে পড়বে, এই ভাগটা ছোকা হবে. এই কটা যে আস্ত আলু দেখছিস্‌, তার চপ হবে, এই তরকারীগুলো ভাজি হবে। বুঝলি ত?

দা। বুঝেছিক গো—বুঝেছিক, আপনি তবুক এস।

প্র। আমি ত যাচ্ছি, এই নিম্‌কিগুলো ঠিক ক'রে নিয়েই যাব। তুই বাটনাগুলো সব বেটে-ছিস্‌ ত?

দা। বাটিকনি ত কি? ঝালমরি ঘসড়েক ঘস-ড়েক হাত জলেক খুন হইছুক মা।

প্র। তবে যা বামুন্‌কে বল্‌গে কালিয়ার মাংসটা চড়াক—আর দই-মাছের জন্য যে কাঁচা মাছ রেখে এসেছি, সেগুলোও সিদ্ধ কর্‌তে দিক্‌—দেখিস যেন জলে সিদ্ধ না করে।

দা। ও মা, বলক্‌ কি অপুনি? জলেক না ত সিদ্ধ কর্‌বেক কিসেক?

প্র। জলেক না, ঘোলেক সিদ্ধ হবে, বুঝলি এখন?

দা। তা বুঝেছিক গো, বুঝেছিক্‌। মুই কি এতই হ্যাকা নাকি যে, কথা বল্লেক বুঝতে নারবক্‌।

প্র। (হাসিয়া) তুই খুব বুদ্ধিমতী আমি জানি, নইলে বাপ-মা এমন নাম দেয়? এখন চেঁচাস্‌নে, তরকারীগুলো নিয়ে যা।

দা। চেঁচাবুক না! খাটবেক যত হাবী, আর বাজারকে যাবেক ভবি!

প্র। আ মলো! আজ কি রান্নাবান্না হবে না? এইখানেই দাঁড়িয়ে বকাবকি কর্‌বি?

দা। মর্‌বুক কেন্নে গা? মুই হাত জল্‌কে খুন হইছুক, একটু আহাউহক নেই, ক্যাবল্‌ মলোক্‌ মলোক্‌! মুই মর্‌বুক কেন্নে, আপুনকার ভবির মরুক। (আঙুল মট্‌কান)

প্র। ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস। তুই মর্‌বি কেন, তোর বালাই নিয়ে আমি মরি। হাত জল্‌ছে? হাতে এখনি পটি বেঁধে দেব, আর কাল ভবিকে বসিয়ে তোকেই বাজারে পাঠাব, এখন যা লক্ষ্মীটি, তরকারীগুলো নিয়ে যা। (হাস্য)

দা। বড্ড হাস্তি! চলুক্‌, আপনিও এসক্‌!

[থালা লইয়া প্রস্থান।

প্র। জ্বালালে হাবীটা! এখন নিম্‌কিগুলো—শেষ ক'রে ফেলি। (নিম্‌কি কাটিতে কাটিতে) মনে ত কর্‌ছি আসবে, যদিই না আসে, কি লজ্জা, কি অপমান! তা হ'লে কিন্তু আমি এর শোধ তুল-বই যেমন ক'রে পারি। নিম্‌কি কাটা ত হলো, যাই এবার রান্নাঘরে। বাদাম-কিসমিস্‌গুলা নিয়ে যাই, (উঠিয়া হাঁড়ি হইতে বাদাম লইতে লইতে) পোড়ারমুখী চন্দ্রার জন্যই এত জ্বালা। সে তাকে যে এখনো ভালবাসে, বেশ বুঝতে পারি। তার ১৪ বছর বয়সের সময় শশিনাথ বিলাত গেছে—এই ছ বছর সে তারই অশাপথ চেয়ে আছে। বিয়ের সম্বন্ধ এলেই ব'লে বসে, এখন লেখাপড়া ছেড়ে সে বিয়ে কর্‌তে পারবে না। চন্দ্রার ভাব বুঝেই ত এতদিন চুপ ক'রে আছি, আর এখন এত লজ্জা অপমান সব সহ্য কর্‌ছি। কিন্তু এর পর যদি—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। আজ্ঞে, ডাকের চিঠি এসেছে।

প্র। (আগ্রহে) দে। (পত্র গ্রহণ)

[ভৃত্যের প্রস্থান।

শশিনাথের চিঠি দেখছি—আবার না জানি কি লেখে, বুকটা দুর্‌দুর্‌ কর্‌ছে, এ যেন আমারি প্রেম-পত্রের উত্তর! (পত্র পাঠ)। "আপনার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া সম্মানিত হইলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার অদ্যই মফঃস্বলে যাইতে হইবে। কবে ফিরিব, ঠিক নাই। পুনঃ পুনঃ আপনার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে হইতেছে, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আশা করি, ভবিষ্যতে আর এরূপ অস্বীকারের কারণ দিবেন না" (পত্র ভূমে নিক্ষেপ করিয়া) উঃ, কি অপমান! আর সহ্য হয় না। এর পর সে এসে যদি চন্দ্রার পায়েও ধরে,

তা হ'লেও আমি আর তার সঙ্গে চন্দ্রার বিয়ে দেব না। যদিই বা পরে দিই, তাকে আগে চ'খের জলে নাকের জলে কর্‌ব, তবে ছাড়ব।

[পত্র কুড়াইয়া এবং নিম্‌কির থালা উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

—•—

গৃহে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চন্দ্রা চুল বাঁধিতেছে।

চ। আমার ত মনে হচ্ছে, সেদিন! সেই দৃষ্টি, সেই মূর্ত্তি, সেই সব কথা আমার ত মনের শিরায় শিরায় আঁকা রয়েছে। তখন বরঞ্চ অনেক কথা শুনে যেতুম—মানে বুঝতুম না, এখন সেই সকল কথা প্রেমময় অর্থপূর্ণ হয়ে শতগুণ মধুমাখা স্মৃতিতে মনে জেগে ওঠে। আর সত্যই কি তিনি সে সমস্ত ভুলে গেছেন! ফিরে এসে একবার দেখতে এলেন না, দিদি এত ডাকছেন, তাঁর একটিবার আসার অবসর পর্য্যন্ত হ'ল না। উঃ পুরুষমানুষ কি নিষ্ঠুর জাত!

বেহাগ।

সারাদিন পড়ে মনে।
মধুমাখা প্রেমরাগে, চেয়েছিল সে কেমনে!
রবির কিরণ আগে, সে আলো কিরণ জাগে;
সন্ধ্যা না হইতে সন্ধ্যা সে চিঠির স্মৃতি মনে।
হাসি কাঁদি সারাদিন, সে নয়নে চিরলীন,
স্বপ্নখানি যেন তার মরি বাঁচি তাহে ক্ষণে।

(একটি বিনুনি শেষ করিয়া অন্যটি বিনাইতে বিনাইতে) বেশ-বিন্যাস কর্‌ছি কার জন্য? হয় ত তিনি আজও আসবেন না। আমার নিজের উপর এত রাগ ধরছে! এত চেষ্টা করছি, কিছুতে ভুলতে পার্‌ছি না! সত্যি আমার কি মনের একটুও তেজ নেই—একটুও গর্ব্ব নেই! প্রাণ যায়, সে-ও ভাল, তবু আর তাঁকে দেখতে চাব না। ইঃ, তিনি মনে করেছেন, আমরা ক্রমাগত তাঁকে সাধব, আর তিনি উপেক্ষা কর্‌বেন! কখনো না। একবার যদি আসেন ত তাঁর ভুলটা দেখিয়ে দিই। (বিনুনি শেষ করিয়া কবরী বন্ধন করিতে করিতে) কে জানে, কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে—

(প্রভাবতীর প্রবেশ)।

প্র। বিশ্বাস কর্‌তে পারিসনে,—এই চিঠি পড়্।

(পত্রপাঠে চন্দ্রাকে সজলনয়ন দেখিয়া)

প্র। দেখ চন্দ্রা, ও রকম করলে চল্‌বে না। ঢের হয়েছে—যত দূর অপমান সহ্য করবার, তা সওয়া গেছে। তোর যদি একটুও আত্মগর্ব্ব থাকে ত কান্নাকাটি ছাড়্, মনে বল আন, তার এরূপ ব্যবহারে প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ। আমার ত রাগে অপমানে সর্ব্বশরীর জলছে। এর শোধ যতক্ষণ আমি নিতে না পার্‌ছি, আমার শান্তি নেই।

(ঘটকীর গাইতে গাইতে প্রবেশ)

[চন্দ্রার ধীরে ধীরে প্রস্থান।

ঘ।—কে তোরা জামাই নিবি,
ওগো কনের মা'রা,
এনেছি নূতন বর, গুণে সেরা,
ওগো গুণে সেরা।
এ নয় সাধারণ ছেলে,
পাশের রাশ সে বইতে নারাজ,
তাই ফেল বিএ এল্-এ!
গুণের কব কি সীমা, এর নাই জমী জমা,
এ যে স্বনামধন্য, পুরুষগণ্য বিলাত ফেরা।
ওগো ক'নের মারা;
কে তোদের মেয়ে এমন কপাল জোড়া!
লাগবে না টাকাকড়ি, সোনাভরি ওজন করা,
শুধু উনিশ কি বিশ যৌতুকটি দিস্ কাগজ ভরা,
ওগো কাগজ ভরা।
অমনি পর্‌বে টোপর আপনি সে বর নেবে ধরা।

প্র। আর রঙ্গ ভাল লাগে না, অন্য জায়গায় যা।

ঘ। ও মা; ওকি কথা গো, তুমিই ত বল্লে, শশীবাবুর—কি বলে—সাহেব বাবুর,—আ মর, পাক্‌ড়াশি সাহেবের কাছে যা, তা কাজ গুছিয়ে এনু—এখন দূর ছাই।

প্র। কাজ কি গোছালি—সে ত আর আসছে না।

ঘ। আসছে বই কি আজই আসছে।

প্র। মরণ তোমার, ও সব বাজে কথা ঢের শুনেছি। আমি এই মাত্র চিঠি পেয়েছি, সে আসতে পারবে না।

ঘ। কেন আমাকে যে চিঠি দিলেন, আজই আসবেন। আমি কি তেমনি পাত্র, চিঠি নিয়ে তবে ছেড়েছি।

(পত্র লইয়া মনে মনে পাঠ করিয়া)

প্র। সত্যিই আজ চারটের সময় আসছে। আমি আগে যে চিঠি পেয়েছি, সে কালকের লেখা—আজ সেজন্য মাপ চেয়েছে। (স্বগত) কিন্তু আমি এত সহজে তার অপমান ভুলছিনে, তাকে মাপও কর্‌ছিনে। এখন কি করা যায়? একটা ফন্দী মনে আসছে!

ঘ। তবে চন্নু মা, এখন, আমার আবার এক জায়গায় যেতে হবে, চারটের সময় ঠিক এখানে এসে জুটতে পার্‌লে হয়।

প্র। (স্বগতঃ) দেরীতে এলেই ভাল।

(প্রকাশ্যে) তা দেরী হ'লেই বা ক্ষতি কি? যখন সুবিধা হয় এস।

ঘ। তবে চন্নু মা, বিদায়টা যেন ভাল ক'রে পাই।

[প্রস্থান।

প্র। কই এখনো ত ক্ষেপীর মা এলেন না। দুপুরের সময় গাড়ী পাঠিয়েছে—এখন দুটো, এই যে বল্‌তে বল্‌তে।

(ক্ষেপী ও ক্ষেপীর মার প্রবেশ)

মাসীমা তোমার যে এত দেরী, আমি ছানাটানা কেটে ঠিক ক'রে রেখেছি—আজ তোমার কাছে রসগোল্লা-পানতোয়াটা শিখে তবে অন্য কাজ! ক্ষেপী কোথা?

মা। সে বাছা হাবির কাছে গেল। তা বাছা তুইও বেশ রসগোল্লা করিস্।

প্র। পোড়া কপাল আর কি! আমি রসগোল্লা কর্‌লেই তোমাদের ছেলে বলেন, বাড়ীতে ত ঢিলের অভাব নেই,—এনে রসে ডোবালেই ত হয়—কেন মিছে ছানা কিনে পয়সা নষ্ট করা। তাই প্রতিজ্ঞা করেছি, আজ শিখবই শিখব।

মা। তা চল বাছা রান্নাঘরে—আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী যেতে হবে। অনেক ক'রে যেতে লিখলি, গাড়ীও পাঠালি, তাই এলুম, নইলে আজ আস্‌তুমই না।

প্র। কেন বাছা, সেটি হবে না। আজ আমি তোমার মেয়ের জন্য বর ঠিক্ করেছি, সে চারটের সময় দেখতে আসবে।

মা। (স্বগত) এ হলো কি! একটা বর জোটে না—হঠাৎ দুট দুট বর হাজির! যেখানে যাই, আমার ক্ষেপীর বিয়ের জন্য সবাই ব্যস্ত! কোনোটাকেই এখন হাতছাড়া করা হবে না, যেটা লেগে যায়। (প্রকাশ্যে) সত্যি বাছা, ক্ষেপীর জন্য বর ঠিক্ করেছিস? কি ব'লে যে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব, ভেবে পাচ্ছিনে, জন্ম জন্ম সুখে থাক। বর না বল্লি চারটার সময় ক'নে দেখতে আস্‌বে?

প্র। হ্যাঁ, বলেছে ত তাই।

মা। তা আমি ছটা পর্য্যন্ত থাকতে পারব, ৭টাতে গেলেই হবে। তবে চল, মিষ্টিগুলো সব ক'রে ফেলিগে।

প্র। হ্যাঁ, আবার ক'নে সাজাতে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

—*—

জগৎবাবুর বহির্ব্বাটীর একটি কক্ষে শ্রীধর চৌকিতে আসীন।

শ্রী। উঃ ভারী nervous মনে হচ্ছে, বুকটা ভারী গুর গুর কর্‌ছে, কি ক'রে কথা সুরু করব? প্রথমেই কি বলব? My hope and heart is with thee O fair চন্দ্রাবতী; উহু এটা বলা ঠিক হবে না, সবাই ভাববে—ছোকরা পাছে না উঠতে এক-কাঁদি। আগে তার সৌন্দর্য্যের বর্ণনাটা করা চাই। যদি বলি—

Wha heavenly simlles O lady mine!
Thrnugh my very heart they shine!

কিন্তু চন্দ্রাবতী যে হাসতে হাসতেই এসে দাঁড়াবেন, এমনটা যে ঠিক বলা যায় না, তা ছাড়া আগে ত অভিবাদন, তার পর ত অভিনন্দন। ঠিক হয়েছে—প্রথমে কবিতা টবিতা নয়, শুধু বলব দেবী নমস্কার। তার পর একটু কথাবার্ত্তা হবার পর বরঞ্চ বলতে পারি—

There be none of bceuty's daughters
With a magic like thee,
And like music on the water
is thy sweet voice to me,

কিন্তু কি বকৃছি! আমি যে স্বদেশী! সেটা এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলুম। ইংরাজী কবিতায় প্রেমালাপ করলে চলবে না ত, বাঙ্গালায় বলতে হবে। তা সেজন্য ভাবনা কি, আজ-কাল ত বাঙ্গালায় এ রকম কবিতার কিছু অভাব নেই। দেব-কৌতুকের এ লাইনগুলো বেশ খাটতে পারে—

এ কি কারে দেখি!
অমৃতরূপিণী বালা, ভারতীর বীণা
রতি-মুখে ঝঙ্কারি উঠিল যেন মরি।
মুহূর্ত্তে হৃদয়-কুঞ্জে মুঞ্জরিয়া তুলি
অস্ফুট আশার কলি পরিমলাকুল,
গুঞ্জরিত করি মত্ত মন-মধুকর।

কিন্তু কই এখনো ত কেউ ডাকতে আসছে না।—কতক্ষণ আমাকে এমন ক'রে বসিয়ে রাখবে।

এমনে কেমনে রব না দেখে তাহায় রে!
গণিয়ে নিমেষ পল দিন না ফুরায় রে!
শবদে চমকি উঠি, দুরু দুরু হিয়া,
প্রাণ যারে চায় কেন বিধি না মিলায় রে।

(টেবিল বাজাইয়া গান, ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। আসতে আজ্ঞা হোক—বাড়ীর ভিতরে ডাকৃছেন।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ ও অন্তঃপুরে প্রবেশ)

ভৃ। আপনি এইখানে বসুন, আমি খবর দিয়ে আসি

[প্রস্থান।

(চন্দ্রাবতীর ও ক্ষেপীর মা'র দুই পাশে পর্দ্দার আড়ালে অবস্থিতি। প্রভাবতীর ক্ষেপীকে লইয়া প্রবেশ)

(শ্রীধরের চৌকি হইতে উত্থান)

চ। (স্বগত) পাশ থেকে ভাল দেখতে পাচ্ছিনে- তবু ঢের বদল মনে হচ্ছে। (প্রভাবতীর ক্ষেপীর অবগুণ্ঠন মোচন) (চন্দ্রা হাসিয়া) একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন যে, ভাবছেন বুঝি এতটা বদল কি ক'রে হোল! এ ছলনা আর ভাল লাগছে না, ইচ্ছা করছে, এখনি কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

শ্রী (সবিস্ময়ে) ইনি কে?

প্র। (কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া) চিন্‌তে পারছ না, এই কবছরের মধ্যেই ভুলে গেলে?

শ্রী। ইনি কি চন্দ্রা?

ক্ষে। আম্মি তোয়ারি—অস,—পান।—

শ্রী। ইনি বলেন কি—(স্বগত) কথাগুলো যে চেহারার চেয়ে আরো ভয়ানক!

প্র। (মৃদুস্বরে) চুপ কর্!

ক্ষে। আম্মি তোয়া বই জাঁম্মিনে।

শ্রী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এই প্রেমালাপ! এ যে বিছার কামড়! (প্রকাশ্যে) দোহাই আপনাদের—আমি শশীদাদা নই—আমার নাম শ্রীধর, ভুল ক'রে এ বাড়ীতে এসে পড়েছি।

(ক্ষেপীর মা'র প্রবেশ)

মা। তা যেই হও বাছা, আমার মেয়ের সঙ্গে কিন্তু তোমার পাকা ক'রে যেতে হবে।

প্র। (হাসিয়া) আবার এ একটা নতুন চাতুরী দেখছি!

শ্রী। আজ্ঞে না, আমি ঠিক বলছি, আমি শশিনাথ নই,—আমি শ্রীধর। আমি গিয়েই তাঁকে পাঠিয়ে দেব। (প্রস্থানোদ্যত)।

মা। সে যদি না আসে, তা হ'লে আমি কিন্তু বাছা তোমাকে ছাড়ব না।

শ্রীধর। কি গ্রহ! আমি চললুম।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—•—

(শশিনাথের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ)

শ। কি সর্ব্বনাশ! ঐ শ্রীধরের মালতী! দেখে ত নয়ন জুড়িয়ে গেল! আঃ ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে তবু দম ছেড়ে বাঁচি। রাতটা তবুও দুঃস্বপ্নেই কেটেছে। নিশ্চয়ই শ্রীধর জেনে শুনে মৎলব ক'রে আমাকে সেখানে পাঠায়েছিল! হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কি না অমনি কচি খোকাটি; যা হাতে দেবে, তাই মুখে পুরে ফেলব। দাঁড়াও না, ভায়াকে একবার মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে সয়তানের নাম করতে সয়তান এসে হাজির।

(শ্রীধরের প্রবেশ)

শ্রী। দেখ শশী দাদা—এই রকম কাজটা কি তোমার ঠিক হয়েছে?

শ। কি সেয়ানা ছেলে গা, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা! আমাকে তেমন বোকা পাও নি ভায়া যে, আমি তোমার বোঝাটি অমনি ধাঁ ক'রে ঘাড়ে চড়িয়ে নেব।

শ্রী। বটে! তুমি নিজে ছোট মেয়ে চাইলে, আমি তোমাকে পথ বাৎলে দিলুম মাত্র, আমি ত আর তোমাকে সাধতে যাই নি।

শ। ঐ তোমার ছোট মেয়ে! গড় করি তোমার ছোট মেয়ের পায়! তা হ'লে আমার চন্দ্রা কি অপরাধ করলে? এত এত চেহারা দেখেছি, এমন চেহারা কারো দেখি নি।

শ্রী। আর ঐ তোমার রূপবতী বিদ্যাবতী যুবতী চন্দ্রাবতী! মূর্ত্তি দেখেই ত চক্ষুস্থির! নিজে বিয়ে করবে না, কেউ ত গলায় বেঁধে দিত না, আমাকে কেন বিপদে ফেলা!

শ। দেখ, আর যা বলবার বল, কিন্তু এ রকম মিথ্যা অপবাদ দিলে, আমি তোর গলা টিপে ধরব। চন্দ্রা রূপাবতী না ত কি? আমি তাকে ৫।৬ বছর আগে দেখে গেছি, পরমা সুন্দরী মেয়েটি, আর দু'দিনে তোর কথাতেই সে বদলে যাবে?

শ্রী। (ঘুসি বাগাইয়া) শর্ম্মা ভয় পাবার পাত্র নন, ঘুসি-বিদ্যায় স্বয়ং দ্রোণাচার্য্যের ছাত্র। এস না, কে কার গল-টিপে দেয় দেখা যাক্। আমিও মালতীকে ছেলেবেলায় দেখেছি; তখন ত ভালই দেখতে ছিল। এই ক'বছরে সে যদি এত বদলে গিয়ে থাকে, তা হ'লে তোমার চন্দ্রা আর বদলাতে পারে না? তোমার চন্দ্রাবতী একশবার, হাজারবার, লক্ষবার কুরূপা কদাকারা।

শ। মিথ্যাবাদী, ব্ল্যাগার্ড, দাঁড়াও না দেখিয়ে দিচ্ছি—

(উভয়ের ঘুসাঘুসি)

শ। কেমন—এইবার।

শ্রী। কেমন, এখন!

শ। এই দেখ না, কেমন টের পাইয়ে দিচ্ছি। (শ্রীধরকে দেয়ালে ঠেসিয়া ধরিয়া) কেমন, আর মিথ্যা বলবি? বল চন্দ্রা সুন্দরী—তবে তোকে ছাড়ব।

শ্রী। এই চোখে দেখে এসেছি দাদা, প্রাণ যায়, সে ও স্বীকার, তবু তোমার চন্দ্রাকে চন্দ্রবদনী বলতে পারব না। চন্দ্রা একশবার খাঁদানাকী, টেরানয়নী—

শ। (শ্রীধরকে ছাড়িয়া) আর তোমার মালতী চঞ্চুনাসা, মৃগনয়নী—কেমন?

শ্রী। চঞ্চুনাসা নয়, তার ছেলেবেলায় সুনাসা, সুনয়নী, ফুল্লাধরী ছিল বটে কিন্তু—

শ। এ কি তুমি চন্দ্রার কথা বলছ নাকি?

শ্রী। না, আমি মালতীর কথাই বল্‌ছিলুম, চন্দ্রা কোটরচোখী, ঢিলকপালী, পেঁচামুখী—

শ। হাঃ হাঃ ভায়া, আমি মালতীর যে রকম চেহারা দেখে এসেছি, তুমি দেখছি ঠিক সেই রকম বর্ণনা করছ। চন্দ্রাকে দেখতে গিয়ে তুমি মালতীকেই দেখেছ; নিশ্চয়ই তুমি ভুল-বাড়ীতে গিয়েছিলে।

শ্রী। তুমি যে বাড়ীতে বলেছিলে, আমি ঠিক সেই বাড়ীতে গিয়েছিলুম। ১০ নম্বর হাড়কাটা গলী ত?

শ। হ্যাঁ ঠিক, ঐ নম্বরই ত বটে। তবে চন্দ্রাকে দেখ নি, আর কাউকে দেখে থাকবে।

শ্রী। নিশ্চয়ই চন্দ্রা। তার দিদি তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন, তোমাকে ভেবে নানা কথা কইলেন। মেয়েও বড় বটে—দেখা হতেই প্রেমালাপ—

শ। তা হ'তেই পারে না, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারিনে। চন্দ্রা লাজুক, নম্র, সুশীলা; এ ত আর তোমার মালতী নয় যে, দেখা হ'তেই আকর্ণ বিস্তার ক'রে হাসবে। তার সেই বদনব্যাদানী রূপ দেখেই ত আমি দে ছুট।

শ্রী। অত কথায় কাজ কি, এখনি চল, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হোক।

শ। সে ভাল কথা, চল। তোমার সমস্ত কথাই আমার ধাঁধা ব'লে মনে হচ্ছে। চন্দ্রা কি এই ক'বছরে সত্যিই এত বদল হয়েছে?

শ্রী। আশ্চর্য্য কি! যদি মালতী বদলে থাকে ত চন্দ্রাও বদলাতে পারে না? অমন ডাক্তারি কেস ত দু' একটা শোনা গেছে।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ ও কিছু পরে পুনঃ প্রবেশ)

শ্রী। এই বাড়ী ত?

শ। হ্যাঁ, এই বাড়ীই বটে! আচ্ছা, তুমি একটু বাইরে দাঁড়াও, আমি ধাঁ ক'রে ভিতরে গিয়ে একবার রহস্যখানা ভেদ ক'রে আসি!

[প্রস্থান।

শ্রী। আমিও কেন এই তক্কায় শিশির বাবুর বাড়ীটা একবার ঘুরে আসি না। একবার নিজের চোখে না দেখলে শশীদাদার কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিনে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শিশির বাবুর বহির্ব্বাটীর একটি কক্ষে একখানি চৌকিতে মালতী আসীনা, তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর পুস্তক একখানি উন্মুক্ত।

মা। (পড়িতে পড়িতে মুখ উঠাইয়া) কই এখনো মেম এলেন না, আমার ত এ গল্পটা পড়া শেষ হয়ে গেল, যে যে জায়গাগুলির মানে বুঝতে পারি নি, তিনি এসে বুঝিয়ে দেবেন। এইবার বুঝি আসছেন, পায়ের শব্দ পাচ্ছি। (উঠিয়া দ্বারের নিকট আগমন)

(শ্রীধরের প্রবেশ)

শ্রী। এই কি শিশির বাবুর বাড়ী?

মা। (স্বগত) এ কি! ইনি কে?

শ্রী। এই শিশির বাবুর বাড়ী?

মা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রী। (স্বগত) দিব্য মেয়েটি, এটি কিন্তু মালতী হ'লে মন্দ হয় না। ফন্দী ক'রে জেনে নিতে হচ্ছে, মেয়েটি কে? (প্রকাশ্যে) আমি বৌদিদির তল্লাসে এখানে এসেছি, তাঁর আজ এখানে আসার কথা ছিল, এসেছেন কি?

মা। বৌদিদি!

শ্রী। শ্রীমতী ললিতাদেবী, আমার দাদার সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়েছে। অনেক দিন আসি নি, তাই চিনতে পারছ না দেখছি।

মা। (সলজ্জে) ও দিদি! কই, তিনি ত আজ আসেন নি।

শ্রী। (স্বগত) আমার অনুমানটা দেখছি ঠিক্ হয়েছে। মালতীই বটে। আমি ভেবেছিলুম, ১৪।১৫ বছরের মেয়ে নিতান্তই ছোট হবে; কিন্তু তেমন ছোট ত মোটেই নয়, আর বড় হয়ে কি সুন্দর দেখতে হয়েছে! (প্রকাশ্যে) তবে কি তাঁর জন্য একটু অপেক্ষা করব? তিনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।

মা। (অবনত মস্তকে পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনি তা হ'লে বসুন, আমি মাকে খবর দিয়ে আসি।

শ্রী। তোমার খবর দিতে হবে না, আমি নীচে থেকেই তোমাদের চাকরকে দিয়ে তাঁকে খবর পাঠিয়েছি। তোমার হাতে ও বইখানি কি, জিজ্ঞাসা করতে পারি?

মা। ল্যাম্বশ টেল।

শ্রী। ইংরাজীও পড়? ইংরাজী কোনও কবিতার বই পড়েছ?

মা। মুরের একখানা ছেঁড়া বই কুড়িয়ে পেয়েছিলুম—ভাল বুঝতে পারিনে।

শ্রী। যদি বল, আমি বুঝিয়ে দিতে পারি আমাকে নিতান্ত পর ব'লে মনে হচ্ছে কি? ছেলেবেলায় ত কত এসেছি।

(মালতীর নীরবে সলজ্জ মৃদুহাস্য)

শ্রী। (স্বগত) এই লজ্জার হাসিটি কি মনোহর। যত দেখছি, একটি কবিতা যেন মূর্ত্তিমতী হ'লে মনে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) বাঙ্গালা কবিতা কি বেশী পড়?

মা। উপন্যাস, কবিতা আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রী। বল দেখি, এই কবিতাটি কোথায় আছে?—

হেরিলে ও সুধাময়ী প্রতিমার রূপ,
চাঁদের আলোক স্নিগ্ধ ঝরে আঁখিপরে,
উঠিলেন পদ্মাসনা সমুদ্রমন্থনে,
যে মোহিনীরূপে,—আজি তাহাই নেহারি।

মা। (লজ্জিতভাবে) যাই, আমি মাকে খবর দিয়ে আসি। [প্রস্থান।

শ্রী। উঃ, কি ভুলই করেছিলুম! আমি ত আর কিছুতেই একে শশীদাদাকে দিতে পারব না।

(মালতীর মাতার প্রবেশ)

শ্রী। নমস্কার!

মা। বেঁচে থাক বাছা, বাড়ীর ভিতরে চল। তোমাকে দেখে যে কত আহ্লাদ হচ্ছে। কাল তোমার আসার কথা ছিল—না?

শ্রী। আসতে পারি নি।

মা। তোমার শশীদাদাকে পাঠিয়েছিলে?

শ্রী। (স্বগত) সত্যি তা হ'লে শশীদাদা কাল এসেছিলেন। (প্রকাশ্যে) হাঁ, আমার হয়ে তাঁকে দেখে যেতে বলেছিলুম।

মা। বাছা, সে কথা আর কি বলব? তোমার বৌদিদি মালতীর বদলে ক্ষেপীকে দেখিয়েছিলেন।

শ্রী। তাই বুঝি? ওঃ, এখন সব বুঝিছি।

মা। তা এস বাছা বাড়ীর ভিতরে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। বাবুকে এখানে আসতে দেখে ও-বাড়ীর লালাই এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।

শ্রী। দেখি।

[চিঠি দিয়া ভৃত্যের প্রস্থান।

শ্রী। (পত্র পাঠ করিয়া) এ কি ব্যাপার! এ যে উকীলের চিঠি!

মা। চিঠিখানা পড়ে যে মুখ শুকিয়ে গেল, কি চিঠি বাবা?

শ্রী। কি সর্ব্বনাশ! হরিহর বাবুর মেয়েকে পাকা দেখা দেখেছি, এখন যদি বিয়ে না করি ত তিনি মকর্দ্দমা আনবেন, এই হচ্ছে নোটীস।

মা। ও মা, কোথায় যাব গো! বড়ঠাকুরের কি মতিচ্ছন্ন ধরেছে? তোমার বৌদিদির বুদ্ধির দোষেই কিন্তু এটি ঘটলো।

শ্রী। কিন্তু আমি ত সে মেয়েকে মোটেই দেখি নি—দেখেছেন শশীদাদা। তা হ'লে এ নোটীস ত আমার হ'তে পারে না; আঃ, বাঁচা গেল! আমি একবার এখনি তাঁর কাছে যাই, আবার কা'ল আসব। নমস্কার।

মা। কি গেরো! যদি বা অনেক সাধ্য-সাধনায় বাছা এল, আসতে না আসতে এই বিপদ্। যাই একবার ক্ষেপীর মার কাছে। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

(জগচ্চন্দ্রের বাড়ীর দ্বারদেশে শশিনাথের প্রবেশ)

শ। যেতে লজ্জা করছে! নাঃ, যেন কিছুই হয় নি,—এমনি ভাবে যাওয়াই ভাল। খবর না দিয়েই হঠাৎ যাই,—গিয়ে পড়িগে। [নিক্রমণ।

(গৃহমধ্যে হারমোনিয়ম বাজাইয়া চন্দ্রাবতীর গান। শশিনাথ গৃহের পর্দ্দার আড়ালে আসিয়া দণ্ডায়মান)

শ। চন্দ্রা গান গাচ্ছে, এখানে দাঁড়িয়ে শুনি।

গান

চন্দ্রা—

আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে।
সুখ বা দুঃখ দিতে, কে আছে ধরণীতে,
একেলা পড়ে আছি মরুস্থলে!
আমারো আঁখি ভাসে কেন গো জলে॥
আমিও কোন ভুলে, মালিকা গাঁথি ফুলে
পরাতে মধু রাতে কাহার গলে!
আমিও রচি গান, ললিত নব তান,
নিভৃতে গাহি মরি, কিসের ছলে!
আমিও কি আশায়, বিজনে সাজি হায়,
বাসনা ব্যথা বহি মরমতলে!
আমিও কাঁদি হাসি, কাহারে ভালবাসি,
মোরে কে মনে করে আপনা বলে!
আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে।

শ। সত্যই কি আমি এতদিন ভুলে ছিলুম! ভারী আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।

(চন্দ্রার নিকটে আগমন)

চ। (সবিস্ময়ে গান বন্ধ করিয়া)—এ কি?

শ। থামলে কেন?

চ। আপনি এতদিন পরে?

শ। এতদিন! আমার ত মোটেই এতদিন ব'লে মনে হচ্ছে না। যেন এই কা'ল তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছি, আর আজ ফিরে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি ত বিশেষ বদল হও নি।

চ। আপনি ত বদ্‌লেছেন।

শ। (গোঁপে তা দিয়া) গোঁপটা বুঝি বেড়েছে! কিন্তু আমি ত ছেঁটে ছুটে ঠিক সমানটিই রাখতে চেষ্টা করি। যা হক্, তবু ত চিনেছ?

চ। আমার চেনা আশ্চর্য্য কি! আপনি যে চিনেছেন, সেই ঢের! বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আমি যাই, দিদিকে ডেকে আনি।

শ। না না, এখন যেয়ো না, একটু ব'স, তোমার কাছে আমার মাপ চাইবার ঢের আছে।

চ। সে সব হবে এখন—আমি যাই, দিদিকে ডেকে আনি! আর আপনার জন্য চা গুছিয়ে আনি। আপনি ত আগের মত চা ভালবাসেন?

[প্রস্থান।

শ। আতিথ্যের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি। সর্ব্বগুণে গুণবতী। আমি দেখছি নিতান্তই বাঁদর, তাই ভেবে নিয়েছিলুম, আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষিতা হ'লেই অকর্ম্মা হয়। এমন রত্ন কি না আমি শ্রীধরকে দিতে যাচ্ছিলেম। কি ভুলই করেছি। ভাগ্যিস আজ এলুম।

(প্রভাবতীর প্রবেশ)

প্র। এই যাঃ, আগেই চন্দ্রাকে দেখে ফেলেছে, খবর দিয়ে এলে আর দেখতে দিতুম না।

শ। মাপ করতে আজ্ঞা হোক্!

প্র। কাল তোমার বন্ধুর উপর দিয়েই চোটটা গেছে, আর আজ তোমাকে দেখে রাগটাও পড়ে গেল।

শ। বটে! বন্ধুকে কাকে দেখিয়েছেন?

প্র। একটি অখণ্ড অবধ্যে মেয়ে আছে, যাকে কেউ নিতে চায় না। দেখছিলুম, যদি তোমাকেই তাকে গতাতে পারি। বড় মেয়ে—শিক্ষিতা মেয়ে চাও না, বিলাত গিয়ে, নূতন রুচি নিয়ে এসেছ, ভাবলুম রুচির দৌড়টা একবার দেখা যাক্।

শ। তাই বটে! মেয়ে দেখে সে ত আমাকে ভারী বিপদে ফেলেছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। আজ্ঞে, শ্রীধর বাবু আপনাকে খবর দিতে বল্লেন।

শ। ওঃ, শ্রীধর! (স্বগত) তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে এসেছি, সেটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। এতক্ষণ ধ'রে সে অপেক্ষা করছে—চ'লে যায় নি? কি পেরো! (প্রকাশ্যে) বল, আমি এখনি যাচ্ছি।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

(চন্দ্রার চায়ের থালা হস্তে প্রবেশ ও থালা টেবিলে রাখিয়া এক পেয়ালা চা শশীর হস্তে প্রদান)

শ। (চা খাইতে খাইতে) এতদিন পরে চা খেয়ে আরাম হোল!

(চন্দ্রাবতী ও প্রভাবতীর হাস্য)

প্র। এত দিন যেন কেউ এখানে এসে চা খেতে বারণ করেছিল! নিম্‌কি খেতে ভালবাস, দু একখানা খাও (নিম্‌কি প্রদান)

শ। (স্বগত) যেতেও ইচ্ছা করছে না, কিন্তু না গেলে যদি সে এসে পড়ে, আর চন্দ্রাকে দেখে ফেলে, ভয়ও করছে।

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

ভৃ। শ্রীধর বাবু বল্লেন, আপনি যদি এখন তাঁর সঙ্গে নীচে গিয়ে দেখা করতে না পারেন—ত তিনি এখানেই এসে দেখা করতে চান।

শ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! সেটি হচ্ছে না। (চায়ের পেয়ালা টেবিলে রাখিয়া) আমি চল্লেম দিদি, তাকে বিদেয় ক'রে এখনি আসছি।

প্র। সে কি কথা, চা-টা খেয়ে যাও! মিষ্টিগুলো সব একটা ক'রে চেকে দেখ।

শ। এসে খাব, আমি এখনি আসছি।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

শ্রী। আমরা চল ছাদে বসি গে—চাকরকে ব'লে দিই, শশী এলে বলবে, আমরা ছাদে আছি।

[প্রস্থান।

(শ্রীধর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া পায়চারি করিতেছে, শশীর প্রবেশ)

শ। ভায়া, তুমি যা বলেছিলে, একেবারে সত্যি! খাঁদানাকী কোটরচোখী চিলকপালী প্যাঁচামুখী একেবারে হুবহু ঠিক! আমি ত দেখে অবাক্, চন্দ্রা এমন বদলাবে, তা আমি স্বপ্নেও মনে করতে পারি নি।

শ্রী। (স্বগত) তা ত আমি আগেই জানতুম —নইলে আমাকে গছাবার চেষ্টা! এখন মালতীর দিকে যে দৃষ্টি না দিলে বাঁচি (প্রকাশ্যে) সে কথা এখন থাক, একটা—

শ। সে কথা থাকলে চলে কই। আমাকে মাপ কর ভাই, আমার কর্ম্মফল আমি বহন করব —তোমাকে আর সে জন্য ভীত হ'তে হবে না।

শ্রী। সে জন্য আমি ভীত হচ্ছি নে দাদা,— একবার এই নোটীশখানা দেখ দেখি।

শ। (নোটীশ পাঠ করিয়া) পড়লুম ; হরিহর বাবু তোমার নামে মোকর্দ্দমা—

শ্রী। আমার নামে? তোমার নামে বল! আমি ত আর সেদিন শিশির বাবুর বাড়ী যাইনি— আর হরিহর বাবুর মেয়ে যে কেমন, তা এ চর্ম্মচক্ষে দেখিও নি।

শ। তাতে কি এল গেল! আমি ত তোমার হয়েই দেখেছি,তারা ত আমাকে তুমি বলেই জানে।

শ্রী। তা জানলে কি হবে? যে মেয়ে দেখেছে, সে যে শ্রীধর নয়, জলজ্যান্ত শশিনাথ, তার ত অকাট্য প্রমাণ পড়ে রয়েছে।

শ। এ আইনের কথা ভায়া- অকাট্য প্রমাণ ব'লে অত আস্ফালন করলে চলবে না,—আমি তোমার হয়ে act করেছি মাত্র—অতএব এ নোটীশ আমার বর্ত্তাতে পারেই না ; তুমি বল্লেই ত আইন উলটে যাবে না।

(একজন চাপরাসীর প্রবেশ)

চা। সেলাম, আপনার নামে একখানা চিঠি আছে।

শ। চিঠি! কই দেখি?

[পত্র দিয়া পুনরায় সেলামপূর্ব্বক চাপরাসীর [প্রস্থান।

শ। এ কি ব্যাপার! আমার নামেও যে ঐ নোটীশ।

শ্রী। (মহা হর্ষে) দেখি দেখি! তা বেশ হয়েছে! দুজনকে দিয়েছে! তবু ভাল, এখন ব্যারিষ্টার সাহেব, এর প্রতিবিধান?

শ। কিন্তু দুইজনকেই কেন দিলে—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে।

শ্রী। আমি পেরেছি—হো হো হো!

শ। আমার পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে উঠেছে—আর তোমার এখন হাসি! কি বুঝেছ শুনি।

শ্রী। তুমি যে মেয়েকে দেখেছ—আমি তাকেই দেখেছি। এ যাত্রাতেও আমরা দু'জনে এক ঘাটেই জল খেয়েছি।

শ। তাই নাকি! আমাকে জব্দ করার জন্য দিদিমণি সেদিন এক কুরূপার অবতারণা করিয়েছিলেন বটে!

শ্রী। আর আমাকে জব্দ করার জন্য বৌদিদিও ঐ একই কার্য্য করেছিলেন। অমন মেয়ে দুটি আর কে কোথায় পাবে—বেশ বোঝা যাচ্ছে, দু'জনে ঐ একটি টোপই বঁড়শীতে গেঁথেছিলেন।

শ। ঠিক ঠিক! এইটেই প্রকৃত রহস্য। এখন কি করা যায়? এ জন্য যদি কোর্টে দাঁড়াতে হয়—

শ্রী। হো হো হো!

শ। আবার হাসি! এই বিপদে তোমার এত হাসি আসে কোথা থেকে, তাও ত বুঝতে পারিনে।

শ্রী। আমার একটা উপায় মনে এসেছে—হো হো হো!

শ। হাসিটা রেখে এখন উপায়টা বলবে?

শ্রী। ভোলাদাদাকে বর জুটিয়ে দেওয়া যাক। যেমন দেবা, তেমনি দেবী মিলবে—তারাও বর পেয়ে খুসী হবে,—আর আমরাও রেহাই পাব।

(উভয়ের হাস্য)

শ। বেশ বেশ! অতি উত্তম—অতি উত্তম! আঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! যাও হে, তবে এখন শীঘ্র যাও, সব বন্দোবস্ত করগে।

শ্রী। আর তুমি সেই প্যাঁচামুখীর কোটরে বন্দী হবে, বুঝেছি। দাদা সব বুঝেছি। (হাস্য)

খ। (স্বগত) মজালে দেখছি, চন্দ্রাকে যদি দেখতে চায়, তবেই মুস্কিল! তা হ'লেই ত আমাদের দু'জনের আবার চুলোচুলি বাধবে। তার চেয়ে ওর যাতে মালতীর দিকে মন যায়, সেইটে করতে হবে। (প্রকাশ্যে) দেখ শ্রীধর, মালতী আগে ভাল দেখতে ছিল বলছ—তা তাকে একবার দেখই না। তোমার যদি একলা যেতে লজ্জা করে—আমিও সঙ্গে যাব।

শ্রী। (স্বগত) সেটি হচ্ছে না দাদা—আমার মালতীকে আমি তোমাকে দেখাচ্ছিনে। তোমার চন্দ্রা কেন যতই রূপবতী হোন না,—মালতীকে একবার দেখলে সে রূপ তোমার চোখে লাগবে না। (প্রকাশ্যে) যাও দাদা, তুমি চন্দ্রাকে ভাল ক'রে দেখগে। আমার এখন মালতীকে দেখতে যাবার সময় নেই, আমি যাই—ভোলাদাদার বিয়ের বন্দোবস্ত করিগে। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

—:০:—

ললিতা ও শ্রীধর।

শ্রী। তুমিই ত এটি ঘটালে!

ল। ঘটিয়েছি ঘটিয়েছি, তোমার সেজন্য ভাবনা কি? ভোলাদাদার উপর চালান দিলেই ত হোল।

শ্রী। তাদের তাতে মন উঠবে ত?

ল। না, উঠবে না! ঐ ত মেয়ের শ্রী! ভোলা দাদাকে পেলে তারা বত্তে যাবে। মেয়ে পার করতে পারলেই ভাগ্যি ব'লে মানবে। এই যে ভোলাদাদা।

(হুঁকা হস্তে গান গাইতে গাইতে
ভোলাদাদার প্রবেশ)

ভ্রাদায় হে তোমার,
যদি উর্দ্ধে উঠতে ইচ্ছা হয় একবার—
তবে গঞ্জিকা রঞ্জিকা পিয়ে,
তার সঙ্গে ভাঙ মিশিয়ে,
খেয়ো একবার, দাদা, খেয়ো একবার।
বেজায় গাঁজায় ধূম চড়িয়ে,
দম কসিয়ে ভোঁ হইয়ে,
যাবে তুমি হিমালয়,
কৈলাস হবে তোমার আলয়,
বাসা ছেড়ে ব্যোম ভোলানাথ করবে হাহাকার॥

শ্রী। বড় যে স্ফূর্ত্তি দাদা! পরের সর্ব্বনাশ ক'রে এখন গাঁজায় দম টানবে না ত কি?

ভো। সর্ব্বনাশ! আঁ্যা, আঁ্যা, সর্ব্বনাশ!

শ্রী। মহা সর্ব্বনাশ! আমার কনেটিকে আগে থাকতে দেখে তাকে এমন মোহিত ক'রে এসেছে যে, সে আর—

বৌ। তোমা বই কা'কে জানে না।

ভো। (নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সত্যি নাকি? তা আমার কি দোষ ভায়া! সেটা বিধাতার দোষ।

বৌ। তা ত সত্যি! এখন কলকেটা নামাও।

ভো। কলকেটা নামাব? কেন—কেন?

শ্রী। কেন আবার কি? বর সাজতে হবে, গোঁপটা কামাতে হবে।

ভো। বর সাজব! হাঃ হাঃ, সে ত উত্তম কথা! রাগ করবে না ত?

শ্রী। না দাদা, আমি Martyr। নিজেই পুরুত হয়ে তোমাদের হাতে হাতে বেঁধে দেব। যাই ক্ষুরটা নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ভো। ক্ষুর! ভায়া আত্মহত্যা করবে নাকি?

বৌ। সে ভাবনা পরে হবে, এখন কলকেটা রাখবে?

ভো। সেটি পারছিনে দিদি, তা হ'লে প্রাণটি যাবে।

বৌ। সে ত আগেই গেছে, যে দিন তাকে দেখেছ সে দিনই।

ভো। হা, হ ।!

প্রাণ ত অস্ত হোল আজ আমার, কমল আঁখি
একবার হৃৎকমলে দাঁড়াও দেখি।

(শ্রীধরের ক্ষুর লইয়া প্রবেশ)

শ্রী। এখন আগে ত গোঁপটার অস্ত হোক।

(জোর করিয়া হুঁকা কাড়িয়া লইয়া তাহা
গৃহকোণে রাখিয়া ভোলাদাদাকে
কামাইতে উদ্যত)

ভো। আঁ্যা আঁ্যা, কর কি দাদা, কর কি?

শ্রী। এই চৌকিতে ব'স বলছি—নইলে এই ক্ষুর গলায় বসিয়ে দেব।

ভো। ও কি কথা, এ'কেই কি বলে বর সাজা—আগেই গলায় ফাঁস।

শ্রী। ফাঁস নয়, একেবারে ক্ষুর দাদা ক্ষুর।

বৌ। আমি যাই, আল্‌তা পাউডার আনি।

ভো। আলতা পাউডার? কেন দাদা?

শ্রী। দেখতেই পাবে।

(ললিতার পুনঃ প্রবেশ)

শ্রী। আমার হয়েছে, বৌদিদি এবার সাজাও।

ভো। আল্‌তা পাউডার! হাঃ হাঃ, বিবি সাজতে হবে?

(পাউডার মাখাইতে মাখাইতে) বিবি-বর দেখলে ক'নের চোখে পাতা আর বুজবে না, একবার চেহারাখানি দেখ দেখি দাদা।

(হস্তে আয়না প্রদান)

(আয়না হস্তে করিয়া ভোলানাথের গান ও নৃত্য)

তোম তোম তানা না না,
আহা মরি কি কারখানা,
চতুরঙ্গে বিবিয়ানা, বাজা রে গা।
শিরেতে সিন্দুর ছি ছি—কেবা পরে মিছি মিছি,
ছাঁটা কেশে আটা থর সা সা নি নি সা!
নাকে নাই নথ মুক্তা,
মুখে নাই পান দোক্তা,
বাঁকা হাসি ফাঁকা ঠোঁটে বাহা কি রে বা!
ঢাকা শান্তিপুরে ফেল,
ঘরে ঘরে লেশ ভেল;
ঝিলমাৎ গসলেনে, তেরে কেটে তা!
পায়ের আল্‌তা গালে ঠোঁটে,
মল নীরব জুতার চোটে,
করে বাজে পিয়ানোতে ঠুং ঠাং ঠা!
কলিকালের এমনি মেয়ে,
হার মেনে যায়, বি-এ, এম-এ,
বিয়ের তকা কেবল ফক্কা বলিহারি বা।

শ্রী। বৌ দিদি, তোমাকে গাল দিচ্ছে।

বৌ। আমরা কেন বিবি হব—তোমার বৌ বিবি হোক্। আমার সীঁথিতে দেখ সিঁদুর টক্ টক্ করছে—আমি লেশও পরিনে, গসনেলও মাখিনে—তোমার বিয়ের দিন ক'নেকে ভেল পরিয়ে ঐ গান গেয়ে নৃত্য করো এখন। এখন চল, তারা বরের অপেক্ষায় হা-হুতাশ করছে।

(তুড়ি দিয়া গান গাইতে গাইতে ভোলার প্রস্থান ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধর ও ললিতার গমন।

শেষ দৃশ্য

—:*:—

স্ত্রী-আচারস্থল মালতীর পার্শ্বে শ্রীধর এবং চন্দ্রাবতীর পার্শ্বে শশিনাথ দণ্ডায়মান।

(বরণডালা প্রভৃতি হস্তে লইয়া প্রভাবতী, ললিতা এবং অন্যান্য যুবতীগণের প্রবেশ এবং গান গাইতে গাইতে বরকন্যা-দিগকে প্রদক্ষিণ)

প্রভা ও ললিতা।—

যে তোমারে চায় ওগো আদরে লন তায়,
ফিরালে আর নাহি পাবে—শেষে হায় হায়।

যুবতীগণ।—

ওগো সেই ফুটাবে হৃদয়কুঞ্জে
সুগন্ধফুল পুঞ্জে পুঞ্জে,
মন অলি উঠবে গুঞ্জে মধুর মলয়বায়।

প্রভা ও ললিতা।—

যে তোমারে চায় ওগো আদরে লও তায়,
ফিরালে আর নাহি পাবে শেষে হায় হায়।

সকলে।—

তারি চোখে জ্বলবে তারা
অধর-পাতায় পুলকধারা,
ভূলোক হবে দ্যুলোক পারা প্রেমের মহিমায়।
যে তোমারে চায়, আদরে লও তায়,
ফিরালে আর নাহি পাবে—শেষে হায় হায়।

(গান গাইতে গাইতে পটক্ষেপণ ও রঙ্গমঞ্চে ভোলাদাদার প্রবেশ)

(নেপথ্যে বাঁশরীর তান উত্থিত)

ভো। তারা এখন ফুলের মালা পরুক, আর শুভদৃষ্টি করুক, এইবার পাতা সাজান'র বন্দোবস্তটা কি হচ্ছে দেখে আসি।

(তুড়ি দিয়া গান)

মিশ্র-সাহানা।

বাজা রে বাঁশরী বাজা!
বরকন্যা পরে কুসুমের মালা,
কন্যাকর্ত্তা তোরা ত্বরা এই বেলা,
বরযাত্র তরে বেশ ভাল ক'রে পাতাগুলো সব সাজা।
এই যে নাচওয়ালীরা আসছে—

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

নর্ত্তকী। কি দাদাঠাকুর, কি গান হচ্ছে?

ভো। তোমরা বুঝি বরকন্যার মজলিসে বাড়ীর ভিতরে নাচতে যাচ্ছ? তা এখানেই আরম্ভ কর না!

প্র, নর্ত্তকী। তোমার গানটি গাও দাদাঠাকুর আমরা নাচি!

দ্বি, নর্ত্তকী। গানটি শিখে নিয়ে বরকন্যার কাছে গাব!

ভো। হ্যা—হ্যা—তা হ'লে ভাল, আমাকে যে তারা বাড়ীর ভিতরে যেতে দিবে না, নইলে আমিই গেয়ে দিতুম। যে দিন আমার বিয়ে হবে, সে দিন ত আর আমাকে বাড়ীর ভিতরে না নিয়ে গেলে চল্‌বে না, হ্যা—হ্যা—হ্যা!

প্র, নর্ত্তকী। তোমার বিয়ে হবে নাকি? কবে দাদাঠাকুর?

ভো। এই পোষ মাসের পিঠে-পার্ব্বণের দিনে।

দ্বি, নর্ত্তকী। কি বল দাদাঠাকুর! সে দিন কি কারো বিয়ে হয়?

ভো। তবে বুঝি চড়ক সংক্রান্তির দিনে?

প্র, নর্ত্তকী। দাদাঠাকুরের কথার শ্রী শোন! তাও নাকি হয়!

ভো। হয় গো হয়। মেয়ে অরক্ষিতা হ'লেই সব কালেই বিয়ে হয়। আমি ঠিক শুনে এসেছি, একটা কোন পরবের দিনে আমার বিয়ে হবে। তোমরা বল্লেই ত আর আমার বিয়ের দিন ওল্টাবে না।

দ্বি, নর্ত্তকী। তা দাদাঠাকুর, তোমার বিয়েতে যেন আমরা ফাঁকে না পড়ি।

ভো। অবিশ্যি, অবিশ্যি। তোমরা না এলে আমার নৃত্যটা দেখবে কে? মনের ইচ্ছাটা এই রকম যে, গিন্নীকে যদি রাজি করতে পারি ত তাকে শুদ্ধ নিয়ে নাচব। গজেন্দ্রগামিনী গো গজেন্দ্রগামিনী, নাচলে বেশ দেখাবে।

(সকলের হাস্য)

(ভোলার গান ও নর্ত্তকীদের নৃত্য)

ভো।—

বাজা রে বাঁশরী বাজা!
বরকন্যা পরে সুমঙ্গল মালা,—

সমস্বরে।—

কন্যাকর্ত্তা তোরা ত্বরা এই বেলা,
বরযাত্র তরে বেশ ভাল ক'রে
পাতাগুলি সব সাজা।

ভো।—

উহারা করুক্ সুমঙ্গল দৃষ্টি,

সমস্বরে।—

মোরা চাহি সবে সরাভরা মিষ্টি
মেঠাই সন্দেশ, রসগোল্লায় বেশ,
পানতুয়া খাসা খাজা!

ভো।—

বাজা রে সানাই বাজা!
উহারা দেখুক আননের আলো—
মোর পাতে দাদা ভাল ক'রে ঢালো,

সমস্বরে।—

কালিয়া পোলাও লুচি কোপ্তা চপ,
গরম্ গরম্ ভাজা।

ভো।—

বাজা ঢাক ঢোল বাজা।
ওরা পান করে সৌন্দর্য্য-সুধা,—
আমার তাহাতে আরো বাড়ে ক্ষুধা,
আস্ত-রুইমুড়ো, আন হেথা খুড়ো,
বুড়োটিরে দিও ভাজা।

সমস্বরে।—

বাজা রে নহবৎ বাজা।
পুরীতে হবে না, আন দাদা হাঁড়ি,
রয়ে বসে চাল নাহি তাড়াতাড়ি,
দই ক্ষীর আর ছানার পায়েস,
দেখেই প্রাণটা তাজা।

পটক্ষেপণ।

সমাপ্ত।

কৌতুক-নাট্য

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

উপহার

শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবীকে—

ধর স্নেহ-উপহার স্নেহময়ি রাণি !
রূপ বা নিরূপ মন্দ
গন্ধ কিবা হীনগন্ধ
সুর বা বেসুর ছন্দ আমার যা বাণী,
সকলি তোমার কাছে আদরের জানি।

কৌতুক-নাট্য

——:•:——

লজ্জাশীলা

ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়ী। ফুলদার সূক্ষ্ম পায়নাপল
বস্ত্রপরিহিতা এবং নানালঙ্কারে বিভূষিতা
দুই যুবতী সিদ্ধেশ্বরী এবং নিধিমণি
অন্তঃপুরে নির্জ্জন বারান্দায়
বিশ্রম্ভালাপে রত।

সিধু। এমনো কালামুখী!

নিধু। মাইরি! ছি ছি!

সিধু। ছি ছি না ছি ছি! লাজলজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে!

(কামিনীর প্রবেশ)

কামিনী। কি হয়েছে মেজবৌ! কার কথা বলছিস্?

সিধু। কামিনী যে! এতক্ষণে কি আস্‌তে হয়? বোনঝির গায়ে হলুদ, সব কর্‌বি কর্ম্মাবি, না একেবারে বেলা পুইয়ে এলি!

নিধু। ও ভেবেছে বেলায় এসে হলুদের পালাটা এড়াবে, সেটি হচ্ছে না। সোনার রং কলিয়ে তুলবো লো, ছাড়ব না।

কামিনী। মাইরি ভাই, তোদের পায়ে পড়ি, বিকাল বেলাটা আর হলুদ দিস্ নে। নিজেরা ত রং ফুটিয়েছিস, সেই ভাল। চমৎকার বাহার হয়েছে, আমায় মাপ কর।

কি বাহার করেছ রে প্রাণ কিবা হার পরেছ গলে,
দেখে তোমার মুখশশী মুনিজনার মন ভোলে।

সিধু। (সানন্দে নিজ অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে) কামিনী, তোর কি মিষ্টি গলা ভাই! আমার সারাদিন শুন্‌তে ইচ্ছে করে।

নিধু। বাহারটা তোরই যেন কিছু কম? অমন রঙিন ফিতে কোথায় পেলি বল দেখি?

কামিনী। সে তোর ঠাকুরজামাইকে জিজ্ঞাসা করিস। হুটিয়ে না লাটিয়ে ব'লে কোন ইংরাজ দোকান আছে, আমার ছাই অত নাম মনে থাকে না, সেখান থেকে এই সব জুটিয়ে-জাটিয়ে আনেন। যা হ'ক, কার কথা তখন বলছিলি, বল না? লাজ-লজ্জার মাথা কে খেয়েছে?

নিধু। এই বোসেদের শশীর বৌএর কথা হচ্ছিল।

কামিনী। কেন, তার কি—হয়েছে কি?

সিধু। হবে আর কি! যতদূর হবার তা হয়েছে। একেবারে মেম সেজে গাউন প'রে এসেছে। মা গো, আমরা ত সাতজন্মে পারিনে! দেখে অবধি গা কস্‌কস্ কর্‌ছে, তাই সে ঘর থেকে উঠে এসেছি! (ঘাড় বাঁকাইয়া অধরোষ্ঠ ভঙ্গী করিয়া ঘৃণা প্রকাশ)।

নিধু। আর বল্লে কি হবে, কলিযুগ দেখছি উল্‌টে গেল!

কমিনী। সত্যি নাকি বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে শেষে বিবি সাজলে! ওমা, কোথায় যাব মা!

সিধু। এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা—

কামিনী। গায়ে জামা——তা—

সিধু। শুধু জামা! ভিতরে আবার কিচি-কিচ্ছি মোটা ঘাগরা। সাড়ি সে শুধু নাম রক্ষে! দেখে অবধি লজ্জায়-ঘেন্নায় একেবারে ম'রে যাচ্ছি।

কামিনী। এই যে বল্লি গাউন!

সিধু। গাউন না সে গাউনের বাবা! নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে এসেছে, নীলাম্বরী পর, নেট পর পায়নাপল পর, তা না কি সংটাই সেজেছে, একবার দেখবি চল না।

কামিনী। তা ভাই জামাজোড়া পরেছে—তাতে আর এমন কি দোষ! আমার স্বামী আমার জন্যে একটা ফরমাস দিয়েছেন।

সিধু। সত্যি নাকি। একদিন প'রে আসিস্ দেখব। আমিও ত তাই বলি, সেটা আর এমন কি লজ্জার কথা।

নিধু। তবে যা তোরাও বিবি সাজগে, কুল উজ্জ্বল হয়ে যাক। আহা, কি রূপখানই খুলেছে, কি মানান্‌টাই মানিয়েছে—ম'রে যাই আর কি।

সিধু। তা যদি বলিস, তাকে কিন্তু মন্দ দেখাচ্ছে না ভাই!

নিধু। অমন ভাল দেখানোর কপালে আগুন! আহা, কিবা রূপেরই শ্রী।

সিধু। তা ভাই, রূপটা মন্দ কি? সত্যি কথা বলতে কি, তাকে জামাজোড়ায় সেজেছেও ভাল।

নিধু। (সক্রোধে) কালামুখী ধিক্‌জীবনী, পোড়াকপাল তার রূপে! পোড়াকপাল তার সাজে!

কামিনী। অত রাগ করসি কেন ভাই, জামা-জোড়া পরলে এক রকম বেশ ত মানায়! এই তুই পরিস্, তোকে বড় সরেস দেখতে হয়।

সিধু। (আহ্লাদের হাসি হাসিয়া) তা ভাই, উনিও ঐ কথা বল্‌ছিলেন যে, আমাকে এক-দিন বিবি সাজায়ে দেখতে ইচ্ছা হয়। তবে কি জানিস, যাদের রং তেমন পরিষ্কার নয়—

কামিনী। তা বই কি? তোমার চেহারায় গাউন কেন, চীনে চোগাও খাটে, তাই ব'লে দেশ-শুদ্ধ জ্যাকেট পরলে কি সাজে?

সিধু। (উথলিত গর্ব্বে) কামিনী তুই এত-দিন আসিস্ নে—তোর জন্যে এমন মন কেমন করত! চল ভাই, ঘরের ভিতর একবার রঙ্গখানা দেখবে চল।

(তিনজনের মজলিস-গৃহে প্রবেশ)

সিধু। বলি ও শশীর বৌ! কতদিন এমন হলো!

বৌ। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি হোল ঠাকুরঝি?

সিধু। ন্যাকা আর কি! যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না!

বৌ (সভয়ে) তা জানব না কেন? কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।

সিধু। আমরা যে তোকে বড় লাজুক মেয়ে ব'লে জানতুম, তোর মনে এই ছিল!

কামিনী। হায়! হায়! এমন কাজও তুই করলি?

বৌ। কেন, আমি কি করেছি?

কামিনী। সর্ব্বনশ—লো সর্ব্বনাশ! এতদিন মেয়েমানুষের মন চেনাই দায় ছিল, তুই যে অঙ্গ চেনা পর্য্যন্ত দায় ক'রে তুল্লি।

নিধু। (সিধুর গা টিপিয়া) বেশ বলেছে কামিনী! (সকলের হাস্য)

সিধু। বলি এমন পোষাক কবে ধর্‌লি?

কামিনী। একেবারে যে বিবি লো!

বৌ। (সলজ্জে) কি করব ভাই, তিনি এ রকম কাপড় না পর্‌লে ছাড়েন না যে।

সিধু। তা আরো কত হবে। এর পরে শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে আর ঘোমটা পর্য্যন্ত উঠবে না।

বৌ। তা কি করবো, আমার শাশুড়ী আমাকে ঘোমটা দিতে দেন না; বলেন, আমার মেয়ে নেই, তুমি আমার মেয়ের মত, কাছে বসো, কথা কও, এই সব।

কামিনী। সত্যি নাকি লো!

নিধু। একবারে লোক হাসালি, পদার্থ আর রইলো না কিছু তোতে!

সিধু। কেন, আমরা কি আর কথা কইনে? সেদিন বাপের বাড়ী যেতে ঠাকরুণ বারণ করে-ছিলেন, আমি যে একটু স'রে এসেই কত ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিলুম—তাই বলে কি ঘোমটা খুল্‌তে গিয়ে-ছিলুম? না, কাছে ব'সে বেহায়ার মত গল্প কর্‌তে গিয়েছিলুম? সবাই ত তাই বলে, ও বাড়ীর মেজ-বৌয়ের লজ্জাটা বড় বেশী—

সকলে। তা সত্যি, তা সত্যি।

বৌ। ছি ঠাকুরঝি; তুমি শাশুড়ীকে অমন বল্লে? তাতে তোমার লজ্জা হোল না?

সিধু। কি লজ্জাবতী গা, ঘোমটা খুলে মেম সাজতে লজ্জা হোল না, আর যত লজ্জা ওনার এর বেলা। তোর মত যে দিন নির্লজ্জ বেহায়া হব, সে দিন গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

বৌ। (স্বগত) বটে, জামা পর্‌লেই যত মেম সাজা হয়। আর উনি যে মুখে এক রাশ রুজ পাউডার মেখেছেন, তাতে কোন দোষ হোল না—দাঁড়াও না, জব্দ করছি। (প্রকাশ্যে) ঠাকুরঝি, অত রেগো না গো, লাল গাল আরো লাল হয়ে উঠবে। সত্যি সত্যি তোমার গাল দুটো অতো লাল দেখাচ্ছে কেন? পিঁপড়ে কামড়েছে না কি?

সিধু। মরণ, পিঁপড়ে কামড়াবে কেন? আমার গাল ছুটো ভাই অমনি লালপানা, তোর ঠাকুরজামাই ত সর্ব্বদাই বলেন, গাল নয় ত যেন গোলাপফুল!

কামিনী। আহা, আমাদের যদি ঐ রকম হোত?

সিধু। গাল?

বৌ। না স্বামী?

কামিনী। ওলো, তুই লো তুই—যার গাল লাল, তার স্বামী আপনা হ'তেই বশ, আর যার স্বামী বশ, তার গাল—

সিধু। (সগর্ব্বে)—তা সাধ যায় বই কি?

বৌ। (সিধুর নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে) তা ভাই, মুখে তোর খড়িপানা ও কি লেগেছে? মুছিয়ে দেবো।

সিধু। (স্বগত) এই যা মজালে! সব দেখছি ফাঁশ হয়ে যাবে। (তাড়াতাড়ি বৌয়ের কানে কানে) চুপ কর। ও ভাই এক রকম গুঁড়ো, মাখলে স্বামী বশ হয়, কাউকে বলিসনে, আমি তোকে এক কৌট পাঠিয়ে দেব এখন। আর তুই ভাই আমাকে একটা তোর জামার নমুনা পাঠিয়ে দিস্, বুঝলি? দেখিস্, ভুলিস্ নে, মাথা খাস!*

বৈজ্ঞানিক বর

(১২৯২ ভারতী)

(দৃশ্য বাসর-গৃহ, মসনদের উপর কন্যার পার্শ্বে গ্র্যাজুয়েট বর; নিকটে যুবতীগণ আসীন)

প্রথম যুবতী। (বরের প্রতি) বলি কি গো, অমন ধারা চুপ ক'রে ব'সে রইলে কেন? সেই অবধি বকাবকি ক'রে মলুম, মুখে যে একটা রা নেই।

দ্বি। রা আর থাকবে কি ক'রে লো? ফুলির আমাদের চাঁদপানা সোনার মুখ, তাই দেখেই অবাক্ হয়ে গেছে।

বর। কি বল্লেন, চাঁদপানা সোনার মুখ? (একটু হাসিয়া) আপনি যে অত্যন্ত রুচিবিরুদ্ধ তুলনা করলেন। চাঁদপানা সোনার মুখ ত কোথাও পড়িনি। (চিন্তিত ভাবে) বায়রণ, স্কট, সেলি, টেনিসন, কই কোথাও Moonface. আছে ব'লে ত মনে পড়ছে না। আর সোনার মুখ Why thats absurd! Golden face সোনার মুখ হয় না—তবে Golden hair সোনার চুল হয় বটে।

তৃ। ও মা, কেমন কাণা বর গা; মেয়ের অমন সোনাপারা মুখ. তাও সোনা নয়, অমন কাল কুচ-কুচে চুল, তাও বলে সোনা রঙের! এ কি কথা গা! এত রূপও কি পছন্দ হলো না নাকি?

প্র। না লো না, বর তা বলছে না, বরের তোদের ইংরাজী পছন্দ, বর সোনামুখ চায় না, সোনাচুল চায়।

চ। ওমা, সত্যি নাকি? হ্যাঁ গা, তবে কি আমাদের বুড়ঝি হারার মাকে এনে তোমার পাশে বসিয়ে দেব নাকি? ফুলির আমাদের কাল চুল ব'লে কি মনে ধর্‌লো না?

বর। (একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) মনে ধরা—পসন্দ হওয়া! যার সঙ্গে এক মিনিট ব'সে কোর্ট-সিপ করতে পাইনি—তাকে মনে ধরেছে বল্লে মিথ্যা কথা বলা হয়। ইংরাজদের কিন্তু এ সব নিয়ম বড় ভাল।

প্র। কেন, ইংরাজদের কোর্টসিপের বিয়েতেও ত ঝগড়াঝাটি, ছাড়াছাড়ির অভাব দেখিনে।

বর। সে কি জানেন,—সে ভালর মন্দ। যাক্, আপনারা প্রথমে আমাকে যে প্রশ্ন করছিলেন—তার উত্তর দিই। আপনারা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন যে, আমি চুপ ক'রে আছি কেন? তার উত্তর এই যে, পরশু দিন আমার একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে, টাউন হলে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একটা লেক্‌চার দিতে হবে, আমি সেই বিষয় ভাবছিলুম।

প্র। তা কি লেক্‌চারটা দেবে শুনি—আমাদের কাছে একটা নমুনা দিয়ে যাও।

বর। তা উচিত কথা ছাড়া আর কি বলব?

---

* উক্ত নক্সাটি ১২৯২ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হয়, এই অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গ-মহিলার পরিচ্ছদের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। বাহিরে যাইতে হইলে শাড়ির সহিত একটি সুদর্শন জ্যাকেট এবং অন্তরাবরণ পরিধান এখন আর লজ্জার কথা নহে। কিন্তু তখন যিনি দুঃসাহসী হইয়া উক্তরূপ সুরুচি-সঙ্গত শোভন বেশ-ভূষার অন্যাবরণে প্রয়াসী হইতেন, তাঁহাকে বিলক্ষণ হাস্যভাজন হইতে হইত।

দেখুন দেখি—দশ বছরের বালিকা—আজ তার বিবাহ, কাল সে বিধবা। কাল হ'তে একাদশীর দিনে সে মুখে এক ফোঁটা জলও ঠেকাতে পারবে না, কোন দিন সাধ ক'রে একখানা রংকরা কাপড়ও পরতে পাবে না, আর বড় হয়ে সে যদি কোন সুপুরুষের Loveএ পড়ে গেল—যেটা হওয়া খুবই সম্ভব—তা হ'লে তাদের দুজনের মিলনে পর্য্যন্ত আর কোনই সম্ভাবনা থাকবে না। দেখুন দেখি, এই শেষ ব্যাপারটি কত শোচনীয়! আমার স্ত্রীর আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হ'লে আমার উইলে আমি স্পষ্টাক্ষরে এই কথাগুলি লিখে যাব যে, যদি আমার স্ত্রী আবার বিবাহ করেন, তবেই আমার ধনের অধিকারিণী হবেন, তা না হ'লে এক কাণাকড়িও পাবেন না।

প্র। তা যদি বল, তবে তোমার স্ত্রী দোরে দোরে বরঞ্চ ভিক্ষা মেগে বেড়াবে।

তৃ। নে ভাই নে, তোদের পণ্ডিতে পণ্ডিতে এখন ব্যাখ্যা রাখ, বর, একটি গান বল ত ভাই!

(কন্যার মাতার প্রবেশ)

মাতা। এস বাছা খাওসে, তোরা এখন ঠাট্টা রাখ।

(বরকে লইয়া আহারের স্থানে গমন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আহারান্তে বর আবার মসনদে উপবিষ্ট।

তৃ। নাও ভাই বর,এবার একটি গান শোনাও।

বর। আমি আপনাদের অজ্ঞতা দেখে অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। এইমাত্র আহার ক'রে এলুম, এরই মধ্যে পান! স্বাস্থ্যের প্রতি কি আপনাদের একটুকুও দৃষ্টি নেই?

চ। এ বর ত আচ্ছা জ্বালাতন আরম্ভ করলে। মেজদিদি, তোরা সবাই মিলে ছটো ঠাট্টা-তামসার কথা ক'।

দ্বি। (তৃতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) বলি একটা পান-টান সেজে নিয়ে আয়—ঠাট্টাও করতে ছাই শিখলিনে।

[তৃতীয়ার প্রস্থান।

বর। জীবনটা কি ঠাট্টা-তামসার যে, সারাদিন ঠাট্টা-তামাসা ক'রে কাটাতে হবে? যত দিন আমাদের দেশে Serious scientific spirit—

(তৃতীয়ার পানহস্তে প্রবেশ ও বরের হস্তে পান প্রদান করিয়া)

তৃ। নাও, কথা কইতে কইতে মুখ শুকিয়ে এসেছে, পানটা খেয়ে নাও।

(পান খুলিয়া পানের দিকে বরের একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ)

প্র। (সভয়ে দ্বিতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) এই বুঝি ধ'রে ফেল্লে! (প্রকাশ্যে) কি আবার দেখছ, পানটা খেয়ে ফেল না।

বর। (মুখ তুলিয়া) এমন কিছু নয়—এই আগে যা বলেছিলুম, বাঙ্গালীদের যত দিন discovery করবার spirit না হবে, তত দিন কোন মতেই দেশের দুর্দ্দশা যাবে না। আমি যে দিন থেকে science পড়তে আরম্ভ করেছি, সেই দিন থেকেই আমার ঐ দিকে লক্ষ্য।

প্র। তা পানের ভিতর আর কি diescovery করবে, ওটা খেয়ে ফেল।

বর। (পান মুখে দিয়া) কিসে কখন কি discovery করা যায়, তার কি ঠিক আছে? তার জন্যই ত যা কিছু হাতে পাই, আমি পরীক্ষা ক'রে দেখি। এই Dr Kook জলের ভিতর সে দিন কলেরা জারম্ আবিষ্কার করেছেন, আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি, শুকনো জিনিষের মধ্যেও সে জারম্ আছে - তা হ'লে ইণ্ডিয়ার কাছে তৎক্ষণাৎ ইয়োরোপের মাথা হেঁট হয়ে যায়।

প্র। (হাসিয়া) তবে দেখছি—এবার তোমা হ'তেই ভারতটা উদ্ধার হয়ে গেল।

বর। (পান লোস্তা বোধে মুখ বিকৃত করিয়া) এ কি সত্যিই এতে জার্ম্ম টার্ম্ম কিছু আছে নাকি? এমন ঠেকছে কেন?

(বরের থুথু করিয়া পান নিক্ষেপ, যুবতীগণের সকলে মিলিয়া হাস্য)

বর। আপনারা একটু চুপ করুন, এ হাসির সময় নয়। শরীরটা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। এ কি হোল! চারিদিকে যে অন্ধকার—মাথার ভিতর যে ভোঁ ভোঁ

ক'রে উঠলো। ভগবান একি করলে! মৃত্যুর জন্য আজ বিবাহশয্যা বসাইয়াছিলে? প্রেয়সি—তোমার ও চাঁদমুখ—সোনার মুখ আর যে কখনও দেখিতে পাইব না।—জন্মের শোধ যে আজ শেষ দেখা দেখিয়া চলিলাম—প্রাণেশ্বরি, তুমি যে আজ বিধবা হোলে! এই শেষ দিনে একটি অনুরোধ করিয়া যাই, মাথা খাও, আমার এই অন্তিম ভিক্ষাটি স্মরণ রাখিও, প্রেয়সি! ইংরাজদের মত কখনো বিধবা-বিবাহ করিও না, আমি চলিলাম, কিন্তু আমাদের দেশের অমূল্য একাদশীর প্রথটা তুমি পালন করিবে, এই আশা হৃদয়ে লইয়া চলিলাম।

প্র। (শশব্যস্তে) এ কি, তোমার আবার এ কি হোল?

দ্বি। এ কি নাটক করে যে?

তৃ। ও মা, এমন বেরসিক বরও ত কোথাও দেখি নি—পানে একটু নুণ দিয়েছি, তা এত হেঙ্গাম।

বর। নুন দিয়েছেন? কখনই না। আমি জানি, এ কলেরা জারম, আর আমিই ইহা আবিষ্কার করিয়াছি; আমি এখন মরিলাম বটে কিন্তু আমার নাম চিরকালই পৃথিবীতে জাগিয়া থাকিবে।

দ্বি। এ কি, তোমার মতিচ্ছন্ন ধরলো যে—নুণ নয় ত আবার কি?

বর। (মুখ নাড়িয়া দেখিয়া স্বগত) তাই ত, নুণই ত বটে, আমাকে দেখছি বড়ই মাটী করলে। কিন্তু আমি কি না মাটী হবার ছেলে—রোসো না! (প্রকাশ্যে) ঠাট্টা! আপনাদের ইয়ে—এই এক বিন্দুও যদি বিজ্ঞান-জ্ঞান থাকত,তা হ'লে কি এরূপ ঠাট্টা করতে পারতেন? কি হ'তে যে কখন্ কি হয়, তা যাদের জ্ঞান নেই—

প্র। তা সত্যি কথা, তোমাকে নিয়ে যখন ধান ভান্‌তে আরম্ভ করি—তখন যে এমন শিবের গীত গাইতে হবে, তা কি জানি?

বর। সেটা আমার দোষ, না আপনাদের? সেই অবধি Science Philosophy বুঝিয়েও আপনাদের নীতিবিরুদ্ধ ঠাট্টার হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। Oh! Byron, how truly thou said.—philosophy and Science. I have essay'd but they, availed not! সমাজের মূল উচ্ছেদ ছাড়া এর প্রতীকার আর কি আছে?

প্র। তা হ'লে বিধবার একাদশীটা পর্য্যন্ত উঠে যায়, সেটা যেন মনে থাকে।

(সকলের হাস্য)

তৃ। না আমাদের বর রসিক বটে, অনেক বিয়ে দেখিছি—কিন্তু এমন নাটক কেউ করেনি। ও ফুলি, তোর বরের গলায় একগাছা ফুলের মালা দিয়ে দে।

দ্বি। হ্যাঁ, এত কান্নাকাটির পর মধুর মিলন হোক্, দুই প্রাণে মিশে এক হয়ে যাক্—আমরা দেখি

বর। (স্বগত) আমাকে বড় মাটীটাই করেছে,—এর শোধ এইবার তুল্‌ব। (প্রকাশ্যে) দেখুন—science না জানার কত দোষ, তা হ'লে আর আপনি এমন absurd কথাটা বল্‌তে পার্‌তেন না। এক জন living being কি আর এক জন living being এর সঙ্গে মিশে যেতে পারে? প্রকৃত পক্ষে ও কথাটা matter এর molecules সম্বন্ধেই খাটে; কেন না, cohesion matter এর একটা property, এক জন ইংরাজ মেয়ে হ'লে কখনো এরূপ বল্‌তেন না—what a pity!

প্র। কেন, ইংরাজ মেয়ে ছাড়া অনেক ইংরাজ পুরুষেও ত কবিতায় এরূপ কথায় ছড়াছড়ি ক'রে গেছেন।

বর। সে আলাদা কথা। কিন্তু ও কথাও আর বেশী দিন চল্‌ছে না। রেনা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—অল্পদিনের মধ্যে বিজ্ঞান ছাড়া কবিতা-টবিতা কিছু থাক্‌বে না।

প্র। তখন না হয় বল্‌ব না?

বর। উঁহু, এখনও বল্‌তে পারেন না। ওতে অলঙ্কারশাস্ত্রের দোষ পড়ে। একটা গ্রহের যখন Centrifugal force কমে যায়, তখন সূর্য্য Centripetal force দ্বারা তাকে টেনে নিয়ে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে—কিন্তু মানুষ ত আর একটা গ্রহ নয়?

দ্বি। কোথাকার হতভম্বা বর,—এ সব আবার কি বকে?

তৃ। একবার সোজা না ক'রে দিলে চল্‌বে না দেখছি—

প্র। আমরা জানি—হাতের জোরে পিঠের

জোর কমিয়ে ফেলতে পারলেই মানুষ-গরুদের নাকে দড়ি দিয়ে নিজের দিকে টেনে আনা যায়—পরীক্ষা দেখবে?—

(বরের পৃষ্ঠের চারিদিক হইতে মুষ্টি পতন)

বর। একি ভয়ানক। দোহাই আপনাদের—এ সব ছেড়ে আপনারা একটু লেখাপড়া চর্চ্চা করুন, যদি বিজ্ঞানও না পড়েন—দর্শনগুলো,—গুলো না হ'ক, অন্ততঃ কান্টের দর্শনখানা জানা থাকলে এ সব Nasty ব্যাপার হ'তে কেবল আমি না—সমাজ পরিত্রাণ পায়!

প্র। বটে, তা কানটেপার দড়ন আমরা বেশ জানি,—বিদ্যাটা দেখিয়ে দেব?

বর। (কানমলা খাইয়া) By Jove? রক্ষা করুন—জানলে কোন হতভাগ্য বিয়ে করতে আসে। দোহাই তোমাদের, যা হবার হয়েছে—এমন কর্ম্ম আর কখনো করব না।

দ্বি। বল করবে না—

বর। কক্ষনো না, জন্মে না, নেহাৎ গণ্ডমূর্খ না হ'লে সে বিয়ে করতে আসে—রাম রাম!

প্র। তা বই কি, কিন্তু হ'দে গণ্ডমূর্খ, বিয়েটা একবার করলে যে আর ফেরে না।

বর। গণ্ডমূর্খ! শেষে এ-ও অদৃষ্টে ছিল!

চতুর্থ। না না, গণ্ডমূর্খ না—পণ্ডিতমূর্খ। ও কুলি, তোর পণ্ডিতমূর্খ বরকে একবার ফুলের মালাটা পরিয়ে দে, তোর বুদ্ধির একটু ভাগ পাক্।

(ক'নের হাতে মালা দিয়া তাহার হাত ধরিয়া বরের গলে মালা প্রদান)

বর। (ক্রুদ্ধভাবে) মশায়রা মাপ করবেন, বিয়েটা ক'রে জীবনের মধ্যে একটা মূর্খমি ক'রে ফেলেছি, তাই ব'লে আর বেশী করতে পারছিনে।

(মালা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ)

দ্বি। কেন, মালাতে আবার কি দোষ হ'ল? ওতে আবার সাপ বিছে আছে নাকি?

বর। কি আশ্চর্য্য! বিজ্ঞানের এই সামান্য সত্যটাও কি আপনাদের বোঝাতে হবে? ফুল থেকে Carbonic acid বলে রাত্রে একরকম গ্যাস বার হয়—সে সাপ-বিছে হ'তেও ভয়ানক। রাতে ফুল ঘরে রাখাই উচিত নয়।

দ্বি। সে আবার কি জিনিষ?

বর। By Heavens! সে এক রকম মন্দবাতাস।

তৃ। মন্দ বাতাস কি? ভূত নাকি?

বর। তা ভূত বলতে পারেন—বাতাস পঞ্চভূতের এক ভূত।

প্র। তা তোমাকে দেখছি, আগে থাকতে পঞ্চভূতে পেয়ে বসেছে—এক ভূতে আর কিছু করতে পারবে না—মালাটা এখন প'রে ফেল।

বর। সে কথা আর বলতে! এখন ভূতগুলো ছাড়াতে না পারলেও তো প্রাণ বাঁচে না। আগে জানা ছিল, অন্ধকারেই ভূতের প্রাদুর্ভাব, কিন্তু এখন দেখছি,আলোতেই ভূতের দৌরাত্ম্য বেশী। আলোটা নিভিয়ে দিলেই এ ভূত ছেড়ে যাবে।

(উঠিয়া দীপ নির্ব্বাণ)

প্র। আমাদের ভূত বল্লে? ভারী ত অসভ্য!

যুবতীগণ। (গোল করিয়া) যা হোক, এতক্ষণে একটা কীর্ত্তি করেছে—পাশ দিয়েছে বটে।

[হাসিতে হাসিতে সকলের পলায়ন।

লোহার সিন্দুক

(ভারতী ১২৯২)

প্রথমা। তার পর?

দ্বি। নেহাত শুনবি? সে কিন্তু অনেক ক'রে বারণ করে দিয়েছে।

প্র। তা বারণ করলেই বা, আমার কাছে বলবি বই ত নয়, আমি ত আর কাউকে বলতে যাচ্ছিনে।

দ্বি। তা জানি বলেই ত তোকে বলছি—নইলে কি বলতুম, তা ভাই দেখিস যেন প্রকাশ না হয়।

প্র। মরণ—তুই কি ক্ষেপেছিস—আমার কাছে—

দ্বি। তবে শোন, এই সে দিন—কিন্তু তাকে কড়ারটা দিলুম দেখিস—

প্র। এমন ক্ষেপাও ত কোথায় দেখি নি, আমাকে কথা বলতে ডরাস? এই সে দিন দিদুর মা আমাকে যে বল্লে, তার স্বামী মদ খেয়ে ঘরে

এসেছিল—সে কথা কি আমি তোদের কাউকে বলেছি? আমার মত লোহার সিন্দুক কাউকে পাবি নে।

ঝি। তা সত্যি—তবে শোন—

নবীন ও নবীনের কাকা।

কাকা। আজকাল তোমার কেমন পড়াশুনা হচ্ছে নবীন?

নবীন। খুবই ভাল।

কাকা। তোমার মতে ত বরাবরই খুবই ভাল, সে কথা কে জিজ্ঞাসা করছে?

নবীন। তবে কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন?

কাকা। মাষ্টার তোমায় কি বলেন? তি.ন কি সন্তুষ্ট?

নবীন। আজ্ঞে খুবই।

কাকা। সবই খুবই! superlative ছাড়া দেখছি তোমার কথা নেই।

নবীন। আজ্ঞে ঠিক উল্টো, supelative হ'লে হোত খুব তম, আমি positiveএর একটুও এদিক-ওদিক করি নি।

কাকা। বটে, একেবারে গোল্লায় গেছে। কাকার সঙ্গেও ইয়ারকি! খুবতম একবার পেতে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?

(নবীনের মাতার প্রবেশ)

মা। কি হয়েছে ঠাকুরপো? মার-মূর্ত্তি যে?

কাকা। কি আর হবে, তোমারি কারখানা—ছেলেটাকে একেবারে গোল্লায় দিয়েছ?

মা। তোমার ঐ এক কথা! কেন গা, ওর আমার পড়াশুনায় যেমন মন—তোমাদের তেমন হ'লে বাঁচতুম। রাতদিন বই হাতে করেই বাছা আছে।

কাকা। আর কারো নজরে তো তা পড়ে না।

মা। হাদ্ দেখো ঠাকুরপো—নজর-নজর করো না—তা হ'লে কালই আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাব। আমি কি একলা ওর পড়াশুনার কথা বলি—কেন, মাষ্টার কি বলেছে শোন নি কি? হ্যাঁ বাবা, বলতো রে আর একবার, তোর কাকাকে একবার শুনিয়ে দে ত রে।

নবীন। তা উনি শোনেন কই?

মা। না, শুনবে না! বল বাবা তুই, বল দেখি, কেমন শুনবে না দেখি?

কাকা। আমি ত সেই কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম?

মা। বেশ কর্‌ছিলে—ভাল করছিলে—তা করবে না কেন? বল্ বাবা আমার, বল্ তুই।

নবীন। আমি ত আগেই বল্‌তে গিয়েছিলুম।

মা। তা ত বেশ করছিলে—আবার বল্ মাণিক আমার।

নবীন। সে দিন আমি স্কুলে একটা রচনা লিখেছিলুম—

মা। শোন ঠাকুরপো, বাবা আমার একটা ল—ল—লচনা—

নবীন। আাঃ, থাম না একটু—

মা। না বাবা, হ্যাঁ হ্যাঁ, থামছি বাবা—তার পর বল্ বল্ ধন তুই।

কাকা। তুমি দেখছি বল্‌তেও দেবে না।

মা। সে কি কথা? কেন দেব না? বল বাছ, মাষ্টার লচনা দেখে—

কাকা। কি বল্লে, ব'লে যাও।

মা। হ্যাঁ বাবা, ব'লে যা।

নবীন। তুমি একটু না থামলে আমি বল্‌ব না।

মা। বল্‌বি বই কি, বাবা আমার বল্, বাবা রে, আমি আর কিছু বল্‌ব না।

নবীন। বল্লেন—সব ছেলেরা যদি তোমার মত হোত।

মা। শুন্‌লে ঠাকুরপো, যদি আমার বাবার মত হোত।—

কাকা। আঃ, ওকে বল্‌তে দাও না!

মা। বল্ বাবা বল্, তা হ'লে কি হোত সোনা ধন?

কাকা। (রাগিয়া) হবে আর কি, তা হ'লে মাষ্টারের অন্ন জুটত না।

নবীন। ঠিক কথা কাকা। মাষ্টারও তাই বল্‌ছিলেন। বলছিলেন—সব ছেলেরা যদি তোমার মত হোত, তা হলে কালই স্কুল উঠিয়ে দিতুম।

মা। শোন ঠাকুরপো শোন,—চাঁদের আমার—

কাকা। বটে!

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার মত যদি সবাই শেখে—তা হ'লে শেখাবার জন্ম নূতন কিছু ত আর থাকে না।

মা। তবু যে তোর কাকার মন ওঠে না—বাবা! বাছা রে আমার, বাটের বাছা—তুই কি আমার বাঁচবি রে!

চাক্ষুষ প্রমাণ

বারান্দায় দণ্ডায়মান শ্যামবাবু, মাষ্টার
প্রাণকালী বাবুকে রাজপথ
দিয়া যাইতে দেখিয়া।

শ্যাম। আরে এই যে মাষ্টার বাবু! এত সকালে এত চোটপাট যাওয়া হচ্ছে কোথা?

মাষ্টার। (উপরে চাহিয়া) এই যে শ্যাম বাবু! আর ম'শায়, আমাদের সকাল বিকাল কি? চারটি অন্নের জন্ম আমাদের কি না করতে হয়!

শ্যাম। সে সব হবে এখন, দেখাই যদি হ'ল, একবার এই দিক্ দিয়ে হয়ে যান।

মাষ্টার। না মশায়, সময় বিন্দুমাত্র নেই। আপনাদের কি, আপনারা পায়ের উপর পা রেখে দিব্যি আরামে ব'সে থাকেন, সময়ের মূল্য ত আপনারা জানেন না।—তা যাচ্ছি,—এক্ষণি কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে।

শ্যাম। এক মিনিটের মধ্যেই যাবেন এখন!

(প্রাণকালীর গৃহে প্রবেশ, দু'জনে উপবেশন)

মাষ্টার। দেখবেন মশায়, শীঘ্র ছেড়ে দেবেন, বোঝেনই ত, পরের চাকরী, এক ঘণ্টা দেরী হ'লে সর্ব্বনাশ! একবার এক জন বন্ধুর অনুরোধে প'ড়ে এক হপ্তা—শুধু একটি হপ্তা মশায় কামাই হয়েছিল—তা সে যে লাঞ্ছনা—কি বলব!

শ্যাম। উঃ! তাই ত, ওরা সব পাষণ্ড মশায়, ওরা সব পারে! বুঝেছি আপনাকে গলায়—

মাষ্টার। (তাড়াতাড়ি) না না, তা নয়, এই—

শ্যাম। তা যেন নাই হ'ল—মাইনেটা যে কেটে নিয়েছিল, তার ত সন্দেহ নেই, গরীবের প্রতি কি অত্যাচার—তা নিক গে— কিছু মনে করবেন না—আমি—

মাষ্টার। আপনি ত আমাদের মা-বাপ আছেনই কিন্তু মাইনে কাটাও নয়। মাণিকের মা স্পষ্ট ব'লে পাঠালেন যে, অমন করলে এবার কর্ত্তাকে ব'লে দেবেন, আর মাণিক বল্লে—ওরূপ হ'লে সে স্বতন্ত্র মাষ্টারের বন্দোবস্ত করবে।

শ্যাম। হাঃ হাঃ, মাষ্টার মশায়, আপনি বলেই ও রকম হয়েছিল! আমি হ'লে—

মাষ্টার। কি করতেন?

শ্যাম। কি করতুম! বড় মানুষের ছেলেকে যে রকম ক'রে পড়াতে হয়, তাই করতুম।

মাষ্টার। সে কি, কোন রকম ফন্দী আছে না কি? আমাকে শিখিয়ে দিন দেখি।

শ্যাম। সে অতি সহজ ফন্দী। পড়াতে গিয়ে একবারেই পড়াতে হয়, তা হ'লেই সব চুকে যায়, বিনা আয়াসে মাইনেটি আদায় হয়, আর ঘাড় ভেঙ্গে দুপাত্র টানাও যায়।

মাষ্টার। তবে বলব মশায়? সে উদ্যোগটাও হয়ে এসেছে।

শ্যাম। সত্যি নাকি?

মাষ্টার। সত্যি না ত কি, যে টেরী বাঁকিয়ে চুল আঁচড়াতে শিখেছে, শীঘ্রই তার গোল্লায় যাবার লক্ষণ।

শ্যাম। বটে! টেরি বাঁকাতে ধরেছে! তবেই হয়েছে! আমাদের হরি এমন ভাল ছেলে ছিল, যে দিন দেখলাম চুল ফিরিয়েছে, বলব কি মশায়, তার পরদিন থেকে সে স্কুল ছেড়ে দিল!

মাষ্টার। এরও সে উদ্যোগ হয়ে এসেছে; কিন্তু বড় মানুষের কথা বলতে ভয় করে, যদি প্রকাশ—

শ্যাম। পাগল না কি! ও সব ভাবতে হবে না, বলুন দেখি ব্যাপারটা কি?

মাষ্টার। (চুপে চুপে আরম্ভ করিয়া প্রকাশ্যে) মাণিক বলছিল, তার বাপকে ব'লে এক দিন ষ্টার থিয়েটার যাবে, চৈতন্যলীলা তার ভারী দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।

শ্যাম। ষ্টার থিয়েটার! হাঃ হাঃ, আমি ত বলেছিলাম?

মাষ্টার। কিন্তু একটা কথা,—তার বাপ যে

টাকা নেবে, তা আমার মনে হয় না। তিনি
পাত্রই নন।

শ্যাম। তা বাপে না টাকা দিলে কি আর উপায় নেই? আমি ছেলেবেলা যখন টাকা পেতুম, তখন মা ঘুমালে আস্তে আস্তে নিতুম। তা তার যখন যেতে ইচ্ছে হয়েছে, অবশ্যই চুরী করেছে।

মাষ্টার। (আশ্চর্য্যভাবে) সত্যি নাকি? তাই বটে। এক দিন আমি পড়াতে গেছি,দেখি, সে তার বাপের ডেস্কের কাছে বসে আছে; আমাকে দেখে সে নিজের ডেস্কের কাছে এল।

শ্যাম। দেখলেন! সে নিশ্চয়ই ডেস্ক ভাঙ্গছিল, আপনাকে দেখে সে স'রে পড়লো, সন্দেহমাত্র নেই।

মাষ্টার। বলেন কি সন্দেহ মাত্র নেই?

শ্যাম। যেমন নিঃসন্দেহ আমি আছি।

মাষ্টার। কি ভয়ানক! (হাঁ করিয়া একদৃষ্টে শ্যামের মুখনিরীক্ষণ)

শ্যামা। হায় হায়, ছোকরাটা একেবারেই ব'য়ে গেল।

মাষ্টার। একেবারেই ব'য়ে গেল!

(বামাচরণ বাবুর প্রবেশ)

বামা। কি হয়েছে? দুজনে অমন ক'রে বসে আছ কেন?

শ্যাম। বলব কি মশায়, তাজ্জব লেগে গেছে—বরাবর ত শোনাই যেত, মাণিক বড় ভালছেলে, সে নাকি পড়াশুনা একেবারে ছেড়ে মায়ের বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরী ক'রে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বামা। (অবাক হইয়া) আমার বিশ্বাস হয় না—তাকে আমরা বড় ভালছেলে ব'লে যে জানি,তার নামে এ পর্য্যন্ত মন্দ কথাও ত কখনো শুনি নি!

শ্যাম। আপনার কিসে বিশ্বাস হয়! এই মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করুন, ইনি তার নাড়ী নক্ষত্র সব জানেন। ইনি বলছেন, ইনি স্বচক্ষে তাকে তার বাপের ডেস্ক ভেঙ্গে চুরী করতে দেখেছেন, আর—

(মাষ্টারের চোখে হাত দিয়া ক্রন্দন।)

বামা। কি ভয়ানক—কি ভয়ানক—পৃথিবীতে কাকেও বিশ্বাস নেই!

[প্রস্থান।

মাষ্টার। দুপুর বেজে গেল, আজ আর পড়াতে যাওয়া হ'ল না দেখছি, এইখানেই আহারের কথাটা বলে দিন।

শ্যাম। তবে রাতটাও থেকে যান, সন্ধ্যার পর দুজনে ষ্টার থিয়েটার যাওয়া যাবে এখন।

সেই দিনেই মাণিকের নিন্দায় সহর গুল্‌জার হইয়া পড়িল।

সৌন্দর্য্যানুরাগ

পত্নী পুকুর-ধারে সোপানে একখানি বই
হাতে আসীন. স্বামীর আগমন
ও নিকটে উপবেশন।

স্বামী। কি পড়া হচ্ছে? রসময়ের অসময়ের আবির্ভাব হ'ল না কি?

স্ত্রী। না, না,—এস এস,—একলা প'ড়ে মন উঠছে না—একবার শোন দেখি, এবার আর বলতে হবে না যে, ইংরাজীতে অমন ঢের আছে।

স্বামী। যে মত্ত দেখছি, ভয় হচ্ছে যে! একেবারে দেখো মনটা হারিয়ে ফেলো না। আমার যেন শেষে হা হা ক'রে বেড়াতে না হয়।

স্ত্রী। (হাসিয়া) মন হারানই বটে—আহা—আহা, কি চমৎকার বর্ণনা, সত্যই মোহিত না হয়ে থাকা যায় না—

সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটী
অচল ধরায় পড়ে লুটি।
করে পদ্মফুল
করে দুল দুল
অলসিত আঁখি সম আধো আধো ফুটি।
কি চমৎকার—বল দেখি?

স্বামী। তাই ত! (বইখানি হাতে লইয়া) স্বপ্নপ্রয়াণ? নামটি ভাল। তা পড়ব এখন, এখন থাক। আমার কি ভয় জান—সৌন্দর্য্যরসে মিছরির মত আমাকে এত শীঘ্র গলিয়ে ফেলে যে, ও সব পড়তে বড় ভয় করে। বিশেষ এখন তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে এলুম—তা হ'লে আর তা হবে না। কিন্তু তুমি ভাই, ঐ বর্ণনার সৌন্দর্য্যটুকু really কতটা appreciate করেছ—

স্ত্রী। আবার ইংরাজী—বাঙ্গালা বেরোয় না বুঝি?

স্বামী। কতটা তুমি উপলব্ধি করেছ, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে। স্ত্রীলোকের Aesthetic faculty দুর্ব্বল—সৌন্দর্য্যরসজ্ঞান আদপে যে নেই, এটা এক রকম সিদ্ধান্তই হয়ে গেছে।

স্ত্রী। বটে! কে সে বল দেখি বিদ্যাবাগীশ—যিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন?

স্বামী। (স্বগত) তুমি ত আর প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী বি, এ, নও কিংবা দিগম্বর গড়গড়ি এম, এ বি, এল্‌ও নও—যে, তোমার কাছে মুখ বুজে ব'সে থাকতে হবে, একটা যার তার নাম করলে ত আর ভুল ধরবার যো নেই—কি সুবিধা! (প্রকাশ্যে) কার সিদ্ধান্ত শুন্‌তে চাও? লোকটা কে জান, আর কেউ না—স্বয়ং স্পেনসার!

স্ত্রী। পেনসর কেন, স্বয়ং আমার প্রাণেশ্বর বল্লেও ও কথা আমি মানিনে। মিন্সের রকম দেখ না! ও কথা বল্লে কি ক'রে তার পেটে কি দু-কড়ার বিদ্যে নেই?

স্বামী। বটে, প্রাণেশ্বরগুলো বুঝি মানুষের মধ্যেই নয়?

স্ত্রী। (হাসিয়া) আমার প্রাণেশ্বর ছাড়া।

স্বামী। স্পেনসার লোকটা কে জান? এক-জন সভাপণ্ডিত। তাঁর কথা অগ্রাহ্য করার যো কি!

স্ত্রী। সত্যি নাকি? কখানা ইংরাজী বই পড়েছে?

স্বামী। হা হা—সে যে ইংরাজ!

স্ত্রী। ইংরাজ হলেই বা, সে কি তোমার মত অতগুলো বই পড়েছে, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি?

স্বামী। তা, আমার মত অতগুলো পড়েছে কি না, জানি না—তবে তিনিও এক-জন মস্ত বিদ্বান্‌, এই কথা বলতে পারি।

স্ত্রী। কক্ষনো না। তবে সে ও কথা বল্‌বে কেন? আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ নেই, এ আবার কি কথা! তবে বুঝি সেটা এ কালের নারদ অবতার? স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কেবল ঝগড়া বাধাবার ফন্দী!

স্বামী। (হাসিয়া) তিনি একলা না—কাণ্ট, কম্‌ট প্রভৃতি আজকালকার বড় বড় লোকদের সক-লেরি ঐ মত। কিন্তু তুমি ত সে সব কথা অত বুঝবে না—আমি তোমাকে আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাই।

স্ত্রী। (গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া স্বগত) কি বিদ্বান স্বামীই আমি পেয়েছিলুম—সরস্বতী যেন কণ্ঠাগ্রে

স্বামী। দেখ, ঐ ওখানে গোলাপ ফুলটি ফুটে আছে, কত সুন্দর—

স্ত্রী। তা ত দেখছিই, সে কি আর আমাদের চেয়ে তোমরা বেশী দেখবে? শোন—

কি চক্ষে দেখে যে ফুল বিরহিণী!
ফুরায় না দেখা আর!
পড়ে যেন দুঃখের কাহিনী!
পড়া শিখিয়াছে ফুলধনু কাছে
ফুলেই তেঁই সে এত মরমগ্রাহিণী।
পুষ্প নারী-হৃদয়ের দরপণ,
অবলা লালিত্য যেন করিয়াছে ছবি অরপণ।
তা'র দলে দলে, তেঁই গীতছন্দে
মনোজ্বালা করে বালা ফুলে আরোপণ।
কবি এ কথা বলেছেন।

স্বামী। আহা, কথাটাই ছাই শেষ করতে দাও। মেয়েরা যে ফুল, আমি অস্বীকার করছি কি? কিন্তু ফুল নিজের সৌন্দর্য্যে জগৎ মুগ্ধ করে ব'লে কি নিজেও সে সৌন্দর্য্য অনুভব করে? তেমনি তোমরা সৌন্দর্য্যভাব প্রস্ফুটিত কর ব'লেই সৌন্দর্য্যরসে মজ না।

স্ত্রী। কি কথাই বল্লে—ম'রে যাই আর কি! ফুলের সঙ্গে আমরা সমান্ হলুম! কেন, আমরা ফুলের মত জড় নাকি? মেয়ে ব'লে আমাদের কি মনটন কিছু নাই! তা বলবে বই কি! হা অদৃষ্ট! (মুখভার)

স্বামী। (শশব্যস্তে) তাই কি আমি বলছি?

স্ত্রী। তবে কি বলছ?

স্বামী। আমি বলছি, মেয়েদের পুরুষদের মত অতটা সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই।

স্ত্রী। কথা একটা বল্লেই হোল না, কিসে বুঝিয়ে দাও?

স্বামী। রুচির উৎকর্ষ সাধিত না হ'লে যথার্থ সৌন্দর্য্যজ্ঞান কখনই স্ফূর্ত্তি পেতে পারে না। তোমা-দের রুচির অভাব তোমাদের বেশেই প্রকাশ পায়, অসভ্য মেয়েদের্‌ও এরূপ বিদ্‌ঘুটে বেশ নয়। বিশেষ যখন তোমরা নিমন্ত্রণে যাও—দশজনের মাঝে অত্র

রকম বেশের যেখানে নিতান্তই আবশ্যক, সেইখানেই তোমাদের চূড়ান্ত কুরুচি প্রকাশ পায়।

স্ত্রী। প্রভু, সে কার দোষ? আমাদের, না আপনাদের? আপনারা আমাদের যেমন রাখেন, তেমনি থাকি, যে পথে নিয়ে যান, সেই পথে যাই। আপনারা আমাদের এই বেশ ভালবাসেন, তাই আমরা পরি, যদি দেশশুদ্ধ পুরুষের এ বেশ নিন্দনীয় মনে হয়, ত এক দিনেই এর জন্য ব্যবস্থা হয়ে যায়

স্বামী। কেন, আমি ত অনেকবার এরূপ কাপড় পরার নিন্দা করেছি।

স্ত্রী। ও মা, কবে গো? সে দিন বোসেদের বাড়ীর বৌয়ের নতুন ফ্যাসানের কাপড় পরার কথা শুনে কি বল্লে, সব কি ভুলে গেছ?

স্বামী। দূর কর ছাই··· তোমরা এমন কথাটাকে বাঁকিয়ে ফেলতে জান। নতুন কিছু হ'লেই লোকে অমন দু একটা কথা কয়। তাতে ত আর তোমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে ব'লে প্রমাণ হচ্ছে না। ভারতচন্দ্র, বিদ্যাপতি প্রভৃতি আমাদের কবিদের বর্ণনায় দেখ, আর আসলেও দেখ,—বাঁকাহাসি, আড়চাহনি, তেড়্‌ফেরান, সৌখীনতা ভাবেই আমাদের দেশের মেয়েরা পাগল। যথার্থ মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব পুরুষের একটা পুরুষত্ব ভাব এ আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা কজন Appreciate করে—দূর কর ছাই, এ সবে কজন মেয়ে মুগ্ধ হয় বল দেখি? এইখানেই ত প্রকৃত রুচির অভাব।

স্ত্রী। তা দেশের পুরুষরা যদি সব মেয়েই হয়, তার জন্য আমরা কি করব?

স্বামী। তা কেন? তোমরা যদি বাস্তবিক পুরুষের পৌরুষিকগুণ ভালবাসতে, তা হ'লে কি পুরুষেরা মেয়ে হ'তে পারে? তা হ'লে দেশের স্বতন্ত্র শ্রী হয়ে পড়ত। এই সেদিন আমি এক রকম নতুন রকম কাপড় ও পাগড়ি তৈরী করলুম,—তা দেখেই তুমি নাক তুলতে আরম্ভ করলে। তোমার সেই বাহারে ধুতি চাদরটি না হ'লে মনঃপুত হয় না।

(ভ্রাতৃবধূর প্রবেশ)

স্ত্রী। (হাসিয়া) ও বউ মজা শুনসে? তুই যদি ভাই সেই খুব পাগড়িটা—আর মালকুচা সাটের কাপড় পরাটা দেখতিস্—ত হাসি রাখতে পারতিস না। তা যখন যুদ্ধে যাবে, সে রকম কাপড় পরো—এখন ঘরে ব'সে আর ওতে কি হবে?

স্বামী। তা তুমি যেতে দিলে ত?

স্ত্রী। তা দেব না কেন? এই যে সে দিন হারার মাকে হারা মদ খেয়ে মারতে লাগলো—আমি জানালা দিয়ে দেখে ছাড়িয়ে দিবার জন্য তোমাকে কত ডাকলুম—তা তুমি ত গেলে না।

স্বামী। (স্বগত) বেশ স্ত্রী যা হোক। মাতালের হাতে গিয়ে তখন প্রাণটা খুইয়ে আসি। (প্রকাশ্যে) সে তখন আমার মাথা ধরেছিল, কি করি বল?

স্ত্রী। মাথা আবার কখন্ ধরলে? তুমি ত বল্লে, কে আবার যায়।

স্বামী। আমি না গিয়ে থাকি—সেও তোমার দোষ। তুমি যদি যশোবন্তের স্ত্রীর মত আমাকে উত্তেজিত করতে, তা হ'লে কি আমি না গিয়ে থাকতে পারতুম?

স্ত্রী। সে আবার কোন্ কেতাবে আছে?

স্বামী। টডের রাজস্থানে।

স্ত্রী। ইংরাজী না বাঙ্গালা?

স্বামী। ইংরাজি।

স্ত্রী। সেটা কার দোষ? তুমি আমাকে ইংরাজী পড়ালে না কেন? তা হ'লে ত সে বক্তৃতাটি মুখস্থ ক'রে রাখতুম।

স্বামী। (স্বগত) তা হ'লেই হয়েছিল আর কি। এখানে এসে বিদ্যে ফলিয়ে যে সুখটুকু আছে, যাও থাকত না। (প্রকাশ্যে) তা আমি ত তোমাকে ইংরাজী শেখার জন্য ঢের বলেছিলুম—তোমার সঙ্গে একসঙ্গে মিল স্পেনসর প'ড়ে যদি দুজনে সকল রকম ভাবের আদান-প্রদান করতে পারতুম—তা হ'লে কি সুখই হোত।

ভ্রাতৃজায়া। বলি, ব্যাপারখানা কি, আমি ত তোদের ঝগড়ার মানে বোঝা কিছু পাচ্ছি নে।

স্ত্রী। উনি বলছেন কি জান—মেয়েদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান নেই।

ভ্রাতৃজায়া। সে কি কথা! কার কেমন রূপ, কে কেমন দেখতে—কে সুন্দর—কে কুরূপ, তা আমরা বুঝতে পারি নে? আমরা কি কাণা নাকি?

স্বামী। ঠিক কাণা নয়—একচোখো। তোমরা কুরূপই দেখতে পাও, সুরূপ কারো কখনো দেখ না। এই মনে কর—আমরা একটা সুন্দরী—এই সৌন্দর্য্য দেখলে যতটা আনন্দলাভ করি—তা কি তোমরা

কর ? তোমাদের মুখে কাউকে ত প্রায় সুন্দর বল্‌তেই শোনা যায় না !

স্ত্রী। ও মা, কি হবে ? কেন জগৎ বাবু ?

স্বামী। (রাগিয়া) জগৎ বাবু ! সে কথা কে বলছে ? আমি বলছি—যথার্থ সৌন্দর্য্য তোমাদের চোখে লাগে না—লাগে কেবল তার খুৎটা। সৌন্দর্য্য দেখে তোমরা আনন্দ উপভোগ কর না—ঈর্ষ্যা উপভোগ কর।

স্ত্রী। কেন, কাকেই বা আমি ঈর্ষ্যা-নয়নে দেখলুম আর কারই বা খুঁৎ ধরতে গেছি ?

স্বামী। কেন ললিতা—অমন সুন্দরী, আর তুমি—

স্ত্রী। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল !

ভ্রাতৃজায়া। ও পোড়া কপাল, সে আবার সুন্দরী ? তার পায়ের আঙ্গুলের নখগুলো যেন শালপাতা পানা চটালচটাল। হাতের কুনুইটা ঢিবলে বার হয়ে আছে। তার পর আবার মেয়েমানুষের অত বড় কপাল, ট্যাকাল নাক। শ্রী যে কোন্‌খানটায় তা ত বুঝতে পারি নে। চুলটা ছাই যদি পেটে পেড়ে কপালটা ঢাকে, তবু না হয় চলে—তা না, আবার ঐ চাঁদপারা কপালে আলবার্ট ফ্যাসানে চুল বাঁধা—ম'রে যাই আর কি ! মেয়েমানুষ ছোট খাট কপালটি হবে, খাঁদাপারা নাকটি হবে ; হ্যাঁ, তবে চোখ দুটি ডাগর ডাগর দেখায় ভাল। কেন, তার চেয়ে আমাদের ঠাকুরঝি কি কম সুন্দরী ?

স্বামী। (মনে মনে) হ্যাঁ, ঠিক ঐরূপ খাঁদা-পারা শ্রীটিই বটে।

স্ত্রী। তা ভাই, আমি যেন নেই সুন্দরী হলেম—তাই ব'লে কি আর কেউ সুন্দর নেই—ঐ একজনই কি বিশ্বে সুন্দর জন্মেছে ? অমন পটলচেরা চোখ আমি ঢের দেখিছি !

স্বামী। কোথায় বল দেখি ?

স্ত্রী। কেন, আমার ভগিনীপতির চোখ দুটি কি চমৎকার। দেখেছ ত বৌ ?

স্বামী। (রাগিয়া) জগৎ বাবু !—সেই বানরটা আবার !

স্ত্রী। আঁর আমার মেজ ভগিনীপতি ত আরো সুশ্রী দেখতে ! যেমন রং—তেমনি চেহারা !

স্বামী। সে হনুমানটার নাম শুনলে গা জলে।

স্ত্রী। আর সেজও যেন কার্ত্তিক !

স্বামী। (ক্রোধভরে উঠিয়া) আমি চল্লুম, বুঝেছি, সবাই সুন্দর—আমি কেবল কুশ্রী, আমার মুখ আর তোমার দেখে কাজ নেই।

স্ত্রী। কেন গো—এত রাগ কি ? সুন্দরকে সুন্দর বলেছি বই ত নয় !

স্বামী। তাই জন্ম জন্ম বল, আমি চল্লুম।

(পুষ্করিণী সোপানে দ্রুতবেগে অবতরণ)

ভ্রাতৃজায়া। এ কি ! হাসতে হাসতে সমস্তটাই শেষে হাহাকার যে !

স্ত্রী। [কাঁদিয়া) কর কি, কর কি—সব ঠাট্টা। আমি অমন কথা বলব না।

স্বামী। না, আমি আর তোমার সুখের বাধা হব না। তুমি চিরদিন সাধ মিটিয়ে ভগিনীপতিদের চন্দ্রানন দেখো।

স্ত্রী। সব ঠাট্টা গো, আমি আর অমন কথা কখনো বলব না।

স্বামী। কেন বলবে না ? জন্ম জন্ম বল। তোমার ভগিনীপতিদের রূপে মুগ্ধ হয়ে থাক—আমি জলে ডুবে মরি।

ভ্রাতৃজায়া। বলি ঠাকুরজামাই, কর কি ? মর, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু সিঁড়িতে প'ড়ে গেলে অমন চাঁদপারা মুখে চিরকালই কলঙ্ক ধ'রে থাকবে যে ?

স্বামী। (জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া) সে কথা বড় মিথ্যা নয়, তবে দেখছি, এখনে থেকেই আবার ফিরতে হোল।

গানের সভা।

গৃহকর্ত্তা গোপাল বাবু, পুরাতনানুরাগী নব্য গ্রাজুয়েট হরিদাস এম, এ ; জ্ঞানদাস বি, এ ; বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তবন্ধু ভজহরি প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসীন।

ভটচায। যাই বল, যাই কও, সেকালের মত গাইয়ে আজকাল নেই।

গোপাল। না মশায়, এ মত গাইয়ে, একবার এর গানটা শুনে তবে ও কথা বল্‌বেন।

ভজহরি। বলি কার পালাটা হবে?

গোপাল। কারো পালা-টালা নয় মহাশয়, এ হোল ওস্তাদ মানুষ, কালোয়াতি খেয়াল, ধ্রুপদ—

হরি। খেয়াল ধ্রুপদ, তার চেয়ে ত টপ্পাই ভাল।

জ্ঞান। টপ্পাটাই হোল কি না more modern invention.

হরি। modern invention বলেই কি ভাল বলতে হবে নাকি? বল দেখি আমাদের আগে যা ছিল, তার চেয়ে এখন ভাল কি হয়েছে?

জ্ঞান। তা নাই হোল—তবে তুমি যে বল্লে টপ্পা ভাল?

হরি। আমি ভাল বল্লুম because ভাল because আমার ভাল লাগে, because খেয়াল ধ্রুপদ are nothing bnt barrious meaningless gronts.

গোপাল। আরে, তোমরা যে ঝগড়া করতে বসলে!

হরি। মশায়, ঝগড়া কি, এ ত ঠিক কথা, বলুন দেখি, আগে যা ছিল, তার চেয়ে এখন ভাল কি হয়েছে?

জ্ঞান। তা ত অস্বীকার করছিনে।

হরি। তা করছ না? বস্, তবে সব চুকে গেল— then let us friends again—shake hands and say—আমাদের আগে যা ছিল, তার চেয়ে ভাল কিছু হয় নি।

ভটচায। বেঁচে থাক বাবা, তোমার মত বুঝদার ছেলে আমি একটি আর দেখি নি! বড় ঠিক কথা— সে দিনের মত আর কি এখন কিছু আছে? সেই যে রামযাত্রা—রামলক্ষ্মণ ছোট দুটি ভাই, বুকে চন্দনের চিত্র-বিচিত্র, নাকে নোলক, মাথায় চূড়া, হাতে ধনুর্ব্বাণ, নৃত্য করতে করতে হুহুঙ্কারকারী, সোনার মুণ্ডধারী রাক্ষসপতি দশাননকে—

ভজ। আ-হাহা! আর সেই কৃষ্ণযাত্রা! ধড়া-চূড়াধারী বালক কৃষ্ণ, রাঙা লাঠির বাঁশী হাতে, অলকা-তিলকায় সেজে রাধার প্রেমে গদ্‌গদ হয়ে সরু গলায় সরুসুরে অধিকারী বিন্দে দূতীকে বিনয় ক'রে বলছেন—

রাধা রাধা বলে—
মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে।

হরি। উঃ, কি চমৎকার গান!

রাধা রাধা ব'লে—
মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনা জলে।

এমন সহজ ভাবের সহজ গান এখন আর কোন কবির মুখ হ'তে বার হয় না। ইংরাজী অনুকরণে প'ড়ে কবি ত আর আমাদের নেই।

আহা! রাধা রাধা ব'লে,—
মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে।

জ্ঞান। এখন হ'লে এক জন বলতেন—

মান ক'রে থাকা আর কি সাজে,
বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জমাঝে।

সেক্‌স্‌পিয়র বলেছেন—othello the Occupation is gone—আমরাও বলতে পারি, Poetry the time is gone!—অর্থাৎ কবিতা, তোমার কাল আর নেই।

ভটচায। পয়ারের কথা বলছ বুঝি! তা যদি বল্লে ত শোন। বর্দ্ধমানের রাজা সে কালে জাত্যংশে পতিত তাঁর এক হুমড়ো-চুমড়ো বন্ধুকে জাতে ওঠাবার অনুরোধ ক'রে নদের রাজাকে একখানা পত্র দেন। তার উত্তরে নদের রাজা দুই ছত্র পয়ার লিখে পাঠান—

আমি—নহি তব অবাধ্য
এ—বহুজনরব বহুজনসাধ্য।

অন্তার্থ—আমি তোমার অবাধ্য নই, আমার ইচ্ছা, আমি তাঁকে জাতে উঠাই,—কিন্তু যে কথা বহুজনে জানে, তা বহুজনের ইচ্ছাতেই লোপ করা যেতে পারে। একা আমার সাধ্য কি তাঁকে জেতে তুলি। দেখেচ ত বাবা! দুই ছত্রের মধ্যে কি কারখানা।

ভজহরি। আজকাল এমন পয়ার আর হ'তে হয় না।

গোপাল। মশায়গণ, আজ দেখছি আপনাদিগকে কষ্ট ভোগ করবার জন্যই নিমন্ত্রণ করেছি। গায়ক মশায় আপনাদের মনের মত উচ্চাঙ্গের কবিতার গান গাইতে পারবেন কি না, আমার বড়ই সন্দেহ হচ্চে।

হরি। রাধা রাধা ব'লে—পরাণ ত্যজিব আমি যমুনার জলে! কি সুন্দর! আর কিছু নয়, একটা গান শোনাবার জন্ত কি করা না যেতে পারে?

(গায়কের প্রবেশ)

গোপাল। এই যে গায়ক মশায়! আপনার জন্ম সবাই অপেক্ষা করছি, আপনাকে আজ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করতে হচ্চে।

গায়ক। কেন মশায়, দলে এসে পড়েছি না কি?

ভটচায। (হাসিয়া)—তা বলতে পারেন—বলতে পারেন। মশায়ের একটি রামযাত্রার—

ভজহরি। একটি কৃষ্ণযাত্রার—

জ্ঞান। মশায়, আমরা আপনাকে একটি উচ্চাঙ্গের টপ্পা গাইতে বলছি।

হরি। রাধা রাধা ব'লে—জীবন ত্যজিব আমি যমুনাজলে; মশায় জানেন কি?

গায়ক। (অবাক্ হইয়া) গোপাল বাবু, আপনি ত জানেন, ধ্রুপদ খেয়াল নিয়েই আমার কারবার।

গোপাল। কি করবেন মশায়, এ দের মনের মত গানই আগে হোক্।

গায়ক। (স্বগত) কি বিপদ্—এ দেখ্ছি ভেড়ার দলে এসে পড়া গেছে—তবে ভেড়াই সাজা যাক্। একটা হাসির গান শেখা গেছলো, সেইটে গাই

গান।

ছক্রগাড়ী চক্র নাড়ী, বক্র পাড়ি মারছে!
বক্রকানু ফুংকি বেণু যন্ত্র তন্ত্র সারছে।

হরিদাস। (চোখ বুজিয়া) ওহো ওহো—

ভটচায। (মৃদুস্বরে) হরিদাস বাবু, কি হোল, ভাল বুঝ্‌তে পারছিনে।

হরিদাস। বুঝতে পারছেন না! গানের অর্থ বড় চমৎকার! আমাদের দেহরূপ এই যে ছক্রগাড়ী—এই গাড়ী যখন প্রবৃত্তিরূপ চক্রনাড়ীর বক্র পাড়ি মারে, তখন কানু অর্থাৎ পরমাত্মরূপী কৃষ্ণ আমাদের আত্মার মধ্যে সুবুদ্ধির বাঁশী বাজাইয়া আমাদের বিকৃত মনরূপ যন্ত্র মেরামৎ করেন। বুঝলেন মশায়?

গোপাল। (স্বগত) Ah! philosophy with a vengeance! এরা দেখছি ridiculausকেও sublime ক'রে তুলতে পারে।

হরিদাস। (গদগদ হইয়া) কি ভাব!

জ্ঞান। কি ভাব!

ভজহরি। ওহো ওহো!

ভটচায। আহা আহা!

(চারি জনের দশা-প্রাপ্তি)

ব্যাঘ্র-সভা।

সভাপতি ব্যাঘ্র। সভ্যগণ, আমরা সুসভ্য ব্যাঘ্র জাতি, পশুদিগের মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এই উন্নতির কারণ—

প্রথম সভ্য। আমাদের খরধার নখনখ, আমাদের দাঁতের জোরের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য? দেশকে দেশ আমরা এই দাঁত-নখের প্রভাবে উচ্ছন্ন দিই।

সভাপতি। (জিভ কাটিয়া) উহুঁ, অমন কথা বলিবেন না। মনের জোরই আমাদের প্রধান জোর। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাক্য, স্বাধীন বাণিজ্য, ইহাই আমাদের উন্নতির কারণ। আমরা যেখানে যাই, এই স্বাধীনতা বিস্তৃত করি, বিশ্বজনীন উন্নতির ভিত্তি প্রোথিত করি।

দ্বিতীয় সভ্য। উত্তম, উত্তম, আমরা উন্নত উদার ব্যাঘ্র জাতি। আমাদের যেরূপ সুবিধা, সেইরূপ বাক্য, সুতরাং আমাদের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাক্য—

তৃতীয়। স্বাধীন বাণিজ্য। গরু-ছাগল আমাদিগকে অনবরত রক্ত যোগায়, সে জন্ম তাহাদিগকে আমাদের কিছুই দিতে হয় না।

(সহসা এক জন শৃগাল সভ্যকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া) কি হে, তুমি কি বলিতে চাও?

শৃগাল। আমি শুধু একটি স্বাধীন বাক্য বলিতে চাই—

দ্বি স। বেটা, তুমি স্বাধীন বাক্য বলিবে? তোমাকে এই উন্নত ব্যাঘ্রজাতির সহিত একাসনে বসিতে দিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট, আবার স্বাধীন বাক্য! ধর বেটাকে।

(সকলের আক্রমণ, শৃগালের পলায়ন।)

(ব্যাঘ্র-দূতের প্রবেশ।)

দূত। মশায়রা গো—মশায়রা গো, আর স্বাধীনতা না, এদিকে গোথানার বড় গরুটা যায়।

সভাপতি। বড় গরুটা যায়! তার পা দুটা যে খেয়ে রাখা গেছে, যাবে কি ক'রে?

দূত। সে যাবে না মশাই, তাকে নিয়ে যাবে।

সভা। কে, নেবে কে?

দূত। কে আবার? ভালুক ভায়া। তাঁর ডাক এতক্ষণ আপনারা কেউ জানেন নি।

সভা। ভালুক ভায়া! গৌখানার নেকড়ে খানসামা কি করছে? ভালুকের কান পাকড়ে ধরুক না?

দূত। সে ত মশাই পাকড়াতেই গেছে।

সভা। তবে খবর?

দূত। খবরেরই মশায় অভাব। নেকড়ের খবর ত এখনো পাওয়া যাচ্ছে না।

প্র-স। সত্যি নাকি?

সভা। তাই ত, নেমকের চাকর, বিড়ালটা বল, কুকুরটা বল, যখন তখন আমাদের যোগাচ্ছে, তার দেখা নেই?

দ্বি-স। তার জন্তেই ত এমন পেট ফুলিয়ে ব'সে আছি, আর তার দেখা নেই?

তৃতীয়। গেল গেল, সব গেল, গরু গেল, নেকড়ে গেল, হায় হায় সব গেল!

(সকলের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)

সভাপতি। (ব্যগ্রভাবে) আরে, কেঁদ না—সভ্যগণ, আমি এখনি খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছি।

গৌখানা।

(একজন ব্যাঘ্রের প্রবেশ)

ব্যাঘ্র। বলি নেকড়ে ভায়া, হেথায় আছ হে? (নেকড়েকে দেখিয়া) এই যে নেকড়েজি, খবরটা কি বল দেখি? পাকড়ালে?

নেকড়ে। প্রভু, এতক্ষণ তা কি বাকি থাকে, সে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

ব্যাঘ্র। (আহ্লাদে) বেশ হয়েছে—ভালুক ভায়া কেমন জব্দ। কিন্তু কোথায় রেখেছ বল দেখি?

নেকড়ে। ভালুক ভায়া! তাকে কেন পাকড়াব?

সিংহ। তবে কাকে?

নেকড়ে। যাকে পারব, তাকে। ভালুক পাকড়াম কি সহজ নাকি? ভালুক ত ভালুক—মশায়, কাবুলি বিড়ালটাকে ধরতে গিয়ে দেখুন না গায়ে এখনো আঁচড়ানো দাগ।

ব্যাঘ্র। তবে কাকে পাকড়ালে নেকড়ে সাহেব?

নেকড়ে। দুটা ফড়িং।

ব্যাঘ্র। ফড়িং! কই?

নেকড়ে। একটাকে ঐ বর্ম্মার কোণে মেরে রেখে এসেছি। আর একটাকে এই পাহাড়ে মারতে চলেছি।

ব্যাঘ্র তাহার বুদ্ধিবিক্রমে মুগ্ধ হইয়া নতজানু হইলেন।

সূক্ষ্মার্থ।

আকবরের প্রমোদ-সভায়, তানসেন সুরদাস-রচিত গান গাহিলেন—

"যশোদা বার বার ইহ ভাষৈ, হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারৌ চলত গোপালহি রাখৈ।"

সম্রাট বলিলেন—"বা, কি তারিফ! কিন্তু ইহার অর্থ কি ওস্তাদজী?"

তানসেন। যশোদা ঘড়ি ঘড়ি ইহাই বলিতেছেন, ব্রজধামে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন, যিনি আমার চলন্ত গোপালকে ধরিয়া রাখিবেন?

আকবর বলিলেন, "যেমন গান, তেমনি অর্থ, বহুত আচ্ছা ওস্তাদজি।" রাজার প্রশংসায় প্রসন্ন হইয়া তানসেন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর মন্ত্রী বীরবল এইখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে বলিলেন,—"মন্ত্রিবর, যশোদা বার বার ইহ ভাষৈ, হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারৌ চলত গোপাল হি রাখৈ—এই গানটি গাহিয়া তানসেন মন উদাস করিয়া দিয়া গিয়াছেন।"

বীরবল হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি গানে উদাস হইয়াছেন, গানের অর্থে আমার উদাসীন হইতে ইচ্ছা হইতেছে। বার অর্থাৎ পৌর (পাড়া)—যশোদা পাড়ায় পাড়ায় গিয়া ইহাই বলিতেছেন, ব্রজধামে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন, যিনি গোপালকে আটকাইয়া রাখিবেন? আহা!"

(টোডরমল্লের প্রবেশ)

টোডর মল্ল। মন্ত্রিমহাশয়, অর্থটা আমার সম্মত

মনে হইতেছে না। বার অর্থে জল ও ঘার, জলের ঘার কি? না ঘাট, সুতরাং গানটির অর্থ দাঁড়াইতেছে—যশোদা ঘাটে ঘাটে গিয়া ইহাই বলিতেছেন যে, ব্রজে আমার এমন কোন মিত্র আছেন, যিনি গোপালকে যাইতে না দিবেন?

কবি ফৈজি এতক্ষণ নিস্তব্ধে তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন,—"মহাশয়গণ, আপনারা চিরকাল মন্ত্রণা প্রদান করুন, কিন্তু দোহাই আপনাদের, আপনারা আর কবিতার অর্থ করিবেন না।" জাঁহাপানা, বার অর্থে জল এবং ঘার সত্য, কিন্তু এখানে ইহা নদীর জলও নহে, জলের ঘাটও নহে। এখানে জল অর্থে অশ্রুজল এবং ঘার অর্থে অশ্রুজলের ঘার অর্থাৎ আঁখি, সুতরাং গানটির অর্থ এই—যশোদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছেন, ব্রজে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন, যিনি গোপালকে ধরিয়া রাখিবেন?

(নবাব খান খানানের প্রবেশ)

আকবর। নবাব সাহা, বিষম সমস্যা! তানসেন গান গাহিয়া গেলেন, 'যশোদা বার বার ইহ ভাবৈ হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারো চলত গোপালহি রাখৈ'—ইহার অর্থ লইয়া বড় গোল বাধিয়াছে, আপনাকে অর্থ ভাজিতে হইতেছে।

বীরবল। একবার আমার কথাটা আগে শুনুন, পাড়ায় পাড়ায় গিয়া—

টোডরমল্ল। তাহা হইতেই পারে না—যশোদা ঘাটে ঘাটে গিয়া—

কবি ফৈজি। ইহারা কি বলে মশায়! যশোদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া—

আকবর। কিন্তু তানসেন যিনি গানটি গাহিয়াছেন,—তিনি বলেন—'ঘড়ি ঘড়ি যশোদা ইহাই বলিতেছেন যে, ব্রজে আমার এমন কেহ মিত্র আছে যে, গোপালকে ধরিয়া রাখে?' এখন আপনি মীমাংসা করুন, ইহার কোন্‌টি ঠিক?

নবাব। জাঁহাপনা, এ কোনটাই এই বিষ্ণুপদের ব্যাখ্যা নয়, সকলেই আপন আপন মনের অনুভাব বলিয়াছেন মাত্র।

বাদশাহ। সে কিরূপ?

নবাব। ঐ যে কলাবন্ত তানসেন, যিনি ঘড়ি ঘড়ি নোম তোম করেন, তাঁহার মনে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, যশোদা ঘড়ি ঘড়ি বলিতেছেন। আর বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ, পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, ইঁহার মনে হইয়াছে, যশোদা পাড়ায় পাড়ায় ফিরিয়া কহিতেছেন। আর টোডরমল্ল, তুমি মুৎসদ্দি—তুমি ঘাটে ঘাটে নৌকা বাহ আর মাশুল আদায় কর, তোমার মনে ঘাটের কথাই আসিয়াছে। আর ফৈজি কবি—ইনি জগৎশুদ্ধ লোককে কাঁদিতেই দেখেন।

বাদসাহ। ইহা ত ঠিক কথা! তবে তুমি বল নবাব সাহা, ইহার অর্থ কি?

নবাব। বার অর্থে কেশ। যশোদার প্রতি কেশ ইহাই বলিতেছে, 'ব্রজধামে আমার এমন কে মিত্র আছে—যে গোপালকে ধরিয়া রাখে?"

বলিয়া নবাব সাহা আপনার শ্মশ্রুতে সতৃষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন।

আকবর বলিলেন—বাহবা! বাহবা!

তত্ত্বজ্ঞানী।

প্লাটার্ক ও তাহার শিষ্য।

প্লাটার্ক। অহঙ্কারের বিসর্জ্জনই সত্যজ্ঞান লাভের উপায়। সর্ব্বদাই মনে এই ভাব জাগ্রত রাখিতে হইবে। অহং বলিয়া বিশ্বসংসারে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই—তুমি আমি সকলি সেই এক পরমাত্মাময়।

শিষ্য। কিন্তু কি করিয়া অহংকার পরিত্যাগ করিব প্রভু? আমি যখনি মনে করি, এ বিশ্বসংসারে আমার আমিত্ব কিছুই নাই, তখনি জগৎসংসার হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করিতে থাকি।

গুরু। বৎস, জিতেন্দ্রিয় হও, মনঃসংযম অভ্যাস কর, তাহা হইলেই এই দ্বৈতভাবাপন্ন সৃষ্ট জগতের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টের একত্ব অনুভব করিবে।

শিষ্য। সর্ব্বক্ষণই ত ভাবি মনঃসংযম করি, কিন্তু কি করিয়া করিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

গুরু। মনঃসংযম অর্থাৎ প্রবৃত্তি-দমন। মানবগণ স্ব স্ব প্রবৃত্তি-জয়ী হইলেই সত্যের আলোক দেখিতে পায়।

শিষ্য। ভগবন্, যে মন্ত্র দ্বারা মনুষ্য প্রবৃত্তি দমন

করিতে পারে, আপনি তাহাই আমাকে প্রদান করুন।

গুরু। ইহার অন্য কোন মন্ত্র নাই, নিজের ইচ্ছা, একাগ্রতাই প্রবৃত্তিদমনের একমাত্র মন্ত্র, একমাত্র উপায়। অল্পে অল্পে অগ্রসর হও, প্রথমে ক্রোধ দমন কর। অহঙ্কার হইতেই ক্রোধের আবির্ভাব। যদি আমি জানি, সংসারে তুমি আমি নাই—তাহা হইলে কেই বা ক্রোধ করে, ক্রোধের পাত্রই বা কে? ক্রোধ অহংকারকে জাগাইয়া রাখে সুতরাং ক্রোধ মহাঅনর্থের মূল। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে অজ্ঞানতার উদয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে ক্রোধ দমনীয়।

শিষ্য। আপনার উপদেশে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু তথাপি ক্রোধের উদ্রেক তিরোহিত করিতে পারিতেছি না।

গুরু। অজ্ঞান! অজ্ঞান!

শিষ্য। প্রভু, যখন দুষ্ট দাস আপনার নিন্দাবাদ করিতেছিল, আমি কিছুতেই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারি নাই। এ অজ্ঞানতা—

গুরু। আবার সে গালি পাড়িতেছিল?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

(দাসের প্রবেশ)

গুরু। বৎস, দাস সর্ব্বদাই শাসনীয়। উহাকে বেত্রাঘাত কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

দাস। (সক্রোধে) আমি কি দোষ করিয়াছি? বিনাদোষে আমাকে মারিতেছেন?—

(পুনশ্চ বেত্রাহত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুর প্রতি) ভণ্ড তপস্বি, এই তোমার জিতেন্দ্রিয়তা? এই তোমার তত্ত্বজ্ঞান? অন্যকে ক্রোধ দমন করিতে উপদেশ দাও, সংযমী হইতে বল, আর নিজে অন্যের উপর এইরূপ ব্যবহার করিয়া ক্রোধহীতার দৃষ্টান্ত দেখাও!

প্লাটার্ক। (স্থির গম্ভীরভাবে) হতভাগ্য পাষণ্ড! কি দেখিয়া তুই মনে করিলি, আমি রাগিয়াছি? আমার মুখ, আমার স্বর, আমার বর্ণ, আমার বাক্য কিছুতে কি ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে? আমাম চক্ষু বিস্ফারিত হয় নাই, মুখ রক্ত বর্ণ কিংবা স্বর ভয়ঙ্কর হয় নাই, আমি আস্ফালন করিতেছি না, কিংবা লাফালাফি মাতামাতি করিয়াও বেড়াইতেছি না, আমার মুখে কেন নির্গত হইতেছে না এবং এমন কোন কথা কহি নাই, যে জন্য আমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে। রে মূঢ়, জানিয়া রাখ, এই সকলই ক্রোধের লক্ষণ।

(শিষ্যকে বেত্রাঘাত বন্ধ করিতে দেখিয়া)

বৎস্য, ইহাতে আমাতে যতক্ষণ এই বিষয় লইয়া বিচার চলিতেছে, তুমি তোমার কাজ করিতে থাক, থামিবার আবশ্যক নাই।

নিজস্ব সম্পত্তি

(সস্ত্রীক নবীন বাবু ও তাঁহার ভগিনীপতি রাখাল বাবুর কথোপকথন স্থলে নবীন বাবুর শ্যালী-পতি নভেল-লেখক ব্রজ বাবুর প্রবেশ)

রাখাল। চুপ চুপ, ঐ যে ব্রজ বাবুই আসছেন।

স্ত্রী। এই যে জামাই বাবু! নাম করতে যে এসে উপস্থিত, অনেক দিন বাঁচবে!

নবীন। দাদাঠাকুর, আসতে আজ্ঞে হোক। এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল!

ব্রজ। (বসিয়া) তা বইখানা কি পড়া হয়েছিল?

নবীন। আরে, তার কথাই ত হচ্ছিল, চমৎকার!

রাখাল। এর কাছে বঙ্কিমবাবুও দাঁড়াতে পারেন কি না সন্দেহস্থল।

ব্রজ। দেখ রাখাল, তোমাদের সমালোচনা-শক্তির প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা; এ পর্য্যন্ত এমন সমালোচক কিন্তু আর দেখলুম না।

স্ত্রী। ঠিক বলেছ! তা জামাই বাবু, তুমি যে বলেছিলে, বইখানা অভিনয় করতে দেবে, তার কি হোল?

ব্রজ। শেষে বুঝলুম, অভিনয় করতে না দেওয়াই ভাল। না জেনে কোন লোকের নামে কিছু বলতে চইনে, তবে এইটে বলতে পারি—ঈর্ষ্যাটা মানুষের মনে স্বভাবতঃই প্রবল।

নবীন। তা সত্যি বলেছ।

ব্রজ। তা ছাড়া যারা নিজে লেখে, তাদের হাতে বই দেওয়া আমার বড় ভাল মনে হয় না।

নবীন। সেঁও একটা কথা বটে, চুরি করতে পারে।

ব্রজ। আমিও তাই ভাবছি, কার হাতে দেব, কে আত্মসাৎ করবে!

রাখাল। (আস্তে আস্তে) তাতে তোমার ত ক্ষতি দেখছিনে, ক্ষতি ত অন্য পক্ষেরই।

ব্রজ। কি বলছ?

স্ত্রী। উনি বলছেন, তোমার যে লেখা চুরি করবে, ক্ষতি তারই।

ব্রজ। ক্ষতি তারই! কথাটা ঠিক—

স্ত্রী। বুঝলে না? এ লেখার Originality এত অধিক যে,চুরি ক'রে কেউ হজম করতে পারবে না। জান ত Originality গুলি ঠিক লোহার কলাই—তাতে দন্তস্ফুট করা যে সে লোকের কর্ম্ম নয়, সে কেবল তোমরাই পার।

ব্রজ (আহ্লাদে) বাস্তবিক বইখানা তোমাদের কোথায় কি রকম লাগলো, সেটা শুনলে বুঝতে পারি—

রাখাল। সমস্তই ভাল লেগেছে।

ব্রজ। তবু কোথাও কিছু বদল করার আবশ্যক দেখলে কি? তুমি কি বল হে নবীন?

নবীন। কোথাও না, কোথাও না, আগাগোড়াই ভাল।

ব্রজ। কিছু সঙ্কোচ করো না। উপযুক্ত লোকে যখন আমার লেখায় ঠিক দোষটি দেখিয়ে দেখিয়ে দেয়, তাতে আমি যেমন সন্তুষ্ট, এমন কিছুতেই না। বন্ধুরা যদি দোষ সংশোধন না করেন, তা হ'লে বন্ধুত্বই কি বল?

রাখাল। এতটা যখন বলছ—তা হ'লে আমার একটি কথা বলার আছে।

ব্রজ। কি বল!

রাখাল। আগাগোড়া বইখানি বেশ হয়েছে—

ব্রজ। বেশ হয়েছে?

রাখাল। হ্যাঁ, বেশ হয়েছে—কেবল একটু—

ব্রজ। কেবল একটু কি?

রাখাল। একটু যেন ঘটনার অভাব!

ব্রজ। ঘটনার অভাব! আশ্চর্য্য করলে যে!

রাখাল। হ্যাঁ, ঘটনা বড়ই কম হয়েছে।

ব্রজ। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! তুমি যদিও এক জন সমঝদার লোক এবং তোমার সমজদারিত্বের উপর আমার অটল বিশ্বাস, কিন্তু তবুও এ কথাটায় আমি তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারছিনে। আমার মতে বরং ঘটনাটা একটু বেশীই হয়েছে। নবীন কি বল হে?

নবীন। হাঁ, আমারও মতে ঘটনা যথেষ্ট আছে—আর প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু শেষাশেষি কৌতূহলটা যেন একেবারেই কমে আসে।

ব্রজ। কমে আসে? আমি কিন্তু অন্য যাকে যাকে প'ড়ে শুনিয়েছি, সকলেই ত বল্লেন কৌতূহল বাড়ে।

নবীন। আচ্ছা, গিন্নীকে জিজ্ঞাসা কর—উনি ত তোমার খুব এক জন admerer.

স্ত্রী। ওর যেমন কথা, তুমি শুন জামাইবাবু! আমি সমস্ত বইখানির কোথাও একটু খুঁৎ পাইনি।

ব্রজ। তাই বল! মেয়েরা যেমন ঠিকটি বোঝে, পুরুষেরা অমন কখন বুঝতে পারে না।

স্ত্রী। আমার কেবল মনে হয়—একটু বেশী বড় হয়েছে!

স্ত্রী। আকারে বড় হয়েছে, না বলছ ঘটনার আধিক্য বেশী হয়েছে?

স্ত্রী। এই অভিনয় করার পক্ষে আকারেই একটু বড় হয়েছে।

ব্রজ। শ্যালী ঠাকরুণ, তোমার কথার উপর আমার কথা নেই, তবে এটা কি না হিসাবের কথা, আমি বেশ বলছি,অভিনয় করতে গেলে পাঁচ ঘণ্টার বেশী কখনই লাগবে না, তা হ'লে বইখানা ত আর বড় হ'তে পারে না।

নবীন। সে কথা তবে যাক। খবরের কাগজওয়ালারা কি বলছে?

ব্রজ। খবরের কাগজ! তাদের মতন মিথ্যাবাদী হিংসুক, নিন্দুক, বদমাইস, ধর্ম্মবুদ্ধিহীন—যাক্, আমি যদিও তাদের কাগজ পড়িনে।

নবীন। সেটা বুদ্ধিমানের কাজ কর, তারা যে কম কঠোর গালাগালি দেয়, তাকে তোমার মত কোমল-হৃদয় লোকের বিশেষ কষ্ট পাবার সম্ভাবনা।

রাখাল। কিন্তু লেখক হ'তে গেলে সে নিন্দা শুনাটাও দরকার।

ব্রজ। তা যদি বল, তা হ'লে ঘরে বন্ধু আছে, তার খবরের কাগজ পড়ার কিছুমাত্র আবশ্যক নেই।

আর নবীন, তুমি যে ভাগ্য মনে কর, খবরের কাগজের নিন্দেতে আমি চোটে যাই, তেমন পাত্র আমাকে পাওনি। জঘন্য খবরের কাগজের প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই ভাল।

রাখাল। তা ঠিক। সে দিন ঐ কাগজটা তোমাকে কি গালটাই দিয়েছে।

ব্রজ। কি রকম?

নবীন। হাঁা সত্যি, সে কি যাচ্ছে-তাই-রকম গালাগালি।

ব্রজ। (কষ্টে সৃষ্টে হাসিয়া) বেশ বেশ, বড় নাকি ব'য়ে গেল!

নবীন। বাস্তবিক—তাদের ঝালঝাড়া দেখলে হাসিই পায়!

ব্রজ। তবু কি বলেছে শুনি।

নবীন। রাখাল, তোমার মনে আছে হে?

ব্রজ। দেখছি ভারী উৎসুক।

ব্রজ। উৎসুক! না, একটুও না। তবে কি না কি বলেছে জানাই যাক না।

নবীন। কি রাখাল মনে আছে? (চুপে চুপে) যা হয় কিছু ব'লে যাও।

রাখাল। হাঁ কতক কতক মনে আছে বৈ কি।

ব্রজ। বল না, শোনাই যাক।

রাখাল। বলেছে, তোমার কল্পনায় নূতনত্ব বা নিজত্ব কিছুই নেই। সমস্ত চুরী।

ব্রজ। সত্যি নাকি! এর চেয়ে absurd আর কি হ'তে পারে? (জোর করিয়া হাস্য) হাঃ হাঃ!

রাখাল। ঠাট্টা-তামাসাগুলি সব নিখতিতে ওজন করা—

ব্রজ। ভারী মজা! হাঃ হাঃ!

রাখাল। তুমি যে চুরী করেছ, তাও ভাল রকম ক'রে করতে পার নি, যত যেখানকার বিশ্রী বই আছে, তাই থেকে চুরী ক'রে চুরীটাও চুরীর অধম ক'রে তুলেছ।

ব্রজ। মিথ্যাবাদী! কেউটে! বোকাস্য বোকা!

রাখাল। ভাল লেখকের লেখাও যেখানে চুরী করেছ—তাও তোমার ভাষার আবর্জ্জনার মধ্যে পড়ে একেবারেই কলঙ্কিত হয়ে গেছে।

ব্রজ। নেকো-বাগীশ! গর্দ্দভ গণ্ড! ভুতুড়ে!

রাখাল। দু'এক জায়গায় যেখানে দৈবাৎ ভাষা ভাল হয়েছে, সেখানে বিকৃত কল্পনা, কুরুচি এমন ফুটে উঠেছে যে, ভাষার সৌন্দর্য্য সেখানে বাঁদরের গলায় মুক্তাহারের মত হয়েছে।

ব্রজ। গিরগিটি! গোসাপ! বইখানা তার গলায় দেখছি, গলগণ্ড হয়ে উঠছে। বিস্ফোটক!

রাখাল। আর আমার সব মনে নেই, এক বিষয়ে কিন্তু তোমার খুবই প্রশংসা করেছে।

নবীন। হাঁা, মুক্তকণ্ঠে।

ব্রজ। শুনি, শুনি?

রাখাল। বলেছে, গালাগালিগুলা যা দিয়েছে, তাতে কিন্তু আর সকলেই হার মেনেছে, সেইগুলি তোমার যথার্থ নিজস্ব সম্পত্তি।

নবীন। বাহবা! বাহবা! তা হ'লে আর কি চাও ব্রজ?

বিরহ-বেদনা

(নববিবাহিত মতি বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট, ভগিনীপতি বন্ধুবর মাধবের প্রবেশ)

মা। কি হে মতি, এমন ক'রে গালে হাত দিয়ে ব'সে কি ভাবা হচ্ছে? উঠতে আজ্ঞা হোক, আমাদের ওখানে একটা মজলিস আছে, তোমাকে নিতে এসেছি।

মতি। আমার শরীরটা বড় ভাল নেই, যেতে পারব না।

মা। কেন, কি হয়েছে বল দেখি? কপালে (কপালের উষ্ণতা অনুভব করিয়া) কই, গরম মনে হচ্ছে না তো।

মতি। (পুনশ্চ দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া) ওখানে না, এইখানে মাধব, গেলুম, গেলুম ভাই, আর পারিনে, এইখানে—কি যন্ত্রণা!

মা। (সভয়ে) হার্ট ডিজিজ নাকি? এতদিন বলনি? লুকিয়ে রেখেছ, ডাক্তার ডাকাও, ডাক্তার ডাকাও।

মতি। হার্ট ডিজিজ বটে, কিন্তু ভয় পেয়ো না, তুমি কি আর এটা বুঝতে পারছ না? তুমিও ত বে করেছ।

মা। করেছি বৈ কি?

মতি। তা তো আমি জানি, তবুও এ জ্বালা যে কেন বুঝতে পারছ না, সেইটে শুধু বুঝে উঠতে

পারছিনে। উঃ, কি সুন্দর বাতাস! মাধব, প্রিয়সখা, প্রাণবয়স্য, প্রাণ যে জ্বলে গেল।

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

মা। কিন্তু আমার তো ভাই আরাম বোধ হচ্ছে।

মতি। আমার বোধ হচ্ছে? কক্ষণো না, তা হতেই পারে না! মন্দা তো এখানে নেই, প্রিয়াসঙ্গ ছাড়া হয়ে কি ক'রে তুমি এ দক্ষিণে বাতাস উপভোগ করবে—এ আমি কল্পনাই করতে পারিনে,—নিশ্চই ঠাট্টা করছ।

মা। সত্যি ক'রে বলছি, মাথার দিব্যি, ঠাট্টা নয়, বাতাসটা বড্ডই ভাল লাগছে।

মতি। সত্যি ক'রে বলছ? হা হতভাগ্যে মন্দাকিনি! তোর অদৃষ্টে এই ছিল! হা পিতঃ! হা মাতঃ! এমন অপ্রেমিক অরসিক হৃদয়হীনের হাতে কি ক'রে তোমাদের স্নেহের কন্যা সমর্পণ করেছিলে?

মা। থাম হে, বাতাসটা গরম গরম ঠেকছে বটে—বুঝতে পারছি, ক্রমশঃই অসহ্য হ'য়ে উঠবে।

মতি। কিন্তু হে অপ্রেমিক, আমার বিরহজ্বালটা কিরূপ অসহ্য, তা কি তুমি বুঝতে পারবে?

মা। না ভাই, সেটি ঠিক পারব ব'লে মনে হচ্ছে না। সেই দশ বছরের মেয়ের প্রেমে এত হাবুডুবু, এত ফোঁশফোঁশানি, এত হাঁসফাশানি—আমার বোঝার অসাধ্য!

মতি। রে নিষ্ঠুর, রে নির্ম্মম, তা তুমি কি ক'রে বুঝবে? তা নাই বুঝলে, সে দুঃখ আমি সইতে পারি; কিন্তু হায়! আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, হৃদয়ের হৃদয়, আহা! না জানি, আমার জন্য সে কতই কাতর। একটু গরম হ'লে, একটু বৃষ্টি হ'লে, একটু মৃদু বাতাস বইলে, একটু জোর বাতাস উঠলে আমার বিরহে তার প্রাণ বোধ হয় আমারি মতন আকুল হয়ে উঠে! হায়, কে ব'লে দেবে—

মা। সেটুকু আমি বলে দিচ্ছি। অত ভাববার কারণ নেই,—এইমাত্র—

মতি। এইমাত্র? ভাই, বল বল, এইমাত্র কি? সে তো ভাল আছে? সুখে আছে সখা? সে সুখে আছে জানলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি। তার কথা শোনার জন্য যে আমি হা-প্রত্যাশ ক'রে আছি। সে চাঁদ, আমি যে চাতক—

মা। বল চকোর!

মতি। হাঁ, তা জানি, সে চাঁদ, আমি যে চকোর—সে জল, আমি যে মীন—একটি গান রচনা করেছি, শুনবে—

হায়! এমনো দিনে—
কোথায় প্রেয়সী ওলো হৃদয়হীনে,
তোমার বিরহানলে, হৃদি প্রাণ গেল জ্বলে,
মীন যেন সরোবরে—সলিল বিনে।

মা। তাই তো! এটা খবরের কাগজে বের করতেই হচ্ছে।

মতি। তা ভাই তোমরা যা হয় করো, কিন্তু আগে প্রাণপ্রিয়ার কাছে নিয়ে গিয়ে আমর দুঃখ তাকে দেখাও, আমার হৃদয় সুশীতল কর। কি বলছিলে মাধব, তার কথা কি বলছিলে?

মা। আমি বলছিলুম—সে ভাল আছে, সুখেও আছে, তার জন্য কোন ভাবনা নেই। আমি যখন গাড়ী ক'রে এখানে আসছি, দেখলুম, তাদের বাগানে সে ছুটাছুটি ক'রে খেলে বেড়াচ্ছে।

মতি। কি বল মাধব? সত্যি সত্যি? সে ছুটাছুটি ক'রে খেলে বেড়াচ্ছে? আমি সেখানে নেই, আমা-হারা হয়েও হেসে খেলে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছে? সত্যিই কি মিতু আমাকে এ কথা বিশ্বাস করাতে চাও? আমার শালী যে লিখেছেন, নলিনী আমার বিরহে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছে! হায়! রমণী ভুজঙ্গিনী প্রায়।

(হরি বাবুর প্রবেশ)

মা। এই যে তোমার ভায়রাভাই হরি বাবু এসেছেন—ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না, উনি বল্লে তো বিশ্বাস হবে? হরি বাবু, নলিনী কেমন আছে?

হরি। আমাদের নোলু?

মতি। (স্বগত) আমাদের নোলু—? উঃ, এতখানি আস্পর্দ্ধা?

মা। হ্যাঁ, তার কথাই বলছি, মতি বাবু শুনেছেন, সে অসুস্থ—তাই বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

মা। হাঃ হাঃ, অসুস্থ? এইমাত্র আমরা সকলে বাগানে খেলা করছিলেম। তার সঙ্গে ছুটে ছুটে আমার পায়ে ব্যাথা হ'য়ে গেছে—আমার পকেট থেকে চাবি চুরী ক'রে আর দেয় না।

মতি। (স্বগত) পকেট থেকে চাবি চুরী!—পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ! নলিনি, এই তোমার ভালবাসা, এই তোমার প্রেম! হায়, বিশ্বাসঘাতকতা!

মা। তার পর চাবিটা তো পেয়েছেন? এক জনের হৃদয়ে সে এমন চাবি দিয়েছে—যে, আমি এত চেষ্টা ক'রেও খুলতে পারছিনে, আবার আপনার শুদ্ধ মনের চাবি হারাবে না তো?

মতি। (সক্রোধে) মাধব, ও ঠাট্টা করো না—জান—

হরি। মতি বাবু, আপনার ভয় হচ্ছে নাকি? তা ভয় নেই। জানেন, আজ দুটি গালে দুটি চড় মেরে তার কাছ থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়েছি, মন-চাবি যদি চুরী করে তো, সেই রকম ক'রে না হয় কেড়ে নেওয়া যাবে।

মতি। (দ্বিগুণ ক্রোধে) হরি বাবু, জানেন সে পরস্ত্রী? সে আমার স্ত্রী! তার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে জানেন কতদূর অভদ্রতা করেছেন! এর জন্য আমার কাছে মাপ চাওয়া উচিত!

মা। মতি তুমি কি সত্যই ক্ষেপেছে?

মতি। আমি ক্ষেপেছি? তোমার ধমনীতে একটুও আর্য্য-শোণিত নেই, তাই তুমি ও কথা বলছ! হরি বাবু দাঁড়ান—দাঁড়ান—যদি ভরসা থাকে দাঁড়ান, যুদ্ধ চাই, আমি যুদ্ধ চাই!

(হস্ত আস্ফালন করত দণ্ডায়মান)

(হরি বাবু হাসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে
পুনরায় চৌকিতে বসাইয়া)

"মাধব বাবু, একটু জল আনুন, দেখি!"

মতি। (চৌকিতে মাথা হেলাইয়া) আঃ, কি ভয়ানক! কি অত্যাচার! কি অপমান! প্রাণ থাকতে এ অপমান আমি ভুলব না! প্রিয়ে! তোমার মনে এই ছিল! রমণী, তুমি সত্যই ভুজঙ্গিনী।

(ক্রন্দন)

সূক্ষ্ম ডাক্তারী

(অন্তঃপুরের বারান্দা—যাদবচন্দ্রের প্রবেশ)

যাদব। তোর হাতে কি রে মানি? বড় এলাচ বুঝি? ফেলে দে—ফেলে দে, এমন অসুখ করবে!

(মানির দ্রুতবেগে পলায়ন)

যাদব। (পশ্চাদ্ধাবিত হইতে হইতে পথে খোকাকে দেখিয়া) তোর গাল ট্যাবলা যে? কি খাচ্ছিস?

খোকা। মিশ্‌লি।

যাদব। (কোলে লইয়া) ছিঃ মিছরি খায় না, ফেলে দে, হাতে আরো রয়েছে যে,—দেখি—?

খোকা। কাকাবাবু, খাবি? (এক টুকরা যাদবের মুখে এবং বাকী সমস্তটা নিজের মুখে পুরিয়া) তুই খা, আমি খাই?

যাদব। আচ্ছা খা, কিন্তু আর যেন খাসনে, বুঝলি? ঝি, খোকাকে নে। এই যে শশি, কচুরি খাচ্ছিস? কে দিলে? ফ্যাল বলছি—ফ্যাল, ফ্যাল, সদ্য এতে ওলাউঠা হবে, ডাক্তার 'কনেমারা' স্পষ্ট লিখেছে।

(শশীর হাত হইতে কচুরি কাড়িয়া নিক্ষেপ)

[শশীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

(মেজ বোয়ের ঘর, যাদবের প্রবেশ)

যাদব। শুয়ে যে? আহারের ব্যবস্থা কেমন চলছে বল দেখি?

বৌ। তুমি ভাই, যেমন বলেছ।

যাদব। বেশ বেশ, এবাব দেখবে, দু'দিনে কেমন হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। secretটা কি জান? যে খাদ্য সহজে জীর্ণ করতে পারবে, তাই খাবে, হজমেই আমাদের শরীর। যদি বিশ্বাস না কর তো বরঞ্চ তোমাকে ডাক্তার কর্পেণ্টারের ফিজিয়লজিখানা খুলে দেখিয়ে দিই।

বৌ। তার দরকার নেই, তুমি যা বলছ, আমি ঠিক তেম্নি করছি।

যাদব। ইনোস ফ্রুটসল্ট-টা খাচ্ছ তো? ওতে হজমের একটু help করে—

বৌ। হাঁ।

যাদব। আয়রণ, ওটা একটু জোরাল—

বৌ। খাচ্ছি বৈ কি?

যাদব। তবে বল বেশ আছ, তোমার আর Complain করার কিছুই নেই?

বৌ। হ্যাঁ—তা তা মন্দ নেই, গা-মাথাটা কেমন ঘুরছে।

যাদব। সে আবার কি? তা হ'লে নিশ্চয়ই আহারের কোন অনিয়ম হ'য়ে থাকবে। ও একটা অজীর্ণের লক্ষণ কি না। বোধ করি লুচি খেয়েছ? আমি তো বলেছি, লুচিটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষ।

বৌ। না ঠাকুরপো, তুমি বলা পর্য্যন্ত লুচি আদতে খাই নি।

যাদব। পাঠার মাংসটা বুঝি ছাড়তে পার নি? তোমার তো দেখতুম, লুচি আর মাংসা নইলে চলে না।

বৌ। না, মাংসও ছেড়েছি।

যাদব। মাংস একটু খেলে হানি আছে, তা নয়, তবে তোমরা যে ঘি-মসলা দিয়ে রাঁধ—তা ছাড়া দুধ-টাও তোমাদের সে সঙ্গে তো বাদ পড়ে না,—মাংস আবার দুধ বড় খারাপ—বড় খারাপ!

বৌ। দুধও ছেড়েছি।

যাদব। তা ভালই—কম খেলেই শরীর ভাল থাকে। তবে গা-ঘোরাটা কেন হ'ল? ফল খাও বুঝি? ফলটা বড় বেহজমি—তা জান?

বৌ। না, ফল খাই নি।

যাদব। তবে আর তো কোন কারণ দেখছিনে, ওঃ! ফসফোডাইনটা খাওনি বুঝি?

(দাসীর বরফ-জল লইয়া প্রবেশ)

যাদব। কি সর্ব্বনাশ! বরফ-জল! তাই বল! আমি ভেবে মরছি—কেন ওরকম হ'ল! কি ভয়ানক, নিয়ে যা, এ শরীরে বরফ-জল খেলে এখনি ইন্‌টেসটাইনের overturn হবে।

দাসী। বৌঠাকরুণ ক'দিন থেকে কিছু খাচ্ছে না—অরুচি করেছে, না খেয়ে খেয়ে ঘূরনি রোগে. ধরেছে; একটু ঠাণ্ডা জল খেয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে, তাই নিয়ে এনু, খেতে দাও দাদাবাবু!

যাদব। খেতে দেব বৈ কি? আমি নিজে হাতে বিষ দিই, এই ওনার ইচ্ছা! বরফ-জল খেয়েই তো গা ঘুরছে। নিয়ে যা বলছি।

বৌ। না ঠাকুরপো, আমি আগে খাই নি, এই খেতে যাচ্ছিলুম।

যাদব। অজীর্ণ তো আর অমনি হয়নি, অবিশ্যিই তা হ'লে আর কিছু কুপথ্যি করেছ।

দাসী। না গো না, বৌঠাকরুণ সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত দু'টি ভাত ছাড়া আর কিছু মুখে দেয় নি।

যাদব। ভাত! শুধু ভাত! দাঁড়া দেখি, তাতে কি প্রপার্টি আছে, ওঃ! বুঝেছি গা তো ঘুরবেই, ওতে আলকহল আছে কিনা। বোধ হচ্ছে, পরিমাণে কিছু বেশী হ'য়ে পড়েছে, একটু বুঝে সুঝে খেও।

(বড় বৌয়ের প্রবেশ)

বড়বৌ। ও মেজবৌ, ক'দিন থেকে তোর মুখে কিছু রুচছে না, এই টাটকা নিমকি ভেজে নিয়ে এলুম, দেখ দেখি দুখানা, কেমন লাগে।

যাদব। কি সর্ব্বনাশ! নিমকি! তবেই হয়েছে।

বড়বৌ। তুমিও খাও না একখানা, দেখ না, কেমন হয়েছে!

যাদব। না না, ও সব খেতে নেই, অসুক করে।

বড়বৌ। ডাক্তারীর জ্বালায় তো আর বাঁচিনে বাবু, তবে তোমার খেয়ে কাজ নেই, মেজবৌ ধর্—একখানা খা।

যাদব। আচ্ছা কই দেখি? বেশী না কিন্তু একখানা। মন্দ হয় নি আর একখানা দেখি, না আর দু'খানা দাও।

বড়বৌ। এই থালা শুদ্ধ রইল, তোমার যখানা ইচ্ছা খাও না বাবু!

(একে একে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া)

যাদব। স্ত্রীবুদ্ধিঃপ্রলয়ঙ্করী, তোমাদের হাতে প'ড়ে দেখছি আমি শুদ্ধ মারা গেলুম। যাই, একগ্লাস পাই-রেটিক স্যালাইন খাই গে।

গাথা

—:•:—

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

উপহার

ছোট ভাইটি আমার,

যতনের গাথা হার, কাহারে পরাব আর ?

স্নেহের রবিটি, তোরে আয় রে পরাই,

যেন রে খেলার ভুলে, ছিঁড়িয়ে ফেল না খুলে,

দুরন্ত ভাইটি তুই—তাইতে ডরাই।

গাথা

সাশ্রু সম্প্রদান।

—:*:—

প্রভাত পরশে হাসিছে হরষে
কুসুম-কাননখানি,
মৃদুল মৃদুল মলয়ের বায়ে
কাঁপিছে সরসী-রাণী।

জলেতে রাখিয়ে রাঙ্গা পা দু'খানি
নলিনী, নলিনী-মেয়ে,
ঢল ঢল ঢল দুলিছে কমল,
দেখিছে তাহাই চেয়ে।

হেথায় অদূরে যুবক একটি
কাননে তুলিছে ফুল,
মল্লিকা তুলিছে মালতী ভাবিয়া,
এমনি মনের ভুল।

তুলিবারে গিয়া কামিনী-কুসুম
ফেলিছে নিশ্বাসতায়,
সে ঘায়ে অমনি খসে দলগুলি—
চমক ভাঙ্গিয়া যায়।

তুলিতে চামেলি পাতার উপরে
ফুঁ দেয় ভ্রমর বলি;
কে জানে কোথায় মনটি তাহার
পাতায় ভবিছে অলি।

মাধবী লতাটি ফুলে ফুলে ভরা,
খুঁজে না একটি পায়,
বারে বারে শুধু সরসীর পানে
ফিরিয়ে ফিরিয়ে চায়।

গোলাপ তুলিতে কাঁটায় হাতটি
বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে যায়,
বারে বারে তবু সরসীর পানে,
ফিরিয়ে ফিরিয়ে চায়।

হোলো অবশেষে ফুল তোলা তার
আসিয়ে সরসী-তীরে,
সোপান-উপরে নলিনীর কাছে
রাখিল কুসুম ধীরে।

বারেক তাকায়ে দেখি যুবকেরে,
বারেক কুসুমে হেরে;
আবার নলিনী নলিন-নয়ন
রাখিল নলিনী-প'রে।

বালিকা চাহিয়ে নলিনীর পানে,
যুবক হেরিছে তাই,
মোহময় প্রাণ, অবশ হৃদয়,
নয়নে পলক নাই।

মৃদুল সমীরে ঢলিয়ে ঢলিয়ে
চপল অলকরাশি,
চুমিছে কেমন বালার কপোল
অজিত দেখিছে হাসি।

ফুটন্ত গোলাপ লাল দুটি গাল
মধুপ অলক তায়,
মরি কি সেজেছে মধুর মধুর
আঁখি কি ফিরান যায়?

কেমন কেমন কি একটি ভাবে
শোভিত ও আঁখি দুটি
মানস-সরসে সোনার নলিনী
উঠিল অমনি ফুটি।

দেখি দেখি যুবা অনিমেষ চোখে
লইয়ে একটি ফুলে—
বালার কুন্তলে দিল পরাইয়ে
যেন রে, আপনা ভুলে।

অমনি সে বালা তুলি আঁখি দুটি
একটু বিষাদে হেসে
বলিল,—"অজিত, ফুল-আভরণ
সাজে কি আমার কেশে?"

তুলি সে ফেলিল মাথা হ'তে ফুল,
যুবক পাইল ব্যথা,—
না দেখি তা' বালা দেখে শতদল
আনত করিয়ে মাথা।

আহা হা! যুবক হইলে নলিনী
থাকিতে সরসে ভেসে,
অমনি সোহাগে দেখিত বালিকা,
অমনি ভালই বেসে।

জলেতে নামিয়ে অধীর যুবক,
কি জানি কি ভাবভরে,
তুলিয়ে ফুলটি, না ভাঙ্গিতে মোহ
সঁপিল বালার করে।

নিল সে হরসে দেখিয়ে যুবক,
বলিল,—হরষ-হৃদি—
"বলিলে না কেন তুলিতাম আগে,
এতই সাধের যদি?"

হাসিয়ে একটু চুমি সে কমলে
বলিল নলিনীবালা,—
"ভালবাসি ইহা ছেলেবেলা হ'তে
ছিল এ বালিকা-খেলা।"

—শুনিয়ে ভাতিল যুবকের মুখে
ঈষৎ হাসির ধার,
কি যেন একটি আশার আভাস
দেখা দিল হৃদে তার।

দুরু-দুরু হিয়া সুধাতে বাসনা
কি আর একটি কথা,
ফুটে ফুটে তবু, ফুটিছে না মুখ
অথচ হৃদয়ে গাঁথা;

কি শুনিতে সাধ, তবুও কেমন
ভয়ে না ফুটিছে মুখ;
থাকিতে অথচ পারিছে না যেন,
উথলি উঠিছে বুক।

আশ্বাসি মরমে, ভয়ে ভয়ে ভয়ে
বলিল যুবক পরে,—
"বল গো নলিনি, আর একটি কথা
ভাল কি বাস গো মোরে?"

"ভাল কি বাসি না, ও কেমন কথা,
ভাল কি বাসি না আর?—"
থেকে থেকে থেকে বলিল নলিনী
মুখেতে ভাবনা তার।

"ভালবাসি কি না?—ও কেমন সুরে
বলিল বালা ও কথা,
কেন গো উহাতে পাগল হৃদয়ে
বাজিল দারুণ ব্যথা?

যা শুনিতে সাধ তাই তো শুনিনু
জুড়াল না কেন হিয়া?
প্রতিধ্বনি কেন বহিয়া না গেল
প্রাণের ভিতর দিয়া?

ভাবের তরঙ্গ কই ও কথায়,
জীবন উহাতে কই?
তবে ও কেবল ব্যথার কথা কি,
নয় কিছু তাহা বই?

তবে কি, তবে কি, হৃদয়-প্রতিমা
বাসে না আমায় ভাল?
দায়ে-পড়া মত লজ্জার খাতিরে
ও-কথা বলিয়ে গেল?"

আঘাত পাইয়ে মরমে তাহার
বলিল যুবক পুন,—
"তোমারি হাতেতে জীবন মরণ
শুন লো, নলিনি, শুন;

যে দিন হইতে দেখেছি তোমায়,
হয়েছি পাগল প্রায়,
সে দিন হইতে প্রেমের তুফান
হৃদয়ে উথলি যায়।

পিতা মাতা তব বিবাহে সম্মত,
তাহাতে নাহিক ডর,
দুখ মোর, বালা, নাই আর কোন
তুমি না হইলে পর।"

কি উত্তর দিবে বাধে যেন কথা
কি বলিবে বালা তায়,
জানে যে বালিকা ভাঙ্গিবে তা হ'লে
যুবার হৃদয়, হায়!

নব-বিকসিত নব অনুরাগ
নতুন এ প্রেম তার,
অশিক্ষিত হৃদি শিখেছে নতুন
জানে না কিছুই আর।

কেমনে কেমনে ভাঙ্গিবে ও হিয়া
বলিয়ে মনের কথা?
কিন্তু তবু, হায়! বলিতে হইবে
ঘুচাবার নহে ব্যথা

বলিল বালিকা, থেমে থেমে যেন—
—"কোরো না বিবাহ-আশা,
যদিও তোমায় ভালবাসি আমি
বোনের সে ভালবাসা।"

একটি কথাতে বসনা কামনা
আশা-সুখ সাধ যত,
মন হ'তে গেল ঘুচিয়া যুবার,
রহিল মৃতের মত।

একটি যে আলো যতনে জ্বালিয়ে
রেখেছিল হৃদিমাঝ,
ভীষণ আঁধারে ফেলিয়া তাহারে
নিভিল সেইটি আজ।

আঁখি হ'তে জল পড়ে পড়ে তবু
না বহিতে দিয়া ধারা,
নিরাশার বলে বল আনি পুন
বলিল পাগল পারা;—

"থাক্, থাক্, সখি, বলো না ও কথা
শুনিতে চাহি না আর,
আপন মরণ আদেশ শুনিতে,
বল গো বসনা কার?

নাহি যদি ভালবাসো, গো নলিনি,
বোলো না সে কথা মোরে,
কিবা ফল, বল জাগায়ে তাহারে
সুখী যে স্বপনঘোরে।

স্বপনই যে লো জীবন আমার
স্বপনেই ভর করি,
জান না কি, সখি, জান না কি সখি,
পরাণ রয়েছি ধরি?

না, না, বল বল, যা বাসনা মনে,
নিঠুর বালিকা ওরে,
ভাঙ্গি এই হিয়া হও যদি সুখী
বারণ করি না তোরে।

নাহি চাহি আর ভালবালা তব
নাহি কোন আশা আর,
নীরবে বাসিব ভাল—এই শুধু
দেও মোরে অধিকার।

দাও অধিকার এইটুকু শুধু
ভালবাসি হৃদি ভোরে,
তাহাতেই যদি সুখী থাকি, বালা,
তা'তে কি বাজিবে তোরে?"

দেখিয়া যুবকে দারুণ আকুল
বালারো বাজিল তাতে,
মুছি বিন্দু অশ্রু বলিল নলিনী
হাতটি রাখিয়া হাতে,—

"একটি শৈশব-সখারে আমার
বরণ করেছি মনে,
গিয়েছে বিদেশে আসে যদি হবে
বিবাহ তাহারি সনে;

কিন্তু এই হাতে হাত রাখি তব
বলিনু শপথ ক'রে—
সখা ব'লে হৃদে রাখিব তোমারে
বাঁচিব য'দিন তরে।"

* * * * *

না ফুরাতে কথা, কে ছবিটি ঐ
সমুখে উদয় হইল তার?
"প্রাণেশ আমার"—বারেক বলিয়ে
নারিল কহিতে নলিনী আর।

নীরব বালিকা হরষে বিভল,
চৈতন তবু নাহিক জ্ঞান,
অত সুখরাশি সহিবে কেমনে
কাঁদিল সে ভারে আকুল প্রাণ।

অজিত বুঝিল কে যুবাটি ওই,
কারে দেখি বালা বিহ্বল মন,
পারিল না আর দাঁড়ায়ে দেখিতে—
কেমনে তা দেখে তাড়িত জন?

নিঃশব্দে সে চলি গেল সেথা হ'তে
প্রণয়ি-যুগলে রাখিয়া একা,

বালিকা তখন উঠি জল হ'তে
আসিয়া দাঁড়াল যেথায় সখা।

কিন্তু একি হায়! হরিষে বিষাদ
কেন সে যুবার মু'খানি ম্লান?
কত দিন পরে মিলন দু'জনে
কই সুখে তার উথলে প্রাণ?

দারুণ বাজিল নলিনীর বুকে
অভিমানে বালা দুখের ভরে
নীরবে রহিল যুবক তখন
বলিল সুধীরে বিষাদ স্বরে—

"এই তো মিলন, সখি, হইল আমার,
এই সেই বনস্থল, এই সে অশোকতল,
এই সে পাপিয়া ঢালে অমৃতের ধারা।
এই তো মলয়-বায় মৃদুল বহিয়া যায়,
দোলাইয়ে দুল দুল অলক তোমার,
ঐ সে সরসী-মাঝে, প্রফুল্ল নলিনী সাজে,
এই সেই থেকে থেকে ভ্রমর-ঝঙ্কার।

এই সব এই সব, সখি ও লো সেই সব,
সেই সব, চপলে লো বল না আবার,
কই সে এলান কেশ, সেই পাগলিনী বেশ,
প্রেমের স্বপনময়ী ছায়া সে তোমার?
কই সেই অশ্রুময়, ঢুলুঢুলু আঁখিদ্বয়,
থেকে থেকে জলে উঠে জ্বলন্ত সোহাগে?
কই সে অবশ বাণী, কই সেই মুখখানি,
শুকানো অথচ দীপ্ত, দীপ্ত অনুরাগে?
আর ত তেমন ক'রে তেমন সোহাগভরে,
হাসিতে নয়ন দুটি নাহি উথলায়,
আর তো তেমন ক'রে, সে মধুর ভাবভরে,
কহিছ না কত কথা নীরব ভাষায়।

দু'দিনেই, সখি কি লো! সকল সে ফুরাইলো,
শুনিছি আবার হবে বিবাহ তোমার,
বুঝেছি যুবক ওই, তোমার প্রণয়ী সই,
থাক সুখে, প্রবাসেতে চলিনু আবার।"

বালার নয়নে উথলিল জল,
'এ কি অবিশ্বাস—এ কি রে কথা
যার লাগি সব দিনু বিসর্জ্জন,
সেই দোষে পুন—সে দেয় ব্যথা!

যে মুরতিখানি ধ্যান ক'রে শুধু
কেঁদেই জনম কাটিয়ে গেল.
সেই অশ্রু আজো ঘুচিল না, হায়!
দয়া ক'রে নাথ যদি বা এল।'

উত্তর কি দিবে, কি আর বলিবে?
নীরব বালিকা মনের দুখে,
যুবক আবার বলিল তখন—
কত কথা তার উথলে বুকে—

"নতুন প্রেমের ভোরে
কাঁদানু আসিয়ে আমি, হায়!
আমাকে দেখিয়া তব হৃদয়-প্রণয়ী নব
চলি গেল ফেলিয়ে তোমায়।
সোহাগে 'প্রাণেশ' বলি, ডাকিলে সে গেল চলি,
আমিই সাধিনু সুখে বাদ—
আমিই ঘটানু তব হরিষে বিষাদ।

যাও গো থেকো না কাছে, সে বেদনা পায় পাছে—
বিরহ-বেদনা পাছে বাজে;
উঠুক হিমাদ্রি-শৃঙ্গ আমাদের মাঝে।
ভাল যে বাসিতে মোরে, ভুলে যাও একেবারে,
ভুলে যাও প্রিয় সম্বোধন,
কর জনমের শোধ, করিতেছি অনুরোধ,
সে প্রেমের ব্রত উদ্‌যাপন।
হৃদয়ের ধন ল'য়ে, নব সুখে সুখী হয়ে,
থাক, নাহি বাধা দিব তায়,
চলিনু জনমের মত, আর দেখা হবে না ত,
অভাগার শেষ এ বিদায়।"

যায় যায় যুবা তেয়াগি তাহারে
আর সে পারে না, ফুটিল বাণী,
বলিল,—"যেও না হৃদয়ের ধন,
তোমা ছাড়া কারে নাহি যে জানি।

"তোমা ছাড়া কারে নাহি জানি,"
অথচ দু'দিনে হইবে বিয়ে!—
হাসির একটু রেখার মতন
গেল যুবকের অধর দিয়ে।

বিশ্বাস আমারে করিল না হায়!
হাসিল নিঠুর ঘৃণার হাসি!
আলোড়িত হৃদে নতশিরে বালা
বলিল নয়ন- সলিলে ভাসি—

"দেখিয়ে এ অশ্রুরাশি, হেসো না ঘৃণার হাসি,
মাথা খাও দুখিনীর,—হেসো না ও হাসি,
যদি মুহূর্ত্তের তরে, ভালবেসে থাক মোরে,
তাহারি, তাহারি দিব্য হেসো না ও হাসি।

তুমিই ত সাক্ষী সখে, তুমিই দেখেছ চোখে,
কত ঝটিকা ঝঞ্ঝা সহেছি কি ক'রে,
কিন্তু ও ঘৃণার হাসি—জ্বলন্ত গরলরাশি—
ছুটিছে অসহ্য বেগে মরম-ভিতরে!

আমারে ভুলিয়ে গিয়ে, ছিলে যে নিশ্চিন্ত হয়ে—
—তাও তো সহিয়ে আছে এ হৃদি পাষাণ,
কিন্তু অবিশ্বাস তব, হায়! কি করিয়ে সব
ভাবিতে পারিনে আর বিদরে পরাণ।

পাতিয়ে দিতেছি হৃদি, বাসনা থাকে গো যদি,
মার মার ছুরি তাহে, দেখো কত সয়,
কর ইচ্ছা যা তোমার, কিন্তু গো ভেব না আর
ছলনার অশ্রু এ যে, মরমের নয়।

তাও ভাল ছিল সখে, স্মৃতির আলেখ্য থেকে
মুছিতে হে দুখিনীর নাম-চিহ্ন যদি,
কিন্তু রে ঘৃণার সনে, এ নাম পড়িবে মনে—
উঃ! কি জ্বলন্ত দাহে জ্বলে ওঠে হৃদি।"

শেষ করি কথা করুণ দৃষ্টিতে
আনত মু'খানি তুলিল ধীরে,
কিন্তু, হায়! কই, যুবক কোথায়?
গেছে চলি, সে কি আসিবে ফিরে?

---

(২)

কত মাস বর্ষ কত, এসেছে হয়েছে গত,
কতই ঘটনা গেছে মানুষে দলিয়া;
আজ এ সাগরতীরে মহেশের মন্দিরে
কে রূপসী সন্ন্যাসিনী ধ্যানেতে বসিয়া?

নিরিবিলি এ প্রদেশ, নাহি হেথা দ্বেষাদ্বেষ,
উল্লাস সুখের হাসি হেথা না সঞ্চারে,
বাহিরে বিনয়-ছটা, অন্তরে গরল-ঘটা,
মানুষ রাক্ষস হেথা নাহিক বিচরে।

বিশাল তমাল তাল, বিছায়ে বিমানে ডাল
আটকি রেখেছে হেথা শশাঙ্ক তপন;
নাহি যেন শব্দ-লেশ, গভীর নিস্তব্ধ দেশ,
ভীষণ গভীর যেন শ্মশান মতন।

কেবল বায়ুর সনে, মর্ম্মরিছে বৃক্ষগণে,
গরজিয়া সিন্ধু-বুকে খেলিছে তুফান;
দিগন্তের সীমা ঢাকি, নিবিড় নীলিমা মাখি,
অনন্তে অসীম সিন্ধু ঢেলেছে পরাণ।

হেথায় মন্দিরমাঝে, যৌবনে যোগিনী-সাজে,
শিবের সম্মুখে বালা উমার সমান,
বদ্ধ কর দুটি যেন শোভে পদ্মকলি হেন,
মুদিত রয়েছে দুটি নলিনী নয়ান।

ধেয়ায় মুদিয়ে আঁখি, কাহার মূরতি দেখি,
প্রতিক্ষণে উঠিতেছে চমকি যেমন;
সংযত করিয়ে মনে, আবার বসেছে ধ্যানে
তবু না মিলায় ছবি দেয় দরশন।

সহসা স্তিমিত অঙ্গ, সহসা সে ধ্যান ভঙ্গ
কে গাহিছে সে স্বরে হেথায় বিজনে?
নিরাশ ভগন স্বর, উঠিছে গগন'পর,
আবার গগনে পুন মিশাইয়েছে ক্ষণে;—

"চেয়ে আছি কবে হইবে সে দিন
সুখ দুঃখ সব ফেলিয়ে ধুয়ে,
মরণের শান্ত, শীতল কোলেতে
বিরাম লভিব মাথাটি থুয়ে।

ভাঙ্গিবে না যে কভু গভীর ঘুম
ফেলিতে কেবল যাতনা শ্বাস,
পারিবে না কভু ভাঙ্গিতে যে মোহ
ধরার নিকট পিশাচী হাস।

দেখিতে দেখিতে পলকে পলকে
একটি একটি একটি করি,
ছেলেবেলাকার সুখের স্বপন
সকলি তো এই পড়িল ঝরি।

এ জীবন-ফুল পড়িল শুকায়ে
ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না।
যত কিছু আশা ছিল এ হৃদয়ে
একটিও তার মিটিল না।

শিথিল হয়েছে দেহের বাঁধুনি,
ভুলিছে বহিতে শোণিত-ধার,
ফুরায়ে এসেছে নয়নের জল,
এক কোঁটা নাহি ফেলিতে আর।

নিভিল না তবু সে পুরাণ স্মৃতি
কত দিন আর এমন করি,
পুষিয়া রাখিব এ চিতা-অনল
মরমের এই শ্মশান ভরি ?

এ সুখের দিন আসিবে রে কবে
যে দিন অভাগা জনম-দুঃখী,
মরণের শান্ত শীতল কোলেতে
ঘুমায়ে পড়িবে মাথাটি রাখি ?”

ফুরালো বালার ধ্যান, সব শক্তি অবসান
আবার পুরাণ স্মৃতি করিল দংশন,
আবার নির্ঝ'র পারা, ছুটিল সলিল-ধারা,
বৃথাই হইল তার সন্ন্যাসিনী-পণ।

দেখিতে দেখিতে শেষে, কে হেথায় দাঁড়াল এসে ?
নয়নে নয়নে ওই হোল সম্মিলন,
“নলিনী, নলিনী হেথা” ?—
আর না ফুটিল কথা !
দোঁহারে দেখিয়ে দোঁহে যেন অচেতন !

———

(৩)

বিজন একটি বনের মাঝারে
কালের কালিমা মাখিয়ে গায়,
দাঁড়ায়ে একটি কালিকা-মন্দির
অনিত্যের স্থির প্রতিমা-প্রায়।

ভেঙ্গে গেছে তার শিখরপ্রদেশ
ঝর্‌-ঝর্‌ ইট পড়িছে খসি,
বট অশথের গভীর শিকড়
রয়েছে তাহার মরমে পশি।

ভিতরে কালিকা—করাল মূরতি,
সিঁদূরে কপাল ঢেকেছে তাঁর,
চন্দন-চর্চ্চিত ভীষণ কৃপাণ,
গলায় দুলিছে জবার হার।

আঁধার সে বনে মন্দির-মাঝারে
নিভ' নিভ' এক প্রদীপ জ্বলে,
লক্ষ্য করি তায় যুবক-যুবতী
বহু দূর হ'তে আসিছে চ'লে।

বহু পথ হাঁটি, বহু শ্রম করি,
বহু সাধ আশা করি মনে,
শ্রান্তি-ক্লান্তিময় নলিনী ও যুবা
পশিল সেই সে গভীর বনে।

যোগিনীর সাজ ফেলেছে খুলিয়ে
কুসুমে সাজান নলিনী-কায়,
তবুও এখনো বিভূতির চিনা
মাঝে মাঝে দেখা দিতেছে তায়।

জটিল কেশেতে বেঁধেছে কবরী
তাহাতে শোভিছে কুসুমকুল।
যোগিনী সেজেছে ফুলের রমণী—
শ্মশানে যে রে ফুটেছে ফুল।

পশিল দোঁহে সে মন্দির-মাঝারে
অলসে অবশ নলিনী-কায়,
মাথাটি রাখিয়ে যুবকের কাঁধে
অধীরে সকল দিকেতে চায়।

কহিল যুবক,—“কে আছ হেথায়,
কে পূজক তুমি ধেয়ানে রত ?
উঠ একবার বিবাহ-শিকলে
বাঁধ আমাদের জনমমত।”

নবীন পূজক পূজা সমাপিয়া,
চাহিল যে দিকে উভয়ে ছিল,
আধো-ছায়া ছায়া আঁধারে আলোকি,
নিভ' নিভ' দীপ উজলি দিল।

চকিতে নেহারি যুবা যুবতীরে
চমকি সহসা পূজকবর,
তখনি মুদিল নয়ন-যুগল
আবার চাহিল ক্ষণেক পর।

দীপের আলোকে উজলিত মুখ
বারেক আবার দেখিয়া দোঁহে,
অমনি তখনি নত করি আঁখি
বিবাহ-বাঁধনে বাঁধিল দোঁহে।

মন্ত্র পাঠ করি, পরাইয়ে মালা
বালার হাতটি স্ব-হাতে নিয়ে,
সম্প্রদান তাহা করিল যুবারে,
বিধিমতে দিল তাদের বিয়ে।

একবার শুধু আটকিল কথা,
একবার হিয়া কাঁপিল তাতে,
এক ফোঁটা তার আঁখি-জল শুধু
পড়িল তখন বালার হাতে।

সাধের ভাসান

কে ও উন্মাদিনী, কে ওই বালিকা,
সুধার সুরেতে ছাড়িছে তান,
আকাশ পাতাল মোহিয়া কে ওই,
আপনার মনে গাহিছে গান?

মলিন বসন, মলিন ভূষণ
এলো-কেশ-রাশি উড়িছে বায়,
শইবাল পরে শতদল সম
মুখানির শোভা বেড়েছে তায়।

ডাগর ডাগর বিজলী-উজল
নীল আভাময় নয়ন দুটি,
শুন্য ভাবভরে এদিকে ওদিকে,
চারিদিকে যেন বেড়ায় ছুটি।

কি যেন খুঁজিছে নিজেই জানে না,
অথচ পরাণ কি যেন চায়,
চোখের সমুখে গিরি-নদী-বন,
দেখেও যেন না দেখিছে তায়।

গরবে উথলি তটিনী ওই যে
আপনার মনে বহিয়ে যায়,
তীরে তীরে তার উন্মাদিনী বালা
ঐ শুন—শুন—কি গান গায়।

ভৈরবী।

"ভুলে যাও ভুলে যাও ভুলে যাও দুখিনীরে,
নহিলে হবে না সুখী একটি দিনের তরে।
এমনি অভাগী বালা, বিষাদ যাতনা জ্বালা
যেখানে যেখানে আমি,
মোর সাথে সাথে ফিরে,
ভুলিবারে কহিতে, গো'
কি বেদনা লাগে প্রাণে—
কেবলি যাতনা-জীর্ণ মরমি সে ব্যাথা জানে,
হোক তবু তাও সবে, তুমি নাথ, সুখে রবে,
তাই ভিক্ষা দাও সুখী, ভুলে যাও অভাগীরে।"

গাহিতেছে বালা জানে না সে তবু
কি গান গাইছে? কি ভাব তার।
স্মৃতি হ'তে শুধু আপনি উথলে
এ ছাড়া কিছু সে জানে না আর।

গাহিতে গাহিতে চলেছে বালিকা
কিছুতেই যেন খেয়াল নাই,
আপনার ভাবে আপনিই ভোর
বাহিরে যা হয় হোক্ না তাই।

প্রখর হয়েছে রবির উত্তাপ,
প্রহর তিনেক হয়েছে বেলা,
নদীর-উরসে, কিরণের রেখা,
চমকিছে যেন দামিনী-মালা।

দূর শূন্যপটে আঁকা আছে যেন
ও পারেতে ছোট পাহারগুলি,
দু'একটি কভু শাদা শাদা মেঘ
শিখরের পরে পড়িছে ঢুলি।

মৃদু ঝর ঝর, পড়িছে নির্ঝর,
কোথায় অথচ না যায় দেখা
মাঝে মাঝে শুধু পাহাড়ের গায়,
ঝলসিছে যেন রজত-রেখা।

নদীর মধুর মৃদুল সুরেতে,
মিশিছে মধুর নিঝর-তান,
বালিকা গাইছে আপনার মনে,
কোন দিকে তার নাহিক কান।

প্রখর উতাপ হয়েছে, হোক্ না,
বালিকার তায় আসিবে কিবা?
বহে যদি ঝড়, বহুক ঝটিকা,
কিবা এল গেল নিশি কি দিবা?

কিন্তু একি একি, চমকি উঠিয়ে
সহসা বালিকা থামিল কেন?
পরিচিত সুরে, কে গাইছে গান,
কেন রে হৃদয় অবশ হেন?

মনে পড়ে পড়ে—পড়ে না যে মনে
কি ভাবে হৃদয় উঠিল পুরে,
কে গাইছে গান—কে গাইছে গান
সেই সে পরাণ মোহিনী সুরে।

কাঁপে যে হৃদয়, বেঁধে যে পরাণে,
গানের একটি একটি কথা,
এ কি রে বালার বিভল হৃদয়ে
এ কি রে সহসা এ কি রে ব্যথা ?

নিজেই জানে না, কি ভাবে আকুল
মাথাটি ঘুরিয়ে আসিল তার,
নদীর ধারেতে গাছের তলায়,
রাখিল বালিকা শরীর-ভার।

———

(২)

তরঙ্গে, তরঙ্গে, তরণীটি রঙ্গে
নেচে, নেচে, নেচে, চলিয়ে যায়,
কে ওই যুবক, নিরাশা মূরতি,—
দাঁড়ায়ে হৃদয়-কাহিনী গায় ?

ক্ষণেকে তরীটি লাগিল তীরেতে,
যুবক একটি বিষাদ-চেতা
যে গাছের তলে পড়েছিল বালা,
আসিয়ে অমনি দাঁড়াল সেথা।

"সরলে আমার, এ কি তোর বেশ !
দেখে যে পরাণ ফাটিয়া যায় !"—
ফুটিল না আর কথা বিনোদের,
নীরবে কেবল কাঁদিল হায় !

অবাক্ বালিকা পাথর-মূরতি
কথাও একটি নাহিক মুখে,
চাহিয়া রহিল বিনোদের পানে
কি ভাবে কে জানে সুখে কি দুঃখে।

থেকে, থেকে, থেকে শতেক লহরী
বহিল নীরব নয়ন দিয়ে,
ঝাঁপিয়ে ধরিয়ে বিনোদের গলা,
কাঁদিয়া উঠিল আকুল হিয়ে।

"চিনি যে তোমায়—সেই যে, আমার,
এতদিন বল আছিলে কোথা ?"
আবার অমনি থামিল বালিকা
সরিল না আর একটি কথা।

কি যেন বলিবে সাধ আছে মনে
অথচ সকল গিয়াছে ভুলে,
আকুল পরাণে চাহিল কেবল
সজল দুইটি নয়ন তুলে!

নীরবে নয়নে প্রেম-তিরস্কার
বুঝিয়ে যুবক পাইল ব্যথা,
বালার হৃদয় বালা যা বোঝে না
যুবক বুঝিল নিগূঢ় কথা।

ফেলিল নিশ্বাস আকুল নয়নে
চাহিয়া বিনোদ স্বরগ-পানে
কাঁদিয়ে কহিল নিজের কাহিনী
বালা না বুঝিল কথার মানে।

বলিতে বলিতে দুখের কাহিনী
যুবার নয়নে বহিল ধারা,
অথচ সুখের জাগন্ত স্বপনে
আপনে যেমন আপন-হারা।

ধরিয়ে বালার সজল মু'খানি
রাখিয়ে আপন বুকেতে মাথা,
সুধাইল যুবা, "বল গো, সরলে,
বল গো কেমনে আসিলে হেথা ?"

উতর না দিয়ে বলিল বালিকা
এক দিঠে তার মু'খানি হেরে,
"বিনোদ, তুমি যে বিনোদ আমার,
দিব না, দিব না তোমায় ছেড়ে।"

বলিয়ে ঈষৎ মাথাটি নাড়িয়ে
হাসিয়ে হাসিয়ে মধুর হাসি,
ধরিল বালিকা বিনোদের হাত
পাগল বালিকা হরষে ভাসি।

হরষে তাহার, উথলিত মন
কি করিবে কিছু ভেবে না পেয়ে,
নদী হ'তে গিরি গিরি হ'তে পুন
আকাশের পানে দেখিল চেয়ে।

সহসা আবার কি ভাবে কে জানে
হাতটি তখনি ছাড়িয়ে ধীরে,
হরষে বিষাদে আধো আধো হাসি
ছুটিয়ে চলিল নদীর তীরে।

তীরের হেথায় একটি ধারাতে
বন ফুলে ফুলে পড়েছে ছেয়ে,
আনিল তখনি কত শত ফুল
তুলিয়ে যতনে পাগল মেয়ে।

নব নাম কত সোহাগে রাখিয়ে
হরষে গাহিতে গাহিতে গান।
ফুলগুলি ল'য়ে যুবার চরণে
উঁপহার বালা করিল দান।

"ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি তুলি
আঁখি দু'টি মেলি, হের গো হের,
এইটি নলিনী, কাহাকে বলিনি
চুপি চুপি আমি এনেছি ধর ;

গোলাপটি ওই, মোর হৃদি-সই
সে যে তোমা বই হবে না কারো,
হৃদি-ধনে ভুলে, তুলেছি বকুলে
সেঁউতির ফুলে, পর গো পর।"

নয়নের জল, নয়নে শুকাল,
যুবক অশনি-আহত হিয়া,
স্তম্ভিত ভাবে, রহিল দাঁড়ায়ে
বহে না শোণিত হৃদয় দিয়া।

"এই সেই বালা, সেই সে মূরতি
অথচ বালিকা সে নয় যেন!
এত দিন পরে, পেনু যদি নিধি,
কে জানে কপালে ঘটিবে হেন।"

তড়িতের মত, কি তীব্র বেদনা,
চমকিয়ে গেল যুবার বুকে,
ভাঙ্গি গেল মোহ, দাঁড়ায়ে রহিল
অভিভূত হয়ে বিষাদ-দুখে।

ফুল-রাশি ল'য়ে ছড়াল সে অঙ্গে
বালিকা অবোধ চেতনা-হীন,
সুখে দুখে যুবা তা দেখি কাঁদিল,
হরষে বিষাদে হইয়া লীন।

কাঁদিল যুবক, কাঁদিল বালিকা,
সামালিয়ে পুন নয়ন-ধারা,
বলিয়া উঠিল সহসা বিনোদ—
যাতনায় যেন পাগল-পারা।

"কি বলিব আর বলিতে কি আছে?
শোন গো ললনে, শোন গো তুমি,
সাক্ষী রবি শশী, সাক্ষী দেবতারা,
সাক্ষী এ পবিত্র জনম-ভূমি।

আজ হ'তে তুমি আমার, ললনে,
আমিও সরলে হইনু তোর,
এখনি যে তোরে করিব বিবাহ
হইবি ধরম-বনিতা মোর।

দেখি আজি এতে কেবা দেয় বাধা
আসুক সহস্র প্রলয়-ঝড়,
মরমের চির-অতৃপ্ত বাসনা
পূরাইব এত দিনের পর।

বলি হাতে হ'তে খুলিয়ে অঙ্গুরী
পরাইয়ে দিল বালার হাতে।
অনিমেষ চোখে, দেখিয়ে দেখিয়ে
হাসিল পাগল বালিকা তাতে।

ক্ষণেকে দু'জনে উঠি তরণীতে
তখনি দিল সে তরণী খুলি,
চলিল তরণী, তর তর রঙ্গে
নদীর বুকেতে লহরী তুলি।

যুবারো হৃদয়ে উঠিল লহরী
বিষাদে যাতনা সকল ভুলে,
গাহিল তখন হরষের গান
প্রমোদে হৃদয় পরাণ খুলে।

প্রণয়-বিভল ঘুম-ঘুম প্রাণে
হরষে যুবক গাহিল গান,
প্রতিধ্বনি দিল দূর হ'তে গিরি,
কাঁপিয়া উঠিল তটিনী-প্রাণ।

(৩)

মেঘে মেঘে মেঘে, ছেয়েছে আকাশ
দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর,
নদীর উরসে, ঢেউ-সাথে ঢলি
খেলে না জোছনা রজত-ধার।

মৃদুল পবন বহে নাকো আর,
গাছের একটি পাতা না নড়ে,
বহে কি না বহে তটিনী কে জানে,
ঢেউ তো একটি নাহিক পড়ে।

আঁধার আকাশ, স্তম্ভিত ধরণী
মন্ত্র-স্তব্ধ যেন চারিটিধার,
কি বিপ্লব-কথা নীরবে কহিছে
থাকে না বুঝি বা জগৎ আর।

এ কাল-নিশায় নাহি ভুরূক্ষেপি,
ঝপ্‌ ঝপ্‌ ঐ চলেছে তরী,
প্রকৃতির ঘোর নিস্তব্ধ-আকার
সে শবদে আরো ভীষণ করি।

সহসা অশনি কড় মড় কড়
ঘোষিল ভেদিয়া আঁধার নিশি,
নিবিড় জলদ, ভীম গরজনে
সঘনে কাঁপায়ে তুলিল দিশি।

বীর পরাক্রমে, এদিকে ওদিকে
মাতিয়ে বহিল পবনরাশি,
ধাঁধিয়ে দিগন্ত বেড়াইছে ছুটে
সুবিকট ঐ দামিনী হাসি।

নহে সে তটিনী, প্রশান্ত মূরতি,
সংহার-মূরতি ধরেছে এবে।
সফেন-তুফানে আক্রমিছে বেলা,
দুর্দ্দাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিছে সবে।

দুরবল তরী তুফানে উঠিছে,
আবার তুফানে পড়িছে কভু,
বিনোদের সাথে বালা সে তরীতে,
কোন ভয় ডর নাহিক তবু।

হাসিলে দামিনী, হাসিছে বালিকা
উথলিলে ঢেউ উথলে হৃদি,
গরজিলে মেঘ হেসেই আকুল
কি ভয়, কাছেতে বিনোদ যদি।

বায়ুর হুঙ্কারে উড়িছে তরণী
কোথা মাস্তুল, কোথায় হাল,
অটল গম্ভীর দাঁড়ায়ে বালিকা
উড়িছে পবনে চিকুরজাল।

হৃদয়ে তাহার, নারে প্রবেশিতে
বাহিরের দুঃখ বিষাদ কোন।
তাহারি আদেশে বহে যেন ঝড়—
অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঝড়েরি যেন।

বহিছে ঝটিকা ভীষণ তুফানে
গেল গেল আর রহে না তরী,
"আমরা দু'জনে—দু'জনে আমরা—
কি সুখ বালিকা যদি বা মরি।"

বলিয়া বিনোদ বালিকার মাথা
রাখিয়া প্রণয়পূরিত বুকে,
নাহি ভুরুক্ষেপি, সে প্রলয়-ঝড়ে
ভাসিল গাহিতে গাহিতে সুখে।

মল্লার।

"ঘোষে বজ্র কড় মড়, কাঁপে পৃথ্বী থর থর
প্রলয়-বিপ্লবি কাঁপে সর্ব্ব-চরাচর,
উন্মত্ত পবন ছোটে, তটিনী গরজি ওঠে,
তরঙ্গ ছুটিছে যেন সচল ভূধর।
"পাগলিনি শোন ওরে, তোরে এই বুকে ধোরে,
বাহিরের ঝড় জ্বালা পশে না অন্তর,
তরী যায় যাক্‌ ডুবে, কি ভয় আমরা উভে
সুখের শয়নে রব, নদীর ভিতর।
আয় সখি, হৃদে রাখি, তুমি দেখ আমি দেখি,
বাহিরে প্রলয়-ঝড় হোক যা হবার।"

খড়্গ পরিণয়

—:*:—

Rutna (Rana of Mewar) had married by stealth the daughtea of Prithuraj of Amber ...., ..., His duuble edged sword, the proxy the Rajput cavalier, represented Rutna on this occasion.

Tod's Rajasthan, Vol I. page 308

(১)

ঘুমঘোরে ঢোলে, তারকার কোলে
শোভিছে চাঁদিমা আকাশমাঝে;
অম্বরের রাজা পৃথ্বীরাজ-বালা
দ্বিতীয় চাঁদিমা প্রাসাদে রাজে।

নব ঊষা জিনি বরণ-মাধুরী
কল্পনারি শুধু প্রতিমা হেন,
বাসব-ধনুর মাধুরীটি দিয়ে
জোছনা মাখিয়ে সৃজিত যেন।

স্থির-বিজলীর স্নিগ্ধ-দ্যুতি সম
বিছানায় বালা রয়েছে শুয়ে,
ঈষৎ ঈষৎ এক পাশে ফিরে
রয়েছে হাতটি উরসে থুয়ে।

মুক্ত বাতায়নে আসিছে জোছনা
ঝলসে ওই যে কৃপাণ গায়,

একমনে বালা অনিমেষ চোখে
আপনা ভুলিয়ে দেখিছে তায় ;
কল্পনা-লহরী ছুটিছে তাহার,
লেগেছে হৃদয়ে সুখের ঘোর,
বিভল বালিকা আশার নেশায়
সাধের স্বপনে রয়েছে ভোর।

সহসা অলকা উঠিল চমকি
সাধের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল,
ডাকিয়া তাহারে, স্বজনী চপলা
হাসিয়ে হাসিয়ে কাছেতে এল।

"ডাকিছেন রাণী, আয় লো অলকা,
শুনেছিস কি লো খবর, তবে ?
বিখ্যাত সুরয বুন্দি-নরপতি
তার সনে তোর বিবাহ হবে।"

"সুরযের সনে হইবে বিবাহ ;"—
অশনির সম বাজিল বুকে,
শোণিত-লহরী থামিল বহিতে
গোলাপ-কলিকা শুকালো মুখে।

নীহার-পীড়িত শ্বেত পদ্মসম,
এলায়ে পড়িল অবশ কায়,
নয়নের জ্যোতি হইল মলিন,
প্রভাতে চাঁদিমা যেমতি হায় !

শোভিল বদনে হিম স্বেদ-কণা,
বুক হ'তে হাত পড়িল খসি',
ক্রমে ধীরে ধীরে ভাঙ্গিল সে মোহ,
বলিল ব্যাকুলা উঠিয়া বসি ;—

"উপহাস তুমি করিও না আর
চপলে, তোমায় মিনতি করি,
হাসিবার কথা নয় এ তো সখি,
বল সত্য কথা চরণে ধরি।

শুনিয়ে স্বজনি কাঁপে যে লো হিয়া
আমি যে সধবা—আমার বিয়ে ?
মাথা খাস্, সখি, রাখ উপহাস,
কি সুখ আমারে বেদনা দিয়ে ?"

কহিল চপলা শুনিয়ে এ কথা
ব্যথিত পরাণে মুছিয়ে বারি,—
"হেসে যদি থাকি ক্ষম গো, অলকা,
সুখের সে নয়, শপথ করি।

সত্যই, সকল হইয়াছে স্থির,
তোমা সনে হবে বিবাহ তার,
প্রকাশ' এবার বিবাহ তোমার
গোপনে কেমনে রাখিবে আর।

মুমূর্ষু বালিকা ধীরে, ধীরে, ধীরে,
বলিল যাতনা-অস্ফুটস্বরে ;—
"বিবাহের কথা কেমনে প্রকাশি,
প্রাণেশ যে মানা করেছে মোরে।

ওই তরবারি তাঁরি প্রতিনিধি,
যা' দেখি বাঁচিয়ে রয়েছি আমি,
রাজা হ'লে পর, উহার বদলে
প্রকাশ্যে আমারে লবেন স্বামী।

এখন এ কথা প্রকাশ হইলে
বিপদে যে তাঁরে পড়িতে হবে,
না পাবে রাজত্ব প্রাণেশ তা হ'লে
কেমনে সে কথা প্রকাশি' তবে ?"

চপলা-নয়নে জ্বলিল চপলা,
শুনিয়ে সরোষে কহিল "সখি,—
মুক্তকণ্ঠে আজ বলিব সকল
এত দিন যাহা রেখেছি ঢাকি।

পাপিষ্ঠ অধম সেই দুরাচার,
জানিনে কি ব'লে দিব লো গালি ;
ছলে অধিকারি হৃদি সরলার
চরণে দলে সে কোমল কলি,

হয়েছে সে রাজা, পেয়েছি খবর,
কোথায় প্রতিজ্ঞা রহিল তার ?
তুমি হেথা একা দহিছ বিরহে
তাহারি ধেয়ান করিয়ে সার।

কিসের বন্ধন—গেছে সে বাঁধুনি ;
কর কর সখি বিবাহ পুন,
ফেলে দাও দূরে প্রতিনিধি-অসি
ভোল সে প্রণয়, মিনতি শুন।

হয়েছে সে রাজা, হয়েছে সে রাজা
তবু সে প্রতিজ্ঞা রহিল না রে।"
—পারিল না বালা সামালিতে আর
মুরছি পড়িল যাতনা-ভারে।

(২)

নাহি সে অলকা, সে শরীর এবে
প্রভাহীন যেন উষার তারা,
মলিন বরণ, মলিন মু'খানি ;
নয়নে কেবল বহিছে ধারা।

এক মাস শুধু পেয়েছে সময়,
বিবাহ তাহার মাসেক পরে,
চিতোর-রাণায় পাঠয়েছে লিপি,
পথ চেয়ে আছে তাহারি তরে।

অবশুই রাজা লইতে আসিবে—
ভগন পরাণে রেখেছে বাঁধি,
ভয়ে ধুক ধুক করে তবু হিয়া,
দিবসে যামনী কাটায় কাঁদি।

"ঐ যে বাজনা বাজে ও কিসের,
আসিছে আমার প্রাণেশ নাকি ?"
অধীর পরাণে ছোটে বাতায়নে
খোঁজে চারিদিক আকুল আঁখি।

"ও কিসের গোল ?—আসিছে কি সেনা ?
ঐ না বিষম উড়িছে ধুলি ?
অশ্বের হ্রেষাতে পুরে যে গগন,"—
দূর পানে চায় মাথাটি তুলি।

নিমেষে নিমেষে, পলকে পলকে,
দেখে মরীচিকা আশার ছলে,
আবার তখনি নিরাশায় পড়ে
স্বরগ হইতে পাতালতলে।

কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুম এল যদি,
স্বপনে চমকি জাগিয়া ওঠে,—
"ঐ বুঝি এল প্রাণেশ আমার"—
আশার কুহকে আবার ছোটে।

দিন যায়, ক্রমে গেল আধা-মাস ;
সমাচার তবু এল না কোন,
দেখিয়ে চপলা অলকার দশা
বলিল, "স্বজনি, শোন লো শোন ;

স্বরগ-কুসুম তুমি, লো অলকা,
পিশাচ-অধম চিতোর-রাণা,
তার তরে তুমি স'পিবে পরাণ,
শুনিবে না তবু কাহারো মানা ?

রাগে-দুখে হৃদ জ্ব'লে যায় মোর,
বল লো স্বজনি, বল লো মোরে,
তো-হেন এমন অমূল্য রতনে,
সে মূঢ় কি কভু চিনিতে পারে ?

যদি সখিত্বের থাকে মূল্য কিছু,
তাহারি শপথ অলকা তোরে,
বিয়ে কর পুন প্রকাশিয়ে সব,
ক'দিন রহিবি কৃপাণ ধোরে ?"

কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত আঁখি দু'টি,
ক্লান্ত কায়-মন সহিয়ে জ্বালা,
শূন্য-পারা আঁখি তুলি সখী-পানে
স্খলিত বচনে বলিল বালা ;—

"যাতনার এই দুখময় সুখ
তুই কি বুঝিবি, স্বজনি ?—
কি বুঝিবি তুই, কি যে এত সুখ
কাঁদিয়ে দিবস-রজনী ?

এমনি অমূল্য যাতনার এই
জীবন, আমার ঠাঁই লো,
চির-হাসিময় সুখের জীবন
বিনিময়ে নাহি চাই, লো।

হাসিবার কথা নয় এ তো, সখি,
হেসো না এ কথা শুনিয়ে,
হেসো না, হেসো না, দিও না-ক ব্যথা
আর, লো, ভুলিতে বলিয়ে।

আজীবন ধ'রে জ্বলিব পুড়িব
সারাটি দিবস-রজনী,
তবুও তবুও, হৃদয়ের ধনে
ভুলিব না কভু, স্বজনি !

তবু, তবু এই সাধের আগুন
নিভাব না কভু জনমে,
পুষিয়ে রাখিব যতন করি
মরমের জ্বালা মরমে।"

রাগে দুখে জ্বলি বলিল চপলা,
"থাক তবে তারি ভাবেতে ভোর,
নতুন আমোদে নব প্রেমে মজি
অবহেলে হৃদি, যে জন তোর।"

'অবহেলা করে রতন তাহারে
মজিয়ে নূতন আমোদে প্রেমে !'—
বাজিল কথাটি অলকার বুকে,
বলিল বালিকা একটু থেমে।—

"সত্যিই কি তবে ফুরায়েছে সব
সকলি এখন স্বপন প্রায় ?
ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, হৃদয়ের ভাব
তাও ফুল হেন শুকায়ে যায় ?

উঃ! এ কি কথা, কি মরম-ব্যথা,
এ কি রে প্রণয়, কি রীতি তোর !
পার হাসি হাসি গলে দিতে ফাঁসি
পরায়ে সোহাগে কুসুম-ডোর।

ছি! ছি! ছি! এ কি রে প্রলাপ আবার
কি কথা বলিনু মরম-দুখে ?
প্রাণের প্রেয়সী ললনা লইয়ে
থাক সে আমার মনের সুখে !

বিবাহের কথা হবে না প্রকাশ
প্রকাশ করিতে আছয়ে মানা,
এ প্রাণ থাকিতে হবে না তাহা তো,
য'দিন আদেশ না দেন রাণা।

নিন্দো না লো তায়, মিনতি তোমায়
ভুলুন আমারে ক্ষতি তো নাই,
অধীন এ জনে চরণে দলিয়ে
হয় যদি সুখ হোক্ না তাই।

আমি তো, স্বজনি, মরিতে বসেছি,
নাহি সাধ আর কোনো-ই সুখে,
আমি তো প্রবাহে দিয়েছি লো ঝাঁপ,
ভেসেছি তো আমি স্রোতের মুখে।

মরিতে তো আমি করিয়াছি পণ
মরণে কিছুই ভয় তো নাই,
মরিবার আগে দু'একটি কথা
তাঁর কাছে শুধু শুনিতে চাই।

কি বলেন তিনি তাই শুনিবারে
এ প্রাণ এখনো রয়েছি ধ'রে
কি তাঁর বলিতে আছে কি তা' না শুনি
মরিতেও সজনি হবে না স'রে।"

বলিতে বলিতে তীব্র যাতনায়
আলোড়ি উঠিল হৃদয়-তল,
মরম ভেদিয়া উৎসের মত
নয়নে উথলি উঠিল জল।

নীরবে নীরবে কাঁদিল অলকা,
সখীও কাঁদিল তাহার দুখে,
সামালিয়া পুন বলিল, সখীর
হাতটি রাখিয়া আপন বুকে,—

"ব্যথার ব্যথিনী, তুমি গো স্বজনি
একটি মিনতি করি গো তোরে,
তুই না বাঁচালে কে বাঁচাবে আর
এ হেন দারুণ বিপদ ঘোরে ?

দিগন্ত বেয়াপী বিকট শ্মশানে
তুমি গো একটি কুসুম মম,
আঁধার আঁধার অনন্ত আকাশে
জ্বলিতেছে ধ্রুব তারকা সম।

রাখ কথাটি লো, স্বহাতে লিপিটি
দিয়ে এস তাঁরে মিনতি ধর,
প্রথম লিপির উত্তর না পেয়ে
জানিলে সখি, এ কেমন ডর।"

করুণ-হৃদয়া সম-সুখ-দুখী
চিঠিখানি লয়ে আপনার হাতে,
সন্ন্যাসিনীসাজে চপলা রূপসী
চলিল চিতোর সেই সে রাতে।

(৩)

বিবাহ হইয়ে গেছে অলকার,
ফুল-শয্যা আজি—লেগেছে ঘটা,
বুন্দি নগরেতে বাজিছে বাজনা,
ধাঁধিছে নয়ন দীপের ছটা।

কুসুমে কুসুমে সাজান সহর—
ফুলের বিছানা ফুলের ঘর,
সুবাসে [illegible] উথলায় দিক্,
কুসুমশর-তনু বধূ ও বর।

চারিদিক্ হ'তে পড়ে হুলুধ্বনি,
বরের বামেতে বসেছে ক'নে,

কিন্তু ও কি, হায়! ও কিসের ছবি,
হতেছে কি বিয়ে মৃতের সনে?
নেত্রে নাহি জ্যোতি, না পড়ে পলক,
স্তবধ শোণিত বালার বুকে,
নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে না তো—কই?
অমানুষী শ্বেত-বরণ মুখে।

কি ঘোর বিষণ্ণ আনত মু'খানি
দেখিয়ে পরাণ শিহরে তায়!
উৎসব আমোদ উথলে চৌদিকে
সে সবে বালিকা মৃতের প্রায়।

দুখানি শুকানো ফুলের মতন
তবু সে মুখের নাহিক তুল,
অঙ্গের কুসুম কি করিবে আর—
ফুলের সমাধি করিছে ফুল।

সহসা থামিল মঙ্গলাচরণ,
ঘোর কোলাহলে পূরিল দিশি,
ভয়ে শিহরিল কুল-নারীগণ,
রণবাদ্যে কাঁপি উঠিল নিশি।

এসে, মহারাজে দিল সমাচার—
"নগর বেড়েছে চিতোর-রাজ,
বলে অলকারে লইবেন তিনি।"—
উৎসবের শিরে পড়িল বাজ!

বজ্রের মত পড়িল কথাটি,
নবোঢ়া রমণী ফেলিয়ে থুয়ে,
ছেড়ে সুকোমল কুসুম-শয়ন
চলিল ভূপতি সমর-ভুঁয়ে!

ছিঁড়ি নারীগণ ফুল-আভরণ,
নিভায়ে ফেলিয়ে আমোদ হাসি,
বিদায় হইতে স্বামিগণ সাথে
চলিল নয়ন-সলিলে ভাসি।

সবে গেল চলি, একাকী অলকা
বসিয়ে রহিল বিছানা'পরে,
হৃদয়-আঁধারে কি হুলুস্থুল
বর্ণিয়া কে তাহা বলিতে পারে?

সহসা চপলা দেখা দিল আসি
পত্র একখানি সঁপিল হাতে,
নিভিবার আগে জ্বলে যথা দীপ
জ্যোতিহীন আঁখি জ্বলিল তাতে।

বলিল চপলা—"তোর নাম করি
রাজা সনে আগে করিনু দেখা,
পত্রখানি এই দিলেন আমায়
উত্তর এ নয়, আগের লেখা;

পরে, তোর সব কহিনু কাহিনী,
হাতে দিনু তোর লিপিটি লয়ে,
এসেছেন তাই উদ্ধারিতে তোরে
লিপির উত্তর আপনি হয়ে।"

বালিকা অধীর বিকম্পিত হিয়া
হিম-আর্দ্র হাতে লিপিটি খুলি,
তৃষ্ণাতুর জন পিয়ে যথা বারি,
পড়িল সতৃষ্ণে আপনা ভুলি—

"গত নিশি স্বপনে, মরমের বিজনে
মরি কি তোমার রূপ দেখিনু অলকে!
সেই ছটা-মহিমা, সেই প্রেম-প্রতিমা,
দেখিতে দেখিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল পলকে।

যেন হেসে হেসে লো প্রেমময়ী বেশে লো,
সোহাগে, প্রেয়সি, তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে;
কিবা ধীর তাকানি, লাজ-মাখা মু'খানি
ঈষৎ পড়েছে ঢাকা অলকের আড়ালে।

কতগুলি এলোচুল করিয়ে লো যেন ভুল
ছেয়েছে ঝাঁপায়ে পড়ি আধো বাম নয়নে,
প্রেমাশ্রুতে মজিয়ে, অপরূপ সাজিয়ে,
লতাইয়া পড়িয়াছে ফণিনীর ধরণে॥

নীহারেতে ধোয়ানো, একরতি নোয়ানো,
গোলাপটি যেন মরি মুখখানি বিকাশে;
আঁখি দু'টি ঢলিয়ে ভাবে যেন গলিয়ে,
স্নিগ্ধ বিজলীর মত দ্যুতি নব প্রকাশে।

সুধামাখা অধরে, হাসিরাশি না ধরে,
মনের উচ্ছ্বাস যেন তরঙ্গিছে শরীরে;
সরমের লাগিয়ে, রাঙা রাগে রাগিয়ে,
কি মধুর সাজিয়াছে মুখখানি মরি রে।

আমি উঠি অধীরে, কণ্টকিত শরীরে,
যেমন ধরিতে যাব তোমারে লো হরষে,

তুমি সেই রমণী, উবে গেল অমনি,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর প্রভাতের পরশে।
সে অবধি সরলে, জ্বলি মনো-অনলে,
কি দুখে কাটাই দিন বলিব তা'কেমনে?
একবার আয় লো, পরাণ যে যায় লো,
জ্যোতির প্রতিমা তুই এ আঁধার জীবনে।

রাজ-ব্রত ধরিয়ে ছিনু যেন মরিয়ে,
কি যাতনা সহিনু যে না পারি কহিতে;
আর যে তা হয় না, প্রাণ তাতে রয় না,
সসৈন্য সেনাপতি ভেটি তারে লইতে।

পিতা মাতা ভ্রাতারে, আত্ম-বন্ধু সবারে,
প্রকাশিয়ে এ বিবাহ আয় হৃদি-আসনে।
তোর ধন এ হিয়ে হাতে হাতে সঁপিয়ে
যত কিছু অপরাধ ডুবাইব মিলনে।"

সজল নয়ন, দুরু দুরু হিয়া,
কি পড়িছে যেন জানে না বালা,
কতই পড়িল কতই চুমিল
বুকেতে রাখিল নিভাতে জ্বালা।

বলিল সখীরে,—"শেষ ভিক্ষা মোর
শেষ অনুরোধ রাখ লো সই,
ছদ্মবেশে তারে আন গে এখানে
জনমের মত দেখিয়ে লই;

মুহূর্ত্তের তরে দেখিব রতনে
একবার তারে আনিয়ে দেহ,
সন্ন্যাসীর বেশে আন গে তাহারে,
বাধা তাহা হ'লে দেবে না কেহ।

কি আশে বাঁচিব? অদভুত কথা।
দুই বিয়ে, জায়া কাহার আমি?
বিবাহের দিন প্রতি মুহূর্ত্তেকে
ভাবিনু লইতে আসিছে স্বামী।

মরিবারে গেনু, মরিতে দিলে না,
জানিনে কেমনে হয়েছে বিয়ে,
জানিনে কেমনে কি যে কি হয়েছে
যামিনী কেটেছে কোথায় দিয়ে।"

শুষ্ক অধর নীরব বাসনা
আশাতেও যেন ভরসা পাই,
সম-সুখ-দুখী চপলা তখন,
চলিল তখন রাণার ঠাঁই।

একেলা অলকা—কেবা দিবে বাধা?
এলোথেলো করি ফেলিল কেশ,
ফুলের গহনা ফেলিল ছুড়িয়া,
ধরিল বালিকা বিধবা-বেশ।

কুসুম-বিছানা টেনে ফেলি দূরে
কঠিন ভূতলে সঁপিয়া কায়,
জনমের শোধ দেখিতে রতনে
পথ-পানে বালা কাতরে চায়।

(৪)

শত শত তারাদলে, হাসিয়া অম্বর-তলে,
ভ্রূভঙ্গে উড়াতে চায় অন্ধকার স্থির,
শতেক জোনাকি ভাতি, চমকে ভীষণ রাতি,
ভীষণ আঁধার তবু অটল গম্ভীর।

সৈন্যগণ হুহুঙ্কারে, রণসজ্জা আড়ম্বরে,
রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবারে চায়,
বিজনে উদ্যান-মাঝে, তবু কি অশান্তি রাজে,
সে রবে নিস্তব্ধভাব দ্বিগুণ বাড়ায়।

নিস্তব্ধ হেথায় দিশি, নিস্তব্ধ গভীর নিশি,
নিস্তব্ধ রতন রাণা, অলকা কুমারী,
কথা তার নাহি সরে, নয়ন ধরণী'পরে,
দর দর অবিরত বহে অশ্রু-বারি।

দেখিয়ে হৃদয়-ধন, উথলি উঠেছে মন—
এই সেই দেবজ্ঞানে যাহারে সে বালা
পূর্ণ বিশ্বাসের ভরে হৃদয় সঁপেছে করে,
সে-ই শেষে অবিশ্বাসী!—কি জ্বলন্ত জ্বালা!

এই সে কি? যেই জন! পাইতে বালার মন,
পরিত ঠেলিতে পায়ে স্বরগের ধন;
সেই আজ হৃদি পেয়ে, বিষাক্ত কৃপাণ দিয়ে,
ছিন্ন করি নিরখিছে হরষে এমন!

বালা নম্র বিষাদিনী, আজিকে সে গরবিণী
বহিতে দিবে না ধারা গর্ব্বিত নয়নে,
মরমের শিরা টুটে, এক বিন্দু অশ্রু উঠে,—
হাসিয়ে দেখিবে কেহ তাই বাজে মনে।

আঁখি হ'তে উৎস ধায়, দিবে না বহিতে তায়।
আটকি রাখিতে তারে চায় প্রাণপণে।

প্রণয়ের অপমানে, দারুণ বেজেছে প্রাণে,
ছিন্ন ভিন্ন মন-প্রাণ বিষম বেদনে।
বেদনা পাইছে এত, ব্যথা না ভাবিছে তা তো,
সাধ করি উপভোগে যেন সেই জ্বালা,
কার তরে পায় দুখ ? দুখেতেই তার সুখ,
দুখ জানাতেও বাম, অশ্রু ঢাকে বালা।

কিন্তু শৈল-শির দিয়া, ভেদিয়া পাষাণ হিয়া,
নিরঝর ঝর ঝর বহিয়া যে যায় ;
বাধা কোন নাহি মানে, চলেছে আপন টানে,
আটকি রাখিতে গিরি পারে কি তাহায় ?

অলকার অশ্রু-মুখ, দেখিয়া দহিছে বুক,
তবু না ফুটিতে পারে চিতোরের রাজ,
দোষী মনে আছে তাই, কহিতে সাহস নাই,
কেমনে কি বুঝাইবে অলকারে আজ ?

মৌন আছে নরপতি, তাহাতে ভাবিছে সতী,
তাহার বিষাদ-দুখে স্বামী অন্যমনা ;
নূতন প্রণয়-কথা, হয় তো হৃদয়ে গাঁথা—
ভেঙ্গেছে কপাল তার, গেছে—গেছে জানা।

নিবারিতে অশ্রুজল, আরো বালা করে বল,
গরবিণী ম্রিয়মাণা তাতে বাধা পেয়ে,
রাখি মাথা বাহু'পরে, তখন দৃঢ়তা স্বরে,
বলিল আগের সেই লজ্জাবতী মেয়ে।

"উথলিত অশ্রুবারি, এ পোড়া নয়নে হেরি
ভাবিও না আমারে যে ভুলে গেছ কাঁদি তাই।
তুমি আছ শান্তি-সুখে, কাঁদিব আমি কি দুখে,
কে আমি করিব আশা ও-হৃদয়ে পেতে ঠাঁই ?

ভাল যে বাস না মোরে, ভুলেছ যে একেবারে,
ভালই করেছ সখে, কি আর ভাবনা তবে ;
ভাবি দুখিনীর কথা, আর তো পাবে না ব্যথা,
তুমি তো নিশ্চিন্ত হ'লে হোক যা আমার হবে ?

পাছে সম-দুখী জনে, ব্যথা দিই অকারণে,
আমা দুখে পাছে তব মু'খানি মলিন হয়,
এই যে আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা দূরে গেল,
আর তো বাস না ভাল, হয়েছ পাষাণময়।

তবে আর কিসে ডরি, যাহা ইচ্ছা তাহা করি,
নাই তো প্রেমের ডোর কে আর রাখিবে বাঁধি,
নিশ্চিন্তে মরণ-বুকে, যেতেছি ঘুমাতে সুখে,
সুখ-অশ্রু পড়ে তাই ভেবো না দুঃখেতে কাঁদি।"

শুনি সে বিষাদ-কথা, কাঁপিল উদ্যান-লতা;
বিষাদে কুসুম, বায়ু নীরবে কাঁদিল,
হয়ে দুখ-বিচঞ্চল, কাঁপিল কমলদল,
নীরবে নীহার-বিন্দু খসিয়া পড়িল।

বাজিল রাজার বুকে, কথা বাহিরিল মুখে,
ধীরে ধীরে বিনাইয়া বলিল তখন,—
"তুমিই প্রেয়সী মোর, কেন এ সন্দেহ তোর,
ম্রিয়মাণ অভিমানে কেন লো এমন ?

কাজে ব্যস্ত সর্ব্বদাই, আসিতে পারিনি তাই,
আমারি অদৃষ্ট-দোষে আমারি মরণ,
কি দারুণ বেদনায় হৃদয় জ্বলিয়ে যায়—
তোমার কোমল হৃদে দিয়াছি বেদন!

কেঁদ না কেঁদ না সখি, এস এস হৃদে রাখি,
তোমা বই চন্দ্রাননে কাহাকেও না জানি,
একবার পেলে তোরে, আর না ছাড়িব ওরে;
হৃদয়-রাজ্যের মোর তুই রাজরাণী।

তুমিই প্রাণের প্রাণ, মনে ভাবিও না আন,
আর কারো নই আমি দূষ না আমায়,
ভুলে কি ছিলাম সাধে, হাত কি বিধির বাদে ?
এখন এ বক্ষ হ'তে কে লবে তোমায় ?

এ কি রে এ কি রে কেন, হৃদয় কাঁপে রে হেন,
সত্যই কি সেই স্বর পশিল শ্রবণে ?
সেই মধুমাখা সুরে, হৃদি ত উঠিল পূরে,
অথচ প্রভেদ কেন আগেকার সনে ?

সেই কথা মধুমাখা, কিন্তু যেন মন-রাখা,
প্রণয়ের উন্মত্ততা কই গো তেমন ?
সব সেই, সব সেই, কি যেন অথচ নেই,
অভাব কি এক যেন অনুভবে মন!

আগের উচ্ছ্বাসময়, সে ভাব এ ভাব নয়,
মর্ম্ম আগে কথা হয়ে দেখা দিত মুখে,
কথা আজ হৃদি-মাঝে তেমনি মধুর বাজে,
হৃদয় বঞ্চিত কেন তেমন সে সুখে ?

কি যেন পাইবে ব্যথা, একটি কহিতে কথা,
খুলিবে খুলিবে মুখ অলকাসুন্দরী,
তখনি চপলা সতী, আসিয়ে সত্বরগতি,
বলিল, "এস গো রাজা মোর অনুসরি—

সমুখে বিপদ ভায়, বিলম্ব কোর না আর,
বিদায়িয়া কহিবার নাহি অবকাশ।”
বলি সে চলিল ত্বরা—ছোঁয় কি না ছোঁয় ধরা—
পশ্চাতে চলিল রাজা হইয়ে হতাশ।

———

(৫)

কে ওই ললনা শান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী
দাঁড়ায়ে প্রাসাদ-শিখরোপরি ?
মধুর ঝলকে শুকতারা যেন,
ঊষাতে আকাশ উজল করি।

তেজোময় বটে, নহে তীব্র তেজ—
প্রখরতা গেছে বিষাদে ঢাকি,
স্নিগ্ধ মাধুরীতে স্নিগ্ধ চারিদিক,
ও রূপে নাহিক ঝলসে আঁখি।

বলিয়া দু'জনে নীরবে গরজি
রাখিবারে প্রথা রণের আগে,
নমিয়ে আসিবে, প্রণমিতে রবি
চাহিল অমনি আকাশভাগে।

হোল না, হোল না রবিরে প্রণাম,
প্রাসাদ-শিখরে পড়িল আঁখি,
অনিমেষ-চোখ রতন রাণার,
কে বালা হোথায় কাহাকে দেখি ?

হোল না প্রণাম, হোল না প্রণাম,
কোথায় আকাশ, কোথায় ধরা ?
আপনা পাসরি রতন কুমার
চাহিয়ে রহিল বিহ্বল পারা।

পূর্ব্ব অনুরাগে উথলিল হৃদি
পুরাণ স্বপন উঠিল জেগে ;
প্রেমের তুফান আবার বহিল
কি এক সহসা আঘাত লেগে।

নব রাজ্য-মদে, নতুন প্রমোদে,
মন হ'তে নিভে গে'ছিল যাহা,
ফিরিল সে প্রেম, নিরাশ অন্তিমে,—
শ্মশানে আবার জ্বলিল তাহা।

কে যেন সম্মুখে মূরতি করাল
হাসে সুবিকট ভীষণ হাসি :
মিলিবে এখনি ফুরাইবে সব—
দুঃখ-জ্বালা, সুখ, প্রমোদরাশি।

এ দারুণ কালে, আবার, আবার,
মরমে একি এ মরম টান ?
ও মু'খানি দেখে আবার এখন
পূর্ব্বভাবে কেন উথলে প্রাণ ?

আবার, আবার, ঘুমন্ত এ হৃদে
প্রণয়-তুফান কেন রে বয় ?
শুষ্ক প্রেমহীন সেই নয়ন,
কেন রে হইল সলিলময় ?

অসময়ে একি আলেয়ার আলো
দেখাইছে ঠাট ছলিবে ব'লে ?
বিস্মৃতি-মগন ছিল, ভাল ছিল,
কি আগুন পুন উঠিল জ্ব'লে ?

বিগত সেই সে সুখের স্বপন,
সবে ফোটা সেই হৃদয়-কথা,
মোহময় সেই নব অনুরাগ,
কেন মনে পড়ে জাগায় ব্যথা ?

প্রেম অশ্রুমাখা সেই আঁখি দু'টি
জ্বলন্ত বিঘোর ভাবের ভরে,
অনুরাগ মাখা প্রদীপ্ত মু'খানি
কেন মনে পড়ে—কিসের তরে ?

আধো ফুটো ফুটো প্রেমময় সেই
ফুলের সুবাস জিনিয়া বাণী,
প্রথম যে দিন দেখিনু তাহারে,
দেখা দিলে যেন স্বরগ-রাণী !

সেই সে রূপসী ভুবনমোহিনী
আজিকে তাহার এ হেন বেশ,
ধূলায় লুটিছে আহা মরি মরি
কুসুমে-সাজান সেই সে কেশ।

কুসুম-কলিকা—নাই কেন বাস ?
অকালেতে কেন শুকালো, হায় !
আমিই নিঠুর, নাশিয়াছি তায়—
[illegible] হিয়া জ্বলিয়া যায়।

ভুলেছিনু সে যে ছিল মোর ভাল,
আবার এ দেখা হইল কেন ?

দেখা যদি হ'ল, কেন গো আবার
আইল সে প্রেম নবীন যেন ?

প্রেম যদি ফিরে এল পুনরায়,
স্থান ব্যবধান কেন রে মাঝে ?
হৃদয়ে হৃদয়ে মিশাইতে সাধ,
এ বিষম বাধা বড়ই বাজে।

এলোথেলো দীন-পাগলিনী বেশ,
শূন্যে উড়ি উড়ি ছড়ায় কেশ,
নিরাশা-মাখান মধুর মু'খানি,
অটল গম্ভীর যোগিনী বেশ।

মধুর অধরে নাহিক সুহাস,
বিষাদ-কপাট দিয়াছে তায় ;
নলিনী-নয়ন নহে প্রস্ফুটিত,
ফুটিয়েও যেন মুদিত প্রায়।

শরীরে তাহার কিসের যতন ?—
লুটিছে ধরায়, লুটুক চুল,
কিছুতেই কিছু নাহি ভ্রুক্ষেপ—
সকলি মায়ার, সকলি ভুল।

স্বামি-প্রতিনিধি অসিখানি শুধু
এখনো রয়েছে বুকের 'পরে,
সকল গিয়াছে, আছে সেইখানি
মরণেও তাহা থাকিবে ধোরে !

দেখিতে দেখিতে পূরব-গগনে,
উদয় হলেন ঊষার রাণী,
রাঙা করি তুলি, ভাঙা মেঘগুলি
থুইলেন তা'তে চরণখানি !

একি রে সহসা ভীম গরজনে
চকিতে দিগন্ত কাঁপিল কেন ?
শান্ত ঊষার সনে অশান্তি উদয়,
কেন বিপরীত [illegible] হেন ?

রবির উদয়ে হাসে যদি নভ
ধরায় এ কি রে জলদমালা ?
মাঝে মাঝে ওরি, অ[illegible]ড়ি
আঁধারে ওকি, [illegible]-খেলা ?

ঘোরতর মহা বাধিল স[illegible]
সেনাগণ-প্রাণে কাঁপিল ভুম,

ঝন্‌ঝনে অসি, চমকে পরাণ
কামান গরজি উগারে ধুম।

শোণিতে শোণিতে বহি গেল নদী
উঠে জয়ধ্বনি, উড়ে নিশান ;
"অলকাকুমারী আমাদের রাণী"—
চারিদিকে এই উঠিল তান।

সহসা থামিল সে ঘোর গর্জ্জন
মন্ত্রস্তব্ধ যত সেনানীচয়,
রাজার ইঙ্গিতে নত করি অসি
যেথায় যে জন দাঁড়ায়ে রয়।

সুরথ রতনে ধরিল কৃপাণ
দোঁহার বিবাদ মিটাতে দোঁহে,
স্তব্ধ সেনানীরা রহিল চাহিয়া
সভয়ে, বিস্ময়ে, চমক-মোহে।

ঝন্‌ঝনি অসি অশনি গর্জ্জনে
বলিল সরোষে চিতোর-রাজ,
"দাস অনুদাস বুন্দি-অধিকারী
মিবারের রাণা হবে সে আজ ?

হুঙ্কারে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন
তার অপমান ও হীন হাতে ?
প্রতিশোধ এর, প্রতিশোধ চাই,
প্রতিশোধ ল'ব শোণিত-পাতে।"

রাগে অপমানে উন্নত-মস্তক,
নয়নে ঝলকে অনল-জ্যোতি,
বিকম্পিতস্বরে সতেজে, অধীরে
কহিল সুরথ বুন্দিপতি,—

"সাক্ষী ঐ রবি, সাক্ষী দেবদেবী
কাহার অন্যায় কাহার ন্যায়,
কাহার অলকা ধরম-বনিতা,
কে পাষণ্ড বলে হরিতে চায় ?

যদি ধর্ম্ম বোলে থাকে একজন,
সত্যের প্রভাব আজিও রয়,
দেখিব, দেখিব, আজি এ সমরে
কার পরাজয়, কার বা জয়।—

কুসুম-কাননে মিলন যাহার
দেখা হ'ল আজি শ্মশান তায়,

এখনি রে যদি ফুরাইবে সব,
নিভে যাক প্রেম চাহি না আর।"

নিমিষে চকিতে কত শত ভাব
বহে গেল তার হৃদয় দিয়ে,
চাহিয়ে রহিল অলকার পানে
অনুতাপে, দুখে, দলিত-হিয়ে।

মন হ'তে গেল সমরের কথা,
হাত হ'তে অসি পড়িল নেমে।
ভুলিয়া সকল সম্ভাষি' বালারে
বলিল ভূপতি মাতিয়া প্রেমে।

"আকাশের পটে মধুর মুরতি
আবার আজিকে দেখি রে কেন ?
কেন রে আবার নয়নে উদিলি
প্রভাতী চাঁদের জ্যোছনা হেন ?

জান না কি প্রিয়ে, ও-মূরতি দেখি
কঠোর পাষাণও গলিয়া যায় ?
জান না কি প্রিয়ে, ও-মূরতি দেখি
শবের তনুও জীবন পায় ?

জান না কি প্রিয়ে, ও-মূরতি দেখি
এ হৃদি-কবাট আপনি খোলে,
গলে গলে যায় মরম আমার,
মধুর কি এক নেশার ভোলে ?

তবে কেন তুই দেখা দিলি ওই
হাসিলি কেন ও-দুখের হাসি ?
বিষাদের ঐ ম্লান চাহনিতে
কেন বরষিলি পীযুষরাশি ?

দেখা দিলি যদি জুড়াতে এ হৃদি
সুদূর অম্বরে কেন লো তবে ?
তোর লাগি এই পেতেছি হৃদয়
আয় হৃদে হৃদে মিশাই এবে।"

চিতোরের রাণা বকে কি প্রলাপ
সহসা উন্মাদ হইলে একি ?
সম্মুখ-সমরে কই সে বিক্রম,
কই সে সিংহের গরব দেখি ?

এ কি এ ভীরুতা ? এ কি অসম্ভব
হাতের কৃপাণ পড়িছে খসি।

চিতোর-সেনানী অধীর সরমে
উন্মত্তে ঝননি উঠিল অসি।

সুরথ অবাক্, ফিরাইল মুখ
দেখিল অলকা প্রাসাদ-শিরে,
বুঝিল সে কেন হতজ্ঞান রাণা
কেন বা তাহার আঁখি না ফিরে।

গরজি উঠিল, বলিল সুরথ,
রোষে তাপি' উঠে শোণিত-বারি,
"কাপুরুষ ভীরু, ধল্ রে কৃপাণ
উন্মত্ত হেরিয়ে পরের নারী।"

ভাঙ্গিল চমক অপমানে, তেজে,
সবলে সে অসি ধরিল করে,
বিঁধিবার আগে শত্রুবক্ষে তাহা,
উঁচুতে চাহিল বারেক তরে।

বারেকের তরে আর একবার
দেখি অলকায় নয়ন ভরি,
হানিল কৃপাণ সতেজে সরোষে,
আঘাতে আঘাতে ব্যাকুল করি।

ঝন্ ঝন্ ঝন্ চমকে কৃপাণ,
এ বিঁধিছে অসি উহার গায়,
অলকা প্রাসাদে যেন জ্ঞানহীন
দাঁড়ায়ে রয়েছে পাথরপ্রায়।

চারিবার রাণা ঝননিয়ে অসি
বিঁধে বিঁধে যেন সুরথ-বুকে
চারিবার তাকে করিয়া বিফল
সুরথ আঘাত করিল রুখে।

এই মুখ'-মুখি, পিছু হঠে পুন,
রক্তে রক্ত অসি সমুখে ধরে ;
টুটে বল তবু অটল উভয়ে,
দ্বিগুণ ভীষণ বিফল তরে।

ঐ না সুরথ পড়িল এবার ?—
হাতের কৃপাণ পড়িল খসি,
অন্তিম নিশ্বাস পড়িল তাহার—
বুকেতে রতন বিঁধিছে অসি।

অবসন্ন রাণা বিক্ষতশরীর
সেও মাটী'পরে পড়িল শুয়ে ;
শেষ বলটুকু গিয়াছে তাহার,
সহজে স্বরষ পড়েনি ভুঁয়ে।

শোণিত-লহরী উঠিছে ঝলকি
নিদান আঘাতে চেতনাহারা,
দেখিল অলকা, দেখিল সকলি
চেতনাবিহীন পাগলপারা।

পারিল না আর, পারিল না আর,
অটল মাথাটি হইল নত,
ক্ষণেক তবুও রহিল দাঁড়ায়ে
বোঁটায় নোয়ান কমল মত।

ধীরে ধীরে খুলি বুক হ'তে অসি
বারেক তাহারে দেখিয়া লয়ে,
চুমিল আবার অধীর যতনে,
কত ভাব গেল নিমেষে বয়ে।

"তোরি সনে অসি পরিণয় মোর
জানিনে তো'ছাড়া কাহাকে আমি,
স্বামিরূপে তোরে হৃদয়ে ধরিয়ে
কেটেছে দুখের দিবস-যামী।

চিরদিন তরে আছিনু তোমারি,
চিরদিন তরে থাকিব তো'রি,
বিবাহ হোয়েছে তোর সাথে অসি,
মরিবও তোরে বুকেতে ধরি—"

তখনি সে বালা অনন্ত-হৃদয়া
বুকেতে বিঁধে সে খড়্গ আজ,
শূন্য দেশ হ'তে তারাটির মত
পড়িল যুগল পতির মাঝ।

অভাগিনী।

(১)

"শুধু দু'দিনের তরে, প্রবাসে যেতেছি ওরে,
হাসিমুখে প্রিয়তমে দাও লো বিদায়,
প্রেয়সি রে, জান নাকি অশ্রুময় ওই আঁখি,
দেখিলে প্রতিজ্ঞা-পণ চূর্ণ হয়ে যায়?

দামিনি, তোরি না তরে যেতেছি লো দেশান্তরে
ছাড়িয়ে জনমভূমি, প্রিয়-পরিজন,
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম, সুখের প্রতিমা মম,
প্রাণের সর্ব্বস্ব তোরে, ক'রে বিসর্জ্জন?"—

বলিয়ে এ কথা শোকাকুল মনে
যুবক একটি কুটীরবাসী—
ভূমি হ'তে ধীরে তুলি দামিনীরে
মুছাইল অশ্রু-সলিলরাশি।

উথলিত আঁখি কুয়াসা-জড়িত,
আকুল পরাণে দারুণ ব্যথা—
কহিল দামিনী বাধ' বাধ' স্বরে
স্বামীর হৃদয়ে রাখিয়ে মাথা।—

"অভাগী মিনতি করি, বলিছে চরণে ধরি,
যেও না, যেও না একা ফেলিয়ে আমায়।
কি কাজ ঐশ্বর্য্য-সুখে? তোমারে পাইলে বুকে
অলঙ্কার রত্ন-ধন অভাগী না চায়।

ধন-পরিজন-আশ, অমর-ভুবনে বাস,
রাজ-রাজেশ্বরী হয়ে চমকিতে সবে,
না গো—না, বাসনা নাই, শুধু এইটুকু চাই,
দুখিনী তোমার দাসী, সকলেই কবে।

সুখ না থাকিলে মনে, কি কাজ সম্পদ্ ধনে?
তোমাকে ছাড়িয়ে কিসে থাকিবে পরাণ;
তুমি যে আমার স্বামী, কিছু নাহি চাহি আমি,
কুটীরই তোমার সনে প্রাসাদ সমান।

দরিদ্র বলিয়ে যবে, অপমান করে সবে,
তাহাতে এমন কেন হও গো কাতর?
সুখী আমাদের মত, দেবতাও নহে এত,
কি সুখের আশে তবে যাবে দেশান্তর?"

বলিতে বলিতে লতাটির মত
বুক হোতে মাথা পড়িল ঢোলে,
বিষাদ-গম্ভীর অটল যুবক
কহিল মাথাটি রাখিয়ে কোলে,—

"কেন প্রিয়ে বার বার, ও কথা বলিয়ে আর,
ভাঙ্গিতে চাহিছ মম কঠোর এ পণ?
প্রাণের পরাণ সম, এক সাধ আছে মম—
তোমাকে পরাব প্রিয়ে রত্ন-আভরণ।

জান না, জান না কি রে, হৃদয়ের শিরে শিরে,
দারুণ আঘাত কি যে লাগে লো আমার—
যখন দরিদ্র ব'লে, লোকে উপহাস-ছলে,
ঘৃণায় ভ্রূকুটী হানে হৃদয়ে তোমার?

জলন্ত অনল-জ্বালা, সহিব তা চেয়ে বালা,
সেই উপহাস-হাসি অসহ্য যে মম,
চলিনু চলিনু, ওরে, বিদায় দেহ গো মোরে,
তোর অপমান বাজে অশনির সম।

যেথানে সেথানে থাকি, তোমার মু'খানি সখি,
এ হৃদে জলন্ত ভাবে রবে অনুক্ষণ,
ভাবিয়ে ও অশ্রুজল দ্বিগুণ পাইব বল,
সাধিব আপন কাজ করি প্রাণপণ।

আজিকে দেবতা-করে, স'পিয়ে চলিনু তোরে,
রাখুন কুশলে প্রিয়ে তোরে দেবগণ,
সফল হইয়ে পুন, আবার আসিব শুন,
আবার দেখিয়ে তোরে জুড়াব জীবন।"

স্ফুরিল না কোন কথা দামিনীর
নয়নে না আর বহিল ধারা,
যাতনা-ব্যথিত নীরব নয়নে
চাহিয়ে রহিল পাথর-পারা।

উথলিত জল যতনে সামালি,
পাষাণে বাঁধিয়ে হৃদয়-জ্বালা,
বিষাদে জড়িত আধ'ফুট-স্বরে
বলিল তখন দামিনী বালা ;—

"চলিলে প্রবাসে তবে হৃদয়ের ধন,
শূন্য করি অভাগীর হৃদি-প্রাণ-মন ;
যাও, তবে যাও সখা,
হয় তো এ শেষ-দেখা,
এ বিদায় হ'ল বুঝি জন্মের মতন।

লভিয়ে সৌভাগ্য কান্তি, পাবে যথা সুখ-শান্তি
যাও তবে প্রিয়তম, সুদূর সেথানে,
আজিকে হৃদয়-খুলে, উপহার-অশ্রুজলে,
দুখিনী বিদায় দেয় সরবস্ব-ধনে।

অভাগিনী অনাথিনী, রহিল যে একাকিনী,
মনে রেখো এইটুকু ধরি গো চরণে,
প্রণয়-কুসুমে গাঁথা, বিগত সুখের কথা,
আমোদ উল্লাস মাঝে ক'রো তবু মনে।

না না, নাথ, সুখে থেক,
মনে রাখ—নাই রাখ,
তোমারি স্মরণে জেনো রাখিনু জীবন,
তোমারি—তোমারি ধ্যানে রব অনুক্ষণ।"

কাঁপায়ে ঘুমন্ত নীরব মেদিনী,
কাঁপায়ে নিস্তব্ধ নিশীথ-প্রাণে
কাঁপায়ে দারুণ আঘাতে হৃদয়,
পশিল এ কথা যুবার কানে।

উপরে বিস্তৃত আকাশ-সাগরে
সুধাকর দিলে সহসা দেখা না,
আঁধার মাখান দামিনীর মুখে
পড়িল একটি উজল রেখা।

আলোকে ছাইল পৃথিবী আকাশ,
আঁধারে ছাইল পরাণ মন,
ভাঙ্গিয়ে কোমল দামিনীর হৃদি,
প্রবাসে চলিল হৃদয়-ধন।

---

(২)

আঁধারে কিছুই নাহি যায় দেখা
অসীম আকাশ ছাড়া,
দিগন্তের কোলে মিশিছে আকাশ,
আকাশের কোলে তারা।

অনন্ত আকাশে অনন্ত আঁধার
অনন্ত তারকা তাতে,
আঁধারের ঘটা দ্বিগুণ বাড়ায়ে
ঈষৎ ঈষৎ ভাতে।

হেথায় কে বালা তারাটির পানে
রাখিয়ে নয়ন-তারা
বসিয়ে একা এ ভীষণ নিশীথে
বিষাদ-প্রতিমা পারা।

পাংশু বদনে অমানুষী ভাব
জীবন নাহিক তায়,
প্রশান্ত নয়নে নাহিক পলক
জ্যোতিও নাহিক ভায়।

হাতটির 'পরে রয়েছে কপোল,
এলোথেলো চুলগুলি,

নিরাশার ছবি পাথরে কে এঁকে
ফেলে গেছে যেন ভুলি।

মৃদুল মৃদুল নিশীথ-সমীর
ভাঙ্গিছে যেন সে ভুল,
ধীরে ধীরে কভু দোলাইছে আসি
নিবিড় সে এলো চুল।

ভয়ে ভয়ে বায়ু ছোঁয় সে মূরতি
ছুঁইতেও কাঁপে ডরে।
পাছে তার সেই কঠোর আঘাতে
চুলগাছি যায় স'রে।

কি স্থির গম্ভীর কি প্রশান্ত ভাব,
কি স্বর্গীয় সেই ছবি!
কল্পনা তাহারে না পারে ছুঁইতে
চমকিয়া যায় কবি।

হাতটির 'পরে রয়েছে কপোল
নয়ন উপরে তোলা,
মধুর দু'খানি অধর-পল্লব
ঈষৎ ঈষৎ খোলা!

কি যেন কি ভাবে হইয়ে মগন
চাহিয়ে তারকা পানে,
কহিছে কি কথা আপনার মনে.
আপনি তাহা না জানে।

সহসা জ্বলিল সে শান্ত নয়ন
নড়িল পাষাণ-বালা,
ভাবিতে ভাবিতে মুখ নত করি
নেহারিল গাছপালা।

বারেকের তরে মুখ ফিরাইয়ে
হেরিল চারিটি ধার,
সেই সে কুটীর, সেই বনস্থল
দেখিল একটিবার।

কতদিন ধ'রে শূন্য এ কুটীর
শূন্য এ হৃদয়-মন,
কতদিন হ'তে রহেছে আশায়
এলো না হৃদয়-ধন।

অভাগিনী তবে কেন গো এখনো
বাঁচিয়ে রয়েছে আর?—

পাষাণ ভেদিয়া দুই এক ফোঁটা
পড়িল নয়নাসার।

স্বামী বই যার শুধাতেও কেহ
নাহি এ জগৎমাঝ,
জনম-দুখিনী দামিনীর প্রতি
তিনিও নিদয় আজ?

তবে, কেন তবে বাসিলেন ভাল,
ভুলিয়া যাবেন যদি,
তখনি কেন না দলিলেন তারে
সঁপেছিল যবে হৃদি?

ছেলে-বেলা হ'তে কেঁদে কেঁদে শুধু
জীবন কেটেছে যার,
কি ভাই, ভগিনী, সহচরী, কেহ
ভাল তো বাসে নি আর।

মুহূর্ত্তের তরে কে বলিল তাঁরে
ঘুচাতে তবে সে জ্বালা?
কেন দয়া করি সে দেবতা দিল
অকূল পাথারে ভেলা।

সেই বাল্যের নিরাশা-সাগর
উঠিত যাতনা-ঢেউ,
একা ভাসি ভাসি চলেছিল বালা
ছিল না কোথাও কেউ।

আজীবন ধ'রে ভালবেসে যে গো
জানিত না প্রতিদান;
কাঁদিতেই শুধু জনম যাহার,
যাতনাই যার প্রাণ; —

সেই অভাগিনী জনম-দুখিনী,
জীবনই যাহার দুখ,
স্বপনের মত সে পোড়া কপালে
কেন বা ঘটিল সুখ?

রোগীর অন্তিম হাসির মতন,
মেঘেতে বিজলী মত,
মরিতেই বুঝি, নিমিষের তরে
দুখিনীর সুখ এত!

কাতর-নয়নে মুখখানি পুন
আকাশে তুলিল বালা,

কি যেন কি কথা বলিবার তরে
নেহারে তারকা-মালা।

কিন্তু ফুটি ফুটি ফুটিল না, মুখ
হেরিল চারিটি ধার,
দেখিল বালিকা, কেহ নাই কোথা
শুনিবারে কথা তার।

একটি আঁধার আবরণে শুধু
চারিদিকে আছে ঘেরি,
মাঝে নিভে নিভে জ্বলিছে জোনাকি
সে আঁধার কায়া বেড়ি।

তখন সাহসে ভর করি, কথা
কহিতে তারকা-সনে,
ভয়ে ভয়ে ধীরে খুলিয়ে মু'খানি
কহিল আপন মনে ;—

"হৃদি খুলি আজ দুখের কাহিনী
তোমায় বলিব তারা,
গুমরি গুমরি আর যে পারি নে—
হৃদয় শ্মশান-পারা।

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে এত তো খুঁজিনু
সখী না একটি পেনু,
কেউ না শুনিল এ দুখের কথা,
তোমার নিকটে এনু।

কি গভীর দুখে হৃদি ফেটে যায়
তোমায় বলিব আজ,
তুমিও কি তারা, বুঝিবে না তাহা
হাসিবে হৃদয়-মাঝ ?

বল, বল তারা, তুমিও এ দুখে
পাবে না কি তিল ব্যথা ?
তুমিও কি শুধু হাসিবে গোপনে
শুনিয়ে আমার কথা ?

ভালবাসা পেয়ে হৃদয় লইয়ে
করিবে খেলনা তায় ?
উপেক্ষিবে তারে চরণে দলিয়ে
বল গো তুমিও হায় !"

বলিতে বলিতে মুছি অশ্রু পুন
হেরিল তারকারাশি,
দেখিল জ্বলিছে মৃদু মৃদু তারা,
হাসিছে আলোক-হাসি ;

থামিল, আর না বলা হোল তার,
সে হাসি বাজিল বুকে,
"দামিনীর দুখে তুমিও তারকা
হাসিলে মনের সুখে।

তুমিও হ'লে না, মমতা করিয়ে
ব্যথার ব্যথিনী তার ?
তুমিও কি তারা সুখী হ'লে দেখি
তাহার যাতনা-ভার।"

সহসা অমনি দেখিল বালিকা
তারাটি পড়িল খসি,
দেখিতে দেখিতে দিগন্তের কোলে
কোথায় লুকাল মিশি।

দেখিতে দেখিতে কত শত ভাব
বহিল হৃদয় দিয়া,
কতই ভাবিল নীরবে দামিনী
ব্যথিত আকুল হিয়া।

"ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র দুখিনী দামিনী
ক্ষুদ্র সে তারাটি হ'তে,
অনন্ত জগৎ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম
বালির কণিকা তাতে,

কেন এ বালিটি শূন্যে না মিশায়
খসে না কেন এ তারা ?
কাঁদিতেও যার নাহি একজন
কেঁদেই যে জনম সারা ?

স্বজন এই যে সমাজ হেথায়
বিজন শ্মশানপ্রায়,
গাঢ়তম ধূমে আচ্ছন্ন চৌদিক,
কিছুই না দেখা যায়।

কোলাহল-মাঝে কি শূন্যতা ভাব !
চিতার গর্জ্জন সম—
—কোলাহলে শুধু বাড়ে ভীষণতা,
বাড়ায় শূন্যতা মম।

অমার নিশীথে তারা-দল যথা—
বাড়ায় আঁধার ঘোর,

বাহিরের আলো দ্বিগুণ দ্বিগুণ
আঁধারয়ে হৃদি মোর।

তবে কেন, কেন, কিসের আশায়
আটকি রেখেছি প্রাণ,
তবুও এখনো কিসের সাহসে
করি সব ছার জ্ঞান ?

সেই সে আমার হৃদয়-রতন
সকল ভরসা-স্থল,
দুখিনীর এক দুখ-নিবারণ
অবলার চির-বল ;—

তাঁর প্রণয়িনী যদি এ দামিনী
কে সুখী তাহার মত,—
এ কথা ভাবিয়ে কাটায় জীবন,
পড়ুক অশনি শত।

একসূত্রে বাঁধা দুইটি জীবন,
মরমে মরম গাঁথা,
ভুলেছে সে মোরে ?—কখনো তা নয়,
কিসের মরম-ব্যথা ?

কিন্তু কেন তবে এলো না এখনো,
আমার হৃদয়-ধন ?
কোথায় আজিকে এ ঘোর নিশীথে
রয়েছে রাখিতে পণ ?

কবে বা আসিবে ? আসিবে কি আর—
এমনি কাটিবে একা ?
হয় তো আমার এ জনমে আর
হোলো না তাঁহারে দেখা !

হয় তো তাঁহার ফিরিবার আগে
দুখিনী রহিবে ম'রে,
এই ঝাউতলে থাকিব ঘুমায়ে
অনন্ত ঘুমের ঘোরে।

প্রাণেশের প্রিয় এই গাছতলে,
এই কুটীর-বার,
চির-অভাগিনী দামিনী বালিকা
হইবে ধূলিকা-সার।

স্নেহ-চিহ্নমাত্র থাকিবে না ক্রমে
সকলি হইবে শেষ,

যখন প্রাণেশ সাধি নিজ কাজ
ফিরিবে আপন দেশ ;

যখন আমার রাজেশ্বর পতি,
মরমে পাইয়ে ব্যথা ;
রুদ্ধ নিশ্বাসেতে শূন্যে শূন্যে চাহি
সুধাবে আমার কথা।

আকুল হৃদয়ে খুঁজিবে চৌদিক্
'দামিনী, দামিনী' ক'রে,
আছে কি গো আর দামিনী তাঁহার,
আসিবে হরষভরে ?

তখন কে তাঁরে উতরি কহিবে,
'ওই ও গাছের ধার,
চির-অভাগিনী দামিনী তোমার
হয়েছে ধূলিকা-সার।'

কে তাঁহারে তবে উতরি কহিবে
'তোমারি পথের পানে,
চাহিয়া চাহিয়া ত্যজেছে পরাণ
দামিনী তোমারি ধ্যানে।

যাহারি লাগিয়ে দেশ তেয়াগিয়ে
পশিলে প্রবাসে, হায় !
যাও, হে পথিক, খুঁজিয়াও আর,
ফিরিয়া পাবে না তায়।'

অমনি আবার উর্দ্ধকণ্ঠে নাথ,
ডাকিবে 'দামিনী' বোলে
প্রতিধ্বনি শুধু উপহাসি তারে
ধ্বনিবে আকাশ-তলে।"

ভাবিতেও আর পারিল না বালা
নীরব কটাক্ষ স্থির,
উথলিয়ে চোখে বহিল কেবল,
জ্বলন্ত অনল-নীর।

(৩)

নিরাশার ঘোর যাতনা আঁধারে
কেটে গেছে কত বরষ মাস,
আজ দামিনীর সে নিশা প্রভাত
বিকাশিছে মুখে হরষ-হাস !

আসিবেন নাথ লিখেছেন লিপি
পড়িছে যতনে শতেক বার,
আঁখিজলে কভু ভিজাইছে তারে,
প্রতি কথা কভু চুমিছে তার।

উলটি পালটি আবার পড়িছে
আবার ভাবিছে কতই কথা—
কখন' অধরে খেলিছে হাসিটি
কখন' লাগিছে, সুখের ব্যথা!

পড়ি পড়ি, লিপি, গণি দণ্ড-পল,
রোগীর অনন্ত কালের মত—
—কত ক'রে শেষে আসিল রজনী
দিবস ক্রমেতে হইল গত।

এখনি, এখনি আসিবেন নাথ—
দামিনীর হৃদি হরষে ভরা;
যাহা দেখে এবে সকলি নতুন,
হাসিছে হরষে স্বরগ ধরা;

সাঁঝের আকাশে তেমনি করিয়া
জ্বলিল আবার সাঁঝের তারা,—
যেটি জ্বল্-জ্বল্ জ্বলিতে সেকালে,
দু'জনে দেখিত আপন-হারা।

তেমনি করিয়ে সরসীর বুকে
ঢ'লে ঢ'লে পড়ে লহরী-মালা,
তেমনি হরষে মলয়-সমীর
লতা-পাতা চুমি করিছে খেলা।

পূর্ণিমা-চাঁদ উঠিল আবার
বাগানে জ্যোছনা দিতেছে ঢেলে;
সারাটি বাগান খুঁজিল দামিনী
ফুল-সাজে পুন সাজিবে ব'লে,

কিন্তু কই, হায়! কোথায় কুসুম,
সাধের বাগান এমন কেন?
কই সে ফুটন্ত গোলাপের রাশি,
কেন গাছগুলি শুকানো হেন?

সে বিলাসী যূঁই তার দশা এই?
পড়েছে সে গাছ মাটীর পরে;
মালতীর লতা ভূমেতে লুটায়,—
কোন্ নিরদয় ছিঁড়েছে তোরে?

যার বাস ঐ ফুটিত মল্লিকা,
আজি ওতে নাই একটি কলি,
পাতায় পাতায় বসতি কীটের
গুন্‌গুন্ ভুলে করে না অলি।

না মিলিল খুঁজি একটি কুসুম,
দামিনী বসিল হতাস হৃদি,
ফুলময়ী সাজ হ'ল না তাহার
ভালবাসে যাহা হৃদয়-নিধি।

সহসা দেখিল পাতার ভিতরে
হোথায় ভ্রমরা যেতেছে উড়ি;
একটি শাখায় উঠিয়াছে পাতা,
নতুন পাতায় একটি কুঁড়ি।

তুলিয়ে কুঁড়িটি পরিল খোঁপায়,
কবরী বেঁধেছে এলান কেশে,
নয়নের পাতে এঁকেছে কাজল,
সেজেছে কেমন দেখিছে হেসে।

মুকুরে মু'খানি দেখিছে আপনি,
আপনি হাসিছে সরম-হাসি;
সাজসজ্জা এই দেখিয়ে না জানি
বলিবেন কিবা প্রাণেশ আসি।

সাজসজ্জা করি করি, প্রহরেক বিভাবরী
না জানি কেমন করি কোথা দিয়ে গেল,
ক্রমে হ'ল দ্বিপ্রহর, নিরদয় প্রাণেশ্বর,
তবুও, তবুও কেন এখন না এল!

অভিমানে ঢল ঢল, আঁখি দুটি ছল ছল,
এলায়ে ফেলিল বালা বদ্ধ কেশপাশ,
বিলম্ব করেছে পতি, অভিমানে তার প্রতি
মানময়ী মুখে আর না বিকাশে হাস।

একেলা নিভৃতে ব'সে, আঁচল পড়িছে খসে'
পড়ে সেই চিঠিখানি পাগলিনী প্রায়,
শুকায়েছে ওষ্ঠাধর, হৃদি কাঁপে থর থর,
হাতের সে লিপিখানি কেঁপে কেঁপে যায়।

উথলিত আঁখি-জলে, কত ভাবি, হৃদিতলে,
হৃদয়ে চিঠিখানি রাখে পুনরায়;
মরমে মরম ঢাকি, আঁধারে জ্যোছনা মাখি,
কুহকী আশায় ডাকি আপনা ভুলায়।

আসিবার কাল, হায়! ক্রমে উতরিয়ে যায়,
কই গো কই গো এল হৃদয়েশ তার ?
সাজসজ্জা ম্লান করি, পোহাল তো বিভাবরী,
ঐ তো নিঠুর ঊষা উদিল আবার।

ঐ পিক দেয় সাড়া, ফুটেছে প্রভাত-তারা,
শুকতারা আর এবে সুখের তো নয়,
দামিনী দুখিনী বালা, হৃদয়ে দারুণ জ্বালা,
নয়নে অনল-ময় অশ্রুধারা বয়।

রুদ্ধশ্বাস-রাশি-ভার, ভাঙ্গিছে হৃদয় তার,
নিরাশ পরাণ মন বিদলিত প্রায়।
তার মাঝে মাঝে তবু, চমকিয়ে যায় কভু,
আশার বিজলী-ছটা এখনো তাহার।

হেন কালে ঐ শুন কি শুনিল বালা পুন,—
"ডুবেছে সাগরতলে সেই তরীখানি।"
কিছু আর, কিছু আর গেল না শ্রবণে তার
মরিল বাঁচিল কিবা কিছুই না জানি।

সহসা উন্মত্ত স্বরে "দামিনী দামিনী" ক'রে
কে যুবক রুদ্ধশ্বাসে আসিছে ছুটিয়া ?
দামিনী আছে কি আর, উতর করিতে তার,
হোথা অচেতন বালা ধূলায় লুটিয়া।

অজ্ঞানে শতেকবার, চুমিয়া মু'খানি তার,
আবার উন্মত্ত যুবা কাতরে বলিল—
"দামিনী, দামিনী মোর, এসেছে বিপিন তোর"
বালার নিভান হৃদি ঈষৎ জ্বলিল—

নিমীলিত আঁখি দু'টি, ঈষৎ উঠিল ফুটি,
কি কথা বলিতে যেন খুলিল অধর,
ফুটিল না কথা আর, নয়নে বহিল ধার,
নিস্পন্দে রহিল চেয়ে মুখের উপর।

নিভিল নয়নে ভাস, পড়িল অন্তিম শ্বাস,
শোভিল হাসির ধার দামিনীর মুখে।
ফুরাল সকল জ্বালা, ঘুমিয়ে পড়িল বালা,
যুবক রহিল ধরি দামিনীরে বুকে।

ট্যালিসম্যান

—— •:•:• ——

(গল্প)

কর্ণেল টড সাহেবের আর্দ্দালী ছিল পাঞ্জাবী রণবীর ; নামে, কাজে কিন্তু কাণ্ডারী। যত রকম বিপদে আপদে তাঁহাকে রক্ষা করিত।

তীরবেগে মোটর না চালাইলে সাহেবের মন উঠিত না ; মোটরে বসিয়া কল্পনা করিতেন, তিনি উড়িয়াছেন ব্যোমযানে।

প্রভু চালাইতেন মোটর, পাশে বসিয়া থাকিত ভৃত্য রণবীর। রণবীরের ইঙ্গিত-কৌশলে বা "অকাণ্ট' প্রভাবে, ঠিক বলা যায় না, এমন বেগ-গতিতে অর্থাৎ বে-গতিতেও চৌরাস্তা অতিক্রমকালে কোন একটি দিন সাহেবের হাতে accident হয় নাই বা চৌরঙ্গীর পথে তিনি পুলিশ সার্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। আর যে দিনটি রণবীর তাঁহার পাশে ছিল না—ঠিক সেই দিনই কি না বাড়ীর রাস্তার মোড়ে একটি লোক তাঁহার মোটর চাপা পড়িয়া গেল।

মেম-সাহেবের চাকর-মহলে বড় একটা সুনাম ছিল না। তিনি না কি অন্যকে ন্যায্য আহার্য্য সঞ্চিতেও বঞ্চিত করিতেন, আর নিজে—পানাপানেও দোষ জ্ঞান করিতেন না। পান অর্থেই বা তাহাদের অভিধানে কি লেখে, আর অপান অর্থেই বা তাহারা কি ইঙ্গিত করিত, সে কথাটা মেম-সাহেবের লবণ-ভোগী দলেরা স্পষ্ট করিয়া কখনও বলে নাই। তবে ঘটনাচক্রে তাঁহার ধূমপান-প্রীতির কথাটাই বাজার-রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল।

কোন একটি বিশেষ মেল-দিবসে মেমসাহেব সিগারেট-খণ্ড মুখে লইয়া না কি লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন ; কখন্ বা কেমন করিয়া বহ্নি হইতে ভস্ম বা ভস্ম হইতে বহ্নিকণা নির্গত হইয়া কার্পেটখানি ধূমায়িত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। [illegible]পায়ের দিকটা গরম বোধ হওয়ায় নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এ শুধু ধূম নয়, তাঁহার ঘাগরা-প্রান্তটি অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই যদি না রণবীর তৎক্ষণাৎ আসিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিত, তবে তাঁহার এই নবীন-কোমল সুমূর্ত্তির যে কিরূপ বিদগ্ধ বিকৃতরূপ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সাজসজ্জার সময় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলেই এই চিন্তায় বহুদিন ধরিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটা আতঙ্ক-শিহরণ উঠিত।

টিম বাবা তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। তাহার জন্মদিনে জু-গার্ডেনে ছেলের দল লইয়া তাঁহারা গিয়াছেন পিকনিক করিতে। কতকগুলি মানবশিশু বানরশিশু দেখিতে ছুটিয়াছে, কোন দল বা সর্প-কুম্ভীরের আড্ডায়, কেহ কেহ বা বাঘ-সিংহের খাঁচার কাছে দাঁড়াইয়া ডাক শুনিবার অভিপ্রায়ে নির্ভয়ে লাঠির খোঁচা দিতে উদ্যত, কিন্তু গর্জ্জন শুনিবামাত্র সভয়ে পিঞ্জরের নিকট হইতে পিছাইয়া পড়িতেছে! এক এক ছেলের দলের সহিত দু-একজন সাহেব, মেম বা ভৃত্য।

কয়েকটি বালক নৌকা করিয়া হ্রদ-ভ্রমণ করিতেছিল, হালী স্বয়ং বাবা টিম্! রণবীর এ দলের নেতা, তাহার ইচ্ছা ছিল, সে নিজেই কাণ্ডারী হইয়া ছেলেগুলিকে কোম্পানীর হ্রদ পার করে। কিন্তু টিম বাবা পিতামাতার একটি সন্তান—জেদ ধরিলে সৃষ্টি-কর্ত্তাকেও তিনি হার মানাইতে চান, রণবীর ত সামান্য ভৃত্য। সে বেচারা হাল ছাড়িয়া ম্লান-মুখে তীরে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু নিশ্চিন্তমনে নহে। হায় রে! যা ভয় করিয়াছিল, তাহাই হইল ; অল্পদূর না যাইতেই নৌকাখানি উল্টিয়া পড়িল। যদি না রণবীর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে ধরিয়া ধোপার কাপড়ের মত ছেলেগুলাকে তীরে আছড়াইয়া ফেলিত, তবে

এই আনন্দের দিনে একটা শোকাভিনয় কাণ্ড ঘটাও বিচিত্র ছিল না।

এইরূপে জলে স্থলে, কর্ণেল সাহেবের শ্রীমধুসূদন ছিলেন আর্দ্দালী রণবীর। তাই প্রভু আদর করিয়া এই উপকারী 'পেয়ারের' চাকরের নাম দিয়াছিলেন ট্যালিসম্যান।

(২)

তিন বৎসরের ফার্লো লইয়া সাহেব যখন বিলাত-যাত্রা করিলেন, তখন রণবীর আর অন্য কাহারও চাকরী গ্রহণ করিল না। প্রয়োজনও ছিল না, সাহেবের অনুগ্রহে সে বেশ দু-পয়সা সংস্থান করিয়া লইয়াছিল! দেশে জমীজিরাৎ দু দশ বিঘা যাহা ছিল, তাহার চাষ-বাস আরম্ভ করিয়া দিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া সে গৃহবাসী হইল। বিবাহ তাহার বাল্যকালেই হইয়াছিল।

রণবীর জাতিতে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত না হইলেও চলনসই লেখাপড়া জানিত, প্রত্যুৎপন্নমতিও তাহার চমৎকার, পরের উপকারেও বিমুখ নহে, কাজেই গ্রামের মধ্যে সে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। চিঠিপত্র পড়াইতে, বিবাদে সালিস মানিতে, মোকদ্দমা-মামলার পরামর্শ লইতে গ্রামে সকলেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে—এমন কি, পাঁজিপুঁথি দেখাইতে এখন বড় একটা কেহ গণকের নিকট যায় না।

গ্রামখানির নাম বামনিয়া, ব্রাহ্মণ-স্থান বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। নিজের এই ক্ষুদ্র বাস-ভূমিতে গ্রামের লোকের আদর, সম্মান ও স্ত্রী-পুত্রের প্রীতিযত্নের মধ্যে রণবীরের জীবন বেশ সুখেই কাটিতেছিল, এমন সময়ে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইউরোপে যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিল।

আশ্বিন মাস। আকাশে, বাতাসে, বনে, উপবনে, দিগ্‌দিগন্তে শরতের প্রভাব—শরতের শোভা। আকাশে ঘন নীলিমার ছটা, শস্যশীর্ষ ক্ষেত্রে, তরুঘন-বনপ্রান্তে, তৃণময় শুষ্ক প্রান্তরে স্তবকে স্তবকে, স্তরে স্তরে শুভ্রশ্বেত কাশপুষ্পের ঘটা! প্রভাতে সন্ধ্যায় শেফালি-পুষ্পের মধুর গন্ধ এই বর্ণলালিত্যের প্রাণে কি মোহ-উন্মাদনা জাগাইয়া মৃদুমন্দগতিতে কাহার অভিসার উদ্দেশে গমন করে—কে জানে ?

এবার ক্ষেত্রের অবস্থা বড় ভাল, কৃষক-পরিবারের আনন্দের সীমা নাই। সমস্ত ধান্য-ক্ষেত্রই প্রায় পীত-শ্যামল, মাসখানেকের মধ্যেই হৈমন্তিক শস্য কাটিবার সময় আসিবে, এখন হইতে তাহার আয়োজন চলিতেছে।

রণবীর ক্ষেত্রকার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়া অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিতেছিল। রবির আলো অস্ত যাইতেই পশ্চিমগগনে শুকতারা হাসিয়া উঠিয়াছে, মধ্যগগনে নবমীর চন্দ্রকলা ভাসমান, গ্রীষ্মের পর প্রথম শীতের বায়ুপ্রবাহ নবীন বসন্তের মতই সুখসঞ্চার করিয়া ফিরিতেছে।

আকাশের সেই স্নিগ্ধ আলো, ক্ষেত্রের সেই শ্যামল শোভা, বাতাসের সেই চঞ্চল-পুলক রণবীরকে কি এক যেন অভূতপূর্ব্ব আনন্দে অভিভূত করিয়া তুলিল। অতি সুখের বিহ্বলতায় একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে ক্ষণকাল উর্দ্ধমুখে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এই চিত্রবিচিত্রা ধরণী যাঁহার শোভা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যাঁহার মহিমা, এই সুখদুঃখভোগী জীব যাঁহার সৃজন, মনুষ্যের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত অগম্য, সেই বিশ্বপতি পরমকারণের উদ্দেশে সে পরিপূর্ণ প্রাণে বার বার নমস্কার করিয়া পুনরায় গৃহাভিমুখী হইল

রণবীরের পত্রাচ্ছাদিত মৃন্ময় গৃহে গোময়লেপিত সুপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে পাথরের একটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির। গ্রামে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা পড়িবার পূর্ব্বেই পত্নী পার্ব্বতী সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া স্বামীর অপেক্ষা করিতেছিল। রণবীর আসিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া জয় মহাদেব, জয় জয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিয়া দিতেই সীতা, সতী, রুক্মিণী, ভবানী প্রভৃতি আরও কয়েক জন স্ত্রীলোক দুই চারিটি বালকবালিকা-সহ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে কেহ রণবীরের আশ্রিতা,—কেহ বা অল্পদিনের জন্য আত্মীয়ভবনে আসিয়াছে, কেহ বা পাড়াপ্রতিবাসী, এক ঘণ্টার জন্য দেখা শুনা করিতে আসিয়া সারা বেলাটা এইখানে কাটাইয়া আরতির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তৎপূর্ব্বে বারবেলায় কি দ্বারের বার হইতে আছে ? এতক্ষণ ইহাদের গানের ধূম লাগিয়াছিল রান্নাঘরের রোয়াকে! সেখানে দুই জনের হাতের ঘূর্ণায়মান চাকির সম লয়ে সমবেত সকলের সম্মিলিত কণ্ঠতান এতক্ষণ বেশ সমজোরেই ঘুরপাক খাইতেছিল। তাহারা আসিলে সকলে মিলিয়া দীপারতি শেষ করিয়া দেব-প্রণাম করিবার পর যে যাহার স্থলে গমন করিল।

পার্ব্বতী সাধারণ হিন্দুকন্যার ন্যায় সুগৃহিণী।

নিষ্ঠাবতী পত্নী। পূজাশেষে স্বামীর পা ধুয়াইয়া দিয়া, তাঁহাকে খড়ম পরাইয়া সে গেল চা আনিতে। চা-পানটা অনেক দিন হইতেই রণবীরের এমন অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে যে, ভাত রুটী না পাইলেও বরঞ্চ একদিন চলে, কিন্তু সকালে-সন্ধ্যায় চাটুকু না পাইলে প্রাণ তার ঠোঁটের আগায় আসিয়া জমে।

রণবীর ততক্ষণ মাদুরপাটির উপর তৈল-দীপের সম্মুখে বসিয়া পকেট হইতে একখানি হিন্দুস্থানী কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছু পরে স্ত্রী আসিয়া মস্ত এক বাটি নাতি-উষ্ণ চা তাহার সম্মুখে ধরিতেই কাগজখানা একবার নীচে রাখিয়া দুই হাতে চা-পাত্র ধরিয়া এক নিশ্বাসে সমস্তটা নিঃশেষ পূর্ব্বক বাটিটা পার্ব্বতীর হাতে দিয়া পুনরায় পাঠে প্রবৃত্ত হইল।

পার্ব্বতী তখন ক্ষুদ্র একটি আলবোলা রণবীরের নিকটে রাখিয়া বসিল—তামাক সাজিতে রোয়াকের একপাশে ছোট একটি কড়ায় গুলের আগুন প্রস্তুত ছিল, সেইখানে বসিয়া সে টিকা ধরাইয়া তাহা কলিকার তামাকের উপর রাখিয়া ফুঁক পাড়িতে লাগিল। সে ফুঁককৌশলে তামাক একদণ্ডও স্থির থাকিতে না পারিয়া অচিরাৎ জ্বলিয়া উঠিল। তখন আলবোলার মাথায় উপরে তাহাকে স্থানদান করিয়া নলটা স্বামীর হাতে তুলিয়া দিবামাত্র কাগজ পড়িতে পড়িতেই তিনি তাহাতে টান সুরু করিয়া দিলেন। তাহার শিশুপুত্র কিষণদাস আজ বাহিরের ছেলেদের সহিত সমস্ত দুপুরবেলাটা মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়া ঠিক সন্ধ্যা-বেলাতে রোয়াকের একখানা খাটিয়াতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; আলবোলার শব্দে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে লাফাইয়া নীচে নামিয়া পিঠের দিক্ হইতে রণবীরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া ডাকিল, "বাবুজি, পিতাজি!"

পিতা কিন্তু আজ এমন পাঠনিমগ্ন যে, পুত্রের আদরের বিনিময়ে তাহার প্রতিদিনের ন্যায় পাওনাটা পর্য্যন্ত তাহাকে দিতে ভুলিয়া গেলেন, এমন কি, হাসিয়া তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

রণবীর পড়িতেছিল, একবিংশ পঞ্জাবী রেজিমেণ্টের নায়ক হইয়া কর্ণেল টড সাহেব ফ্রান্সে লড়াই করিতে যাইতেছেন। সমস্ত পঞ্জাবে সে জন্য নবসৈন্য সংগ্রহ চলিয়াছে। এই গ্রামে সৈন্য ভর্ত্তি হইবার শেষ দিন আগামী কল্য। এই সংবাদেই তাহাকে এতদূর বিমনা করিয়াছে। টড সাহেবের সঙ্গে সে যদি না থাকে, তবে তাঁহাকে রক্ষা করিবে কে? সে যে তাঁহার ট্যালিসম্যান—রক্ষাকবচ। আর তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারিলে ইংলণ্ডের ত সমূহ ক্ষতি। সে জানে, তাহার কর্ণেল সাহেবই ইংলণ্ডের একটি-মাত্র সেনাপতি—যাঁহার জীবনমৃত্যুর উপর সমগ্র রাজ্যেরই জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে।

রণবীরের মন দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল। "কি করিবে সে? যাইবে না থাকিবে? কি তাহার কর্ত্তব্য?"

খোকা আরও দুইবার পিতাজি—বাবুজি—বলিয়া ডাকিল, কিন্তু উপেক্ষিত হইয়া কণ্ঠ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া ফুফাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রণবীর তখন কাগজখানা আছড়াইয়া নীচে ফেলিয়া শিশুকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন, দু' একবিন্দু অশ্রু-জল শিশুর মুখে পতিত হইল।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "লড়াইকা ক্যা খবর পতিজি?"

মুখ নত করিয়াই রণবীর উত্তর করিল, "কুছ নেহি, কুছ নেহি।"

(৩)

"আরে ভাইজি রণবীর ডেরামে হো?"

তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা মহাবীর এইরূপে হাঁকিয়া পরদিন প্রায় বেলা দুই প্রহরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় এত প্রখর রৌদ্রে বাড়ীতে আরাম করিয়া নিদ্রা যাইবার পরিবর্ত্তে গ্রামের ডাকসাইটে অলস মহাবীরের এখন এখানে আসিবার অবশ্যই একটু নিগূঢ় কারণ ছিল। কারণটা এই, তাহার গর্ভবতী পত্নীর মূর্চ্ছা হইতেছে, পাঁচ জনে বলিতেছে, ঝাড়ফুঁক কর। রণবীর যদি এ কার্য্যের ভারটা লয়, তাহা হইলে আর অন্য ওঝার সন্ধানে যাইতে হয় না। তাহার মাথার একটা বোঝা নামে।

পার্ব্বতী এতক্ষণ উঠানের ছায়ার ধারটাতে বসিয়া বিচালি কাটিতেছিল, কাজটা শেষ করিয়া সবেমাত্র বঁটিখানা রোয়াকের গায়ে ঠেসাইয়া কাটা বিচালির রাশি থলির মধ্যে ভরিতে আরম্ভ করিয়াছে,—কৃষাণ গরু লইয়া আসিয়াই যাহাতে জাব দিতে বিলম্ব না হয়; এমন সময় মহাবীরের আবির্ভাবে সে উঠিয়া

দাঁড়াইয়া কহিল, "ঘরমে ত নেহি হ্যায়, ভাইজি ; খবর ক্যা হো ?"

খবর যে বড় ভাল নয়, সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিয়া ক্ষুদ্রহৃদয়ে সে অন্য ওঝার তল্লাসে চলিয়া গেল ; কিন্তু বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল, রণবীর আসিলেই তাহাকে যেন পার্ব্বতী পাঠাইয়া দেয়। ঝাড়ফুঁক না করিলেও সে সময়টা সেখানে তাহার উপস্থিত থাকাটা চাই-ই চাই।

পার্ব্বতী খবরটাতে বড় দুঃখিত ও চিন্তিত হইল। কাজকর্ম্ম শেষে সন্ধ্যাবেলাটা সেইখানেই কাটাইবে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিচালিগুলা থলি-বোঝাই করিয়া লইল ; তাহার পর উঠানটি একবার পরিষ্কার-রূপে ঝাঁটাইরা শয়নগৃহের দিকে যাত্রা করিল। আজ বাড়ীর আর সকলেই কিষণদাসকে লইয়া শিব-নারায়ণের কথা শুনিতে পার্ব্বতীর ভ্রাতৃভবনে গিয়াছে। ভ্রাতা স্বয়ং আসিয়া তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কাজকর্ম্ম দেখিবার ছুতায় পার্ব্বতী কেবল যায় নাই, আসল কথা, সে গেলে রণবীরের অসুবিধা হইবে যে। কিন্তু ভাইয়ের কাছে পার্ব্বতী কথা লইয়া ছাড়িয়াছে যে, তিনি আজই কিষণদাসকে আবার নিজে রাখিয়া যাইবেন। সে একটি রাতও ছেলে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না যে।

তখনো অনেকটা বেলা ছিল; কিষণদাসের অভাবে আশ্বিনের বেলাও পার্ব্বতীর আষাঢ়ের বেলার ন্যায় সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছিল। কাজকর্ম্মেও কেমন মন লাগিতেছিল না। কিষণদাস ঘরে থাকিলে সমস্ত বাড়ীটা গুলজার করিয়া রাখে ; ছোটে, খেলা করে, দোলনায় দোলে, আর মায়ের সকল কর্ম্মের সহযোগী হইতে গিয়া প্রতিকর্ম্মে বাধা দেয়—তবুও সকল কর্ম্ম কত সহজে কত শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া যায়। আজ তাহার মা বেলায় বেলায় বিছানাপত্র ঠিক করিয়া লইয়া বেলায় বেলায় রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। উনুনে আগুন দিয়া সন্ধ্যার তরকারী কুটিয়া লইয়া রুটীর ব্যঞ্জনটা প্রস্তুত করিয়া রাখিল, স্বামী আসিলে শুধু গরম গরম রুটী কয়খানা তৈয়ার করিয়া দিয়া তাঁহার আহারের পর দু'জনে মহাবীরের স্ত্রীকে দেখিতে যাইবে। তরকারীটা নামাইয়া চায়ের জলটা উনুনে চড়াইয়া সে বাসনগুলা কূয়ার তলায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় দরজায় উঁকি মারিল নিহিল সিংহ ; রণবীরের গ্রামবন্ধু। তাহার ছোট ভাইটির বরাত প্রেরণ উপলক্ষে সপরিবার রণবীরকে সে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। তাহারা কাল না যাইলে এ কাজটা যে সুসিদ্ধ হইতেই পারে না, ভাবে, ইঙ্গিতে, বাক্যে, ভাষ্যে, তর্ক-যুক্তিতে নানারূপে ইহা সপ্রমাণ করিয়া, রণবীরসহ পার্ব্বতী নিশ্চয়ই কাল সেখানে যাইবে, পার্ব্বতীর নিকট হইতে এই কথা লইয়া তবে শুভ গোধূলি-লগ্নে সে বিদায় গ্রহণ করিল।

গোয়ালে তখন গরুগুলির হাম্বারব শুনিয়া পার্ব্বতী সেখানে গিয়া প্রত্যেক গরু-বাছুরের নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিল, প্রতি গামলায় জাব ঠিকমত পড়িয়াছে কি না দেখিল ; দু-একটা গামলা খালি রাখিয়া কৃষাণ জল আনিতে গিয়াছিল, কৃষাণ আসিতে না আসিতে পার্ব্বতী ভুষি, বিচালি প্রভৃতি গামলায় ঢালিয়া ঠিক করিয়া রাখিল। তাহার পর গোশালে ধুঁয়া দিয়া দীপ-হস্তে যখন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন গ্রামে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহার যে এখানে আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে, সে বুঝিতেই পারে নাই। আকাশে চাহিয়া দেখিল, দিনের আলো একবারেই নিভিয়া গিয়াছে ; ঠিক মাথার উপরে সুনীল আকাশে মস্ত চাঁদখানা হাসিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে আলোকে তাহার হাতের দীপ একান্ত ম্রিয়মাণ।

এত দেরী হইয়াছে এখনো আজ রণবীরের দেখা নাই! আরতির যে বিলম্ব হইয়া যায়!

একেই ছেলেটা কাছে নাই বলিয়া মনটা খারাপ আছে ; মহাবীরের পত্নীর খবরেও মনের উপর একটা চাপ পড়িয়াছে—এ সময় স্বামীকে অনাগত দেখিয়া কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা, অকারণ আকুলতা তাহার মনের মধ্যে যেন চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে যেন একটি টিকটিকি গৃহকোণে টিক্ টিক্ করিয়া উঠিল! একটা বাদুড় পাখনার ঝপ্‌টা দিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল! ইহা অলক্ষণ বা সুলক্ষণ! কি জানাইতে চাহে ইহারা ?

কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য দিবার আজ তাহার সময় নাই। সন্ধ্যা যে বহিয়া যায়। কষ্ট, দুঃখ, আশঙ্কা মনে চাপিয়া লইয়া একাকী সে সন্ধ্যারতি সমাপন করিল ; রণবীর চাকরী ছাড়িয়া গৃহে আসিবার পর আজি এই প্রথম এ সময়ে সে ঘরে নাই। আরতির

শেষে স্বামি-পুত্রের মঙ্গলকামনায় একান্ত-প্রাণে দেব-প্রণাম করিয়া উঠিয়া আবার সে দরজার দিকে চাহিল। দূরে যেন নাগরা-জুতার শব্দ শুনিল; শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল, এতক্ষণে রণবীর আসিতেছেন। দরজা ভেজান ছিল, আগন্তুকের হস্তস্পর্শে খুলিয়া গেল—কিন্তু উঠানে প্রবেশ করিল কে? রণবীর নহে; তাহার দেবরপুত্র রণজিৎ। নৈরাশ্যের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যা খবর বেটা!"

ধীর-কণ্ঠে রণজিৎ কহিল, "পল্টন চলা গিয়া।"

"যানে দেও বেটা! সরকারজিকা জয় জয়কার!"

"কাকাজি বি গিয়া!"

"কাঁহা?"

"পল্টনকা সাৎ।"

"পল্টনকা সাৎ কাহে রে?"

"লড়নেকো।"

"লড়নেকো! হামারা বেটাকো পিতাহীন করকে গিয়া। হা ভগবান্‌জী!"

এই বলিয়া মর্ম্মভেদী আকুল ক্রন্দনে ভূমিতলে সে লুটাইয়া পড়িল।

(৪)

ভারতসৈন্য ফ্রান্সে পৌছিয়া যেরূপ অভূতপূর্ব্ব অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে যে মাথাগুলা তাহাদের পায়ের দিকে লুটাইয়া পড়ে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। সংবাদপত্রে সে সময়ে ইহার যে বিশদ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায় যে, ফ্রান্সের নরনারী সিপাহী সৈনিকের উপর কেবল জয়ধ্বনি এবং ফুলবর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অনেক প্রবীণা—এমন কি, অনেক নবীনাও চুম্বন-আশীর্ব্বাদে তাহাদিগকে সমাদৃত করিয়া লইয়াছিল। উজ্জ্বলকান্তি সুরূপ সুপুরুষ রণবীর-প্রমুখ দলের উপর যে এইরূপ সম্মান অতিমাত্রায় বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। লজ্জাবতী স্ত্রীলোকের মতই এই আদর-ভারে রণবীর মুহ্যমান কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।

উল্লিখিত আনন্দ উল্লাসের মধ্যে যখন সিপাহীর দল গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌছিল, তখন তাহাদের হর্ষ হাসি "ট্রেঞ্চের" অন্ধকারের মধ্যেই বিলীন হইয়া পড়িল।

যুদ্ধ কোথায়; কাহার সঙ্গে; কোথা হইতে গোলাগুলী পড়ে, কাহার উদ্দেশে কামান ছোটে? রণতূর্য্যই বা বাজায় কে? যুদ্ধের আহ্বান ইঙ্গিত কোথা হইতে ভাসিয়া আসে? সেনানায়কই বা কে তাহাদের?

রণবীর টড সাহেবের রেজিমেণ্টের সৈনিক; কিন্তু এ পর্য্যন্ত মুখামুখিভাবে একটি দিনের জন্যও সে তাঁহার দেখা পায় নাই। এ কিরূপ দানব-যুদ্ধ?

তবুও তাহাদের এ যুদ্ধে অভ্যস্ত হইতে খুব যে বেশী দিন লাগিয়াছিল, তাহাও নহে। বলিতে গেলে যুদ্ধারম্ভেই তাহারা সুনাম অর্জ্জন করে। ভারতসৈন্য ইয়োরোপ পৌছে শীতের প্রারম্ভকালে—অক্টোবরের প্রথমদিকে। মাসান্তেই ৩১শে অক্টোবরের যুদ্ধে সিপাহী গোলন্দাজ খুদদাদ এই সমরাগ্নি পরীক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ ডি সি উপাধি লাভ করিল। যখন তাহার দলের সকলেই নিহত আহত, একটি কেহ আর তাহার সহায়-সম্বল নাই, তখনও চতুর্দ্দিকে সেই মৃত্যুবেষ্টনের মধ্যে একাকী বসিয়া দ্বিতীয় "কাশিবিয়ানকা" খুদদাদ অকুতোভয়ে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল—এক মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কামান ত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করে নাই।

কামানের প্রাণান্ত ধ্বনির মধ্যেও ১৯১৪ সাল নিঃশব্দে পলায়ন করিয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ মার্চ্চ মাসে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণরা এখন কোথায়? যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাহারা বেলজিয়ম ছার-খার বিধ্বস্ত করিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু একান্ত ইচ্ছা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও প্যারিসের ফটকে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নগরীর প্রায় ৬০ মাইল দূরে আইন নদীর ধারে আটক পড়িয়া গিয়াছে।

মিত্রদল ছোট-খাট যুদ্ধে তাহাদের হটাইয়া রাখিয়া মাত্র জার্ম্মাণ-নিপাত-যজ্ঞের আয়োজনে আপনাদিগের সর্ব্বশক্তি প্রায় ব্যাপৃত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। যুদ্ধারম্ভের প্রায় ৮ মাস পরে ২২শে মার্চ্চে নুভেস্তাপলে যে যুদ্ধ হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই ইংরাজের প্রথম জার্ম্মাণ আক্রমণ। এই আক্রমণে সিপাহীগণ যেরূপ অসমসাহস এবং অপূর্ব্ব পরাক্রম দেখাইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের চিরকীর্ত্তি। সিপাহী গণহীর সিং (গোইর

সিং) এই যুদ্ধে V.C. উপাধির অধিকারী হন। কিন্তু জীবিত অবস্থায় ইহা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই, সম্রাট্ এই সম্মান দ্বারা মৃতবীরের স্মৃতি ভূষিত করিয়াছিলেন।

অনুজ্ঞা পাইবামাত্র এই মহাবীর বায়নেট-হস্তে কতিপয়মাত্র সহচর অনুচর সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে জার্ম্মাণদিগের সর্ব্বপ্রধান (main) ট্রেঞ্চে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার প্রত্যেক বিভাগ এমন অসীম বলে ও কৌশলে আক্রমণ করেন যে, শত্রুগণ অচিরাৎ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। যে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যের সহায়তায় গণবীর জার্ম্মাণদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, রণবীর তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

ইহার পর ষাট পাহাড়ের (Hill Co) যুদ্ধ; আমাদের এই ক্ষুদ্র গল্পের নায়ক রণবীরের ভাগ্য ইহার সহিত বিশেষরূপে জড়িত।

(৫)

ওয়াইজার (Yzer) নদীর ধারে শত্রু মিত্র, উভয় পক্ষই নিজ নিজ কোটরসদনে (trench) থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। জার্ম্মাণেরা প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, মিত্রদল হটাইয়া দিতেছেন। যদি কোন একটা অশুভ মুহূর্ত্তে শত্রুদল পার্শ্বের উচ্চস্থান Hill Co অধিকার করে, তবে তাঁহাদের সমূহ বিপদ্, আর তাঁহারা যদি পূর্ব্ব হইতেই ইহা লইতে পারেন, তবে তাঁহাদের সংস্থিতি (Position) অনেকটা নিরাপদ্। এই অধিকারের চেষ্টায় কোন পক্ষেরই ছল-বল-কৌশলের ত্রুটী নাই।

ব্যোমযান উপরে উঠিয়া সৈন্যাবাসের সংবাদ লইতেছে, কামান-সংস্থাপন লক্ষ্য করিতেছে। শত্রুদল মিত্রবেশ ধরিয়া ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে। মিত্রদল বনের মধ্যে লুকাইয়া অগ্রগামী। গ্রামপথে যুদ্ধক্ষেত্র সহসা রাতারাতি বনে পরিণত হইতেছে। বারুদ-বিদীর্ণ ধরাতলে লুকাইয়া শত্রুর কাছে থাকিয়াও এক পক্ষে আত্মরক্ষায় সহজ হইবে, অন্য পক্ষে এই সুড়ঙ্গ-পথে শত্রুর ট্রেঞ্চে অগ্নি দিতে পারিলেই ত মহা মঙ্গল।

কত রকমের কামান, উভয় পক্ষের ট্রেঞ্চের স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে রক্ষিত। ইহার মধ্যে জার্ম্মাণের হাউইট্জার (Howitzer) কামানই ধ্বংস-সাধনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার গোলাগুলী সঙ্কীর্ণ ট্রেঞ্চের মুখেও আসিয়া পড়ে, অন্য কামানের দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হয় না। অথচ এই নিশ্চিত মৃত্যু ব্যর্থ করিয়া কৌশলী সেনাদল অগ্রসর হইতেছে।

উভয়ের ট্রেঞ্চ-বাসভূমি সম্মুখাসম্মুখী; এত কাছাকাছি যে, কোন কোন অংশ হয় তো বা ৫০ হাতও দূরে নয়। ট্রেঞ্চে লুকাইয়া বসিয়া অনুমানে অথচ অঙ্ক-গণনার মত অব্যর্থ সন্ধানে পরস্পরের আলাসের উদ্দেশে গোলাগুলী চলে। ট্রেঞ্চের পরিখায় বালির স্তূপ, ট্রেঞ্চের বাহিরে জালের বেষ্টন, তাহা ভেদ করিয়া শত্রুর অধিকারে প্রবেশ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে।

তিন জন সৈনিক একটা সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতেছিল। এক জন ইংরাজ, এক জন ফ্রেঞ্চ, এক জন হিন্দু সিপাহী। তিন জনের অবস্থা অনেকটা একই রকম। ঘরে মরাই-ভরা শস্য, সুন্দরী স্ত্রী, নয়নমনোহারী শিশু। এমন সুখের গৃহবাস ছাড়িয়া তিন জনেই স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিতে আসিয়াছে। এখানে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ণের বা জাতির ভেদাভেদ নাই, তিন জনেই ইহারা অকৃত্রিম বন্ধু। রণবীরের প্রতি ইহাদের পরম শ্রদ্ধা, অসীম বিশ্বাস। ইহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, রণকুশলতা কতবার তাহাদিগকে আসন্ন-মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিয়াছে।

কাজ করিতে করিতে ইহারা নীরব নির্ব্বাক্ ছিল না। ফ্রেঞ্চ বলিতেছিল, গৃহের এত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া সে যে এখানে আসিয়াছে, তাহার কারণ তাহার দেশ, to saover his patricla, France, ইংরাজ বলিল, আর তাহার আসিবার কারণ, তাহার জাতি to save his Nation, এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর তাহাদের জাতীয় মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে। এই বলিয়া উভয়েই চাহিল তাহার হিন্দুসহযোগীর প্রতি। মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিল না; কিন্তু ফরাসী সৈনিকের নীরব নয়নের প্রশ্ন রণবীরের কর্ণে সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইল, "তুমি কেন আসিয়াছ? pour quoietes vous vem ?" সে উত্তর কি দিবে এ প্রশ্নের? সত্যই ত' সে কেন আসিয়াছে? তাহার দেশের জন্যও আসে নাই, জাতির জন্যও নহে। সৈনিককর্ত্তব্যপালনেও সে আসে নাই, কেন না, সে সৈনিক ছিল না। তাহার কর্ত্তব্য ছিল স্ত্রীপুত্রপালন। তাহা অবহেলা করিয়াই সে আসিয়াছে, কি উত্তর দিবে তবে সে? সে উত্তর

দিতে যাইতেছিল—"জানি না, কেন আসিয়াছি, প্রাণ দিতে আসিয়াছি, শুধু এইটুকু জানি।

কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, ভেরী বাজিল, ইহাই রণসজ্জার ইঙ্গিত। তিন জনে উঠিয়া ত্রস্তগতিতে সৈন্যের সারিতে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল।

অবিরাম গোলা নিক্ষেপে শত্রুপক্ষ পরস্পরকে সাদর বন্দনা জানাইল অর্থাৎ bombardment আরম্ভ হইল।

(৬)

অনবরত গোলাগুলী পড়িতেছে, একস্থানে গোলা পড়িয়া সহস্র খণ্ডে ঠিকরিয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, বিষাক্ত গ্যাসে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিতেছে, জলন্ত তৈল-দ্রবের পিচ্‌কিরি ছুটিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, তবুও এই অসীম যন্ত্রণায় লক্ষ্যপাত না করিয়া অনুজ্ঞা পাইবামাত্র অকুতোভয়ে সিপাহীর দল সম্মুখীন হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বায়নেট উঠাইয়া শত্রুর দিকে ধাবিত হইল, ইহাকেই বলে বায়নেট charge। দলে দলে হতাহত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, দলে দলে পশ্চাতের সৈন্য তাহার স্থান পূরণ করিতে লাগিল। কিন্তু জার্ম্মাণ হাউইটজার কামানের গোলায় অল্পক্ষণে লৌহপ্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়া যায়, মনুষ্য-প্রাচীর আর কতক্ষণ টিকিবে। এই মহাবিপদে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়, যদি ব্যাটারী নিস্তব্ধ করিতে পারা যায়। ব্যোমযান কিছু পূর্ব্বে জার্ম্মাণ ব্যাটারীর সংস্থান কোথায়, তাহার সংবাদ দিয়াছে। একবিংশ পঞ্জাব রেজিমেণ্টের সেনাপতি আগুয়ান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তোমরা আমার সৈনিকেরা এই সাহসের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিবে? শত্রু-নিধন করিয়া জয়-সম্মানের অধিকারী হইবে, এস, অগ্রসর হইয়া দাঁড়াও। কে তোমরা আমাদের রক্ষা করিয়া ইংরাজ ফ্রেঞ্চ মিত্রমণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ করিবে, এস, দাঁড়াও,—আমার বীর সৈনিকেরা, আমাদের সাহায্যে অগ্রসর হও।"

প্রত্যেক দলের সেনানায়ক আপন আপন সৈন্যদলকে এইরূপে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দল হইতে দুইচারিজন সাহসী পুরুষ আসিয়া তাহাদের সেনানায়কের সম্মুখীন হইল। রণবীর আসিয়া দাঁড়াইল সর্ব্বাগ্রে। তাহার সেনাপতির সহিত,—প্রভু টড সাহেবের সহিত মাঝে মাঝে ইতিপূর্ব্বে তাহার কয়েক বার দেখা হইয়াছে, কুচ করিবার সময়, রণে প্রবৃত্ত হইবার সময় সৈনিকশ্রেণীতে দাঁড়াইয়া কতবার সে তাঁহার দিকে চাহিয়া নীরবে অভিবাদন জানাইয়াছে, কিন্তু এত নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের আহ্বানবাণী সে ইতিপূর্ব্বে আর শুনে নাই।

রণবীর অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই কর্ণেল সাহেবও তাহাকে যেন এই প্রথম চিনিতে পারিলেন. উৎসাহিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"তুমি ট্যালিসম্যান! আমার brave follower, তুমি আছ এ যুদ্ধে, আমার কোন ভয় নাই, আমাদের নিশ্চয় জয়।"

এক অপূর্ব্ব আনন্দে রণবীরের মনঃপ্রাণ সহসা পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেহ অপরিমিত দৈববলে যেন বলীয়ান্ বোধ হইতে লাগিল। জয়সম্মানে ভূষিত হইতে কি ইহার অধিক আনন্দ, ইহার অধিক আত্মপ্রসাদ সে লাভ করিবে? রণবীর তাঁহার সাদর-বাক্যের উত্তরে নীরব প্রফুল্ল হাস্যে পুনরায় সাহবকে অভিবাদন করিল। ইহাই তাহার অন্তরের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ।

(৭)

অসাধ্য সাধিতে হইয়াছে, গোলন্দাজগণ নিহত, বন্দী; ব্যাটারী নীরব। কিন্তু যাহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক সৈনিকই জীবিত, আর কেহই প্রায় অনাহত নাই।

রণবীর যখন শেষ গোলন্দাজকে হত করিয়া রক্তাক্ত বায়নেট তাহার বক্ষ হইতে খুলিয়া লইল, তখন সহসা অস্ত্রখানা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। তুলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল, তাঁহাতে সে অক্ষম, স্কন্ধমূল হইতে বাহুমূলে অসীম বেদনা, বস্ত্র-বর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্তপ্রবাহ ছুটিতেছে, তবুও বাম হস্তে বায়নেট উঠাইয়া সে ধীরপদে অগ্রসর হইল। দুঃসাহসী বাহক-দল ইতিমধ্যেই রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া নিহত, সংজ্ঞাহীন এবং চলৎশক্তিরহিত আহতদিগকে শিবিকার মধ্যে উঠাইয়া লইয়াছে, রণবীর তাহাদের পাশে পাশে চলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, শিবিকা দ্রুত চলিয়া গেল।

তখন মধ্যাহ্ন, কিন্তু সূর্য্য কোথায়—কোন্ গগনে লুকাইয়া আছেন, কিছুই বুঝা যায় না। আকাশ মেঘে ঘোলা, রাস্তা জলে কাদা, রাত্রি হইতে টিপ্‌টিপ্ করিয়া

বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহার বিরাম যে কখন্ বা কবে হইবে,—কেহ বলিতে পারে না। জার্ম্মাণরা এ যাত্রা পরাজিত; ট্রেঞ্চও দূরে নয়; তবুও পথ নিরাপদ্ নহে, যে কোন মুহূর্ত্তে এক জন জার্ম্মাণ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বায়নেটবিদ্ধ করিতে পারে, দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতেও পারে। সে এখন অক্ষম,—ছুটিয়া পলাইতে পারিবে না বা যুদ্ধ করিতে পারিবে না। রণবীর কৌশলে বনপথে পড়িয়া কিছুক্ষণ একটা বৃক্ষতলে বসিল। আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেশের উজ্জ্বল সূর্য্যের মূর্ত্তি কল্পনা করিল! আর কি কখনও নিজের দেশের সেই মেঘশূন্য সূর্য্যচন্দ্র-বিভাসিত নীলাম্বর সে দেখিবে? আর তাহার সেই সাধ্বী পত্নী—প্রাণাধিক পুত্র—কোথায় পড়িয়া রহিল তাহারা? একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ট্রেঞ্চে পৌছান চাই।

প্রায় তাহাদের ট্রেঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এই সময় এ কি দৃশ্য! একপদ-হীন টড সাহেব কোনরূপে আপনাকে বনমধ্যে টানিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন,—এখান হইতে কেমন করিয়া কি উপায়ে এখন ট্রেঞ্চে যাইবেন? তাঁহার দলের লোক কেহ ত তাঁহার সন্ধান জানে না। সহসা রণবীরকে দেখিয়া তিনি বিস্ময়-আনন্দে অবাক্ হইয়া গেলেন। সত্যই যে সে তাঁহার ট্যালিসম্যান! রণবীরের ডান হস্তে বল নাই, তথাপি কি এক দৈবশক্তিতেই প্রণোদিত হইয়া সে যে এক হস্তের সাহায্যেই তাঁহাকে পিঠে চাপাইয়া লইয়া গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিষাক্ত গ্যাসে ফুসফুস এখনও পরিপূর্ণ—কষ্টে সে নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছিল, দাবানলে গণ্ডদেশের কিয়দংশ বিদগ্ধ বিকৃত, বাহুমূল হইতে রক্তধারা প্রবাহিত; কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা তাহার মনেও পড়িতেছে না, তাহার একমাত্র ভাবনা, সে যদি টড সাহেবকে লইয়া হাঁসপাতালে পৌছিতে না পারে।

কিন্তু পৌছিল—সে পৌছিল। হাঁসপাতালের পাদদেশে আসিবামাত্র, সেবকের দল যখন তাহার পৃষ্ঠ হইতে টড সাহেবকে নামাইয়া লইল, তখন সে ভূমে লুটাইয়া পড়িল; তাহার আগে নহে। টড সাহেব ভিতরে যাইবার পূর্ব্বে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতায় দুই হাতে তাহার হাত ধরিলেন। রণবীরের কর্ত্তব্য সমাধা হইয়াছে, তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া সংসার-নির্লিপ্ত সেই হিন্দু বীর, ভগবদ্গীতার আদর্শ কর্ত্তব্যসাধক—আনন্দের হাসি হাসিয়া তখনি প্রাণত্যাগ করিল!

* * * *

কর্ণেল টড সাহেব আরোগ্যলাভ করিয়া ডি, সি সম্মানে ভূষিত হইবেন। সম্রাট্ যখন স্বহস্তে এই ক্রস অলঙ্কার তাঁহার বক্ষে পরাইয়া দিলেন, তখন সাহেবের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা আনন্দাশ্রু বা শোকাশ্রু!

রাজকন্যা

(নাট্যোপন্যাস)

—:•••:—

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত।

উপহার

এসো এসো ওগো প্রসাদকুমার
এসো কল্যাণি, রূপসী বালা,
শোনাব একটি করুণ কাহিনী—
ছুটে এসো কাছে, রাখিয়ে খেলা।
তারো নাম ছিল কল্যাণী দেবী—
রাজার মেয়ে সে,—গরবী নয়,
রূপ তোর মত অতটা না হোক্
গুণে কিন্তু সেরা বলিতে হয়।
বড় হবে যবে দুটি ভাই বোনে
এমনি সত্যে রহিও ধ্রুব,
সার্থক হোক নাম তোমাদের—
এই দিদিমার আশিস্ শুভ।

রাজকন্যা

প্রথম দৃশ্য

—:*:—

নৃত্যগীত ঐক্যতান বাদনের মহল্লা।

শিক্ষয়িত্রী, গায়িকা, বাদিকা ও নৃত্যকারিণীগণ।

গীত।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

রজনী রজত-মধুরা,
গাও গো রঙ্গে, বাজাও সঙ্গে;
রুমু-ঝুমু নাচি আমরা।
বাজাও সেতারা বীণ, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিন্,
ধীরে থমকি দ্রুত চমকি,
তারে তারে তারে মীরে ঝঙ্কারে অধীরা—
রুমু-ঝুমু নাচি আমরা॥
বাজাও শারঙ্গ, নীরতরঙ্গ, তালে তালে তালে
মঞ্জুল বোলে মন্দিরা।
রুমু-ঝুমু নাচি আমরা।
সঙ্গীত-গানে ঐক্যবাদনে বিধুরা—
মত্তচরণ, রুমু-ঝুমু ঝন—নুপুর গুঞ্জন-মুখরা।
স্পর্শে হর্ষে শিহরে মেদিনী
বিমানে বিহরে—পুলকরাগিণী
সুখ-কম্পিত বিহ্বল যামিনী—
স্তব্ধ মুগ্ধ অপ্সরা!
মনসাধে নাচি আমরা॥

(একবার নৃত্যগীতের পর)

শিক্ষ। বেশ, বেশ, ঠিক হয়েছে। কেবল বাজন্দারণীদের বসার ভঙ্গীটা একটু বদ্‌লাতে হবে। ওগো—সেতারণি, তুমি সেতারের দিকে মাথাটা আর একটু হেলিয়ে রাখ,—আর তুমি মৃদঙ্গিনী, একটুখানি আরো স'রে ব'স দেখি—বীণা ও সেতারার ঠিক পিছনে—বুঝলে?

তাহারা। আচ্ছা আচ্ছা অধিকারী মশায়—হোল তো?

(হাস্য করিতে করিতে তথাকরণ)

মন্দিরাওয়ালী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আমার জায়গা ত মৃদঙ্গিনী দখল কর্‌লে—আমি তবে যাই কোথা?

শিক্ষ। মন্দিরা—তুমি শারঙ্গের কাছে দাঁড়াও—বস্‌লে হবে না। অত কাছে না, এই রকম একটু তফাত, গাছের কাছে, একটু আড়ালে; ঠিক হয়েছে বাঃ! যেন ছবির মত দেখাচ্ছে!

তাহারা। বাঁচা গেল, আর ভঙ্গী বদ্‌লাতে হবে না?

(কাহারো ঘাড়টা বাঁকাইয়া, কাহারো হাতটা হেলাইয়া, কাহারো মুখ ঈষৎ তুলিয়া, কাহাকেও একটু পাশে সরাইয়া— পুনঃ পুনঃ সকলকে অবলোকন করিতে করিতে)

শিক্ষ। না, আর বদ্‌লাতে হবে না,—এবার ঠিক হয়েছে,—চমৎকার! কিন্তু দেখো, সময়কালে ভুলে যেন গোলমাল ক'রে ব'স না।

তাহারা। তা কর্‌বো না, তা কর্‌বো না, এখন হয়েছে তো? অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি তো?

শিক্ষ। বাঃ! এখনি যে সেতারণীর ঘাড়টা সোজা হয়ে গেল। বীণাপাণির হাতটা নীচু হয়ে পড়লো! আঃ, পারি না আর তোদের সঙ্গে।

(সচকিতে ভঙ্গী ঠিক করিয়া লইয়া)

উভয়ে। আর হবে না, আর হবে না, নিশ্চয় বল্‌ছি, প্রতিজ্ঞা।

নৃত্যকারিণীগণ। আমাদের হাবভাব কিছু বদল কর্‌তে হবে না তো অধিকারী ঠাকরুণ?

শিক্ষ। না, তোদের কায়দা ঠিকই আছে,—এবার আরম্ভ।

(পুনরায় নৃত্যগীত-বাদন)

কিবা রজনী রজত-মধুরা।
গাও গো রঙ্গে বাজাও সঙ্গে,
রুনু-ঝুনু নাচি আমরা।

ইত্যাদি—

প্রথমা (গান সমাপনে) সন্ধ্যার গান তো হোল; সজ্জার গানটা গেয়ে নেওয়া যাক্—

সাজাব তোমারে আজি মোরা যতনে
সুকোমল সুন্দর মণিভূষণে!
কুঙ্কুম চন্দনে, অলক্ত রঞ্জনে;
কুসুম-সুবাসিত চারু বসনে—

শিক্ষ। থাম থাম, হস্তিনী আস্‌ছে—

(সহসা গীতবাদ্যাদি বন্ধ করিয়া)

সকলে। সত্যি নাকি, সত্যি নাকি! আঃ! নাম শুনলেই আতঙ্কে অঙ্গ শিউরে উঠে!

দু-একজন। জয় জয় মাতঙ্গিনী দিদির জয়—

অন্য একজন। জয় জয় ভাণ্ডারণীর জয়!

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাত। মহলা দেওয়া হোল? তৃতীয় প্রহরের বিস্তর তো আর বিলম্ব নেই—এখনো তোদের এখানে মজলিস চল্‌ছে!

প্রথমা। আমার আবেদনটা মাতঙ্গিনী দিদি!

দ্বিতীয়া। আমার নিবেদনটা কর্ত্রী ঠাকুরুণ—

মাত। তোদের নিবেদন-আবেদনের জ্বালায় দেখছি আমার তিষ্ঠনো ভার।

তৃতীয়া। (চুপে চুপে) ডালির কথাটা বল্—খালি কথায় কি চি ড়ে ভিজে লো!

প্রথমা। এই রত্নহার আপনার পুজার জন্য এনেছি—আমার চৌতালা বাড়ীটি যাতে শীঘ্র হয়ে যায়।

(হার সমর্পণ)

দ্বিতীয়া। এই আমার অর্ঘ্যদান—আপনার অনুগ্রহ হ'লেই আমার ভাইয়ের চাকরীটি হবে।

(হস্তের বলয় খুলিয়া প্রদান)

তৃতীয়া। এই আমার বেণীবন্ধ আপনার চরণে অর্পণ করছি—আপনার কৃপার উপর আমার স্বামীর পদোন্নতি নির্ভর করছে।

মা। (হাস্যমুখে) হবে হবে—সবই হবে।

(একজন দরিদ্র রমণীর প্রবেশ)

মা। এ আবার কে?

রমণী। আপনার নাম শুনে বড় আশা ক'রে এসেছি। আপনি মহারাণীকে ব'লে বাবাকে যদি কারা থেকে মুক্তি দিয়ে দেন। তাঁর কিছু দোষ নেই গো—কিছু দোষ নেই।

প্রথমা। (চুপে চুপে) ভেট কিছু এনেছিস্ কি? নইলে শুধুই মাথা হেঁট, বুঝলি লো?

রমণী। আমার ধনরত্ন কিছুই নেই! যা ছিল, সব গেছে—সব গেছে। এই যা আছে, কেবল হাতের বালা দু'গাছি—তাই চরণে অর্পণ করছি—আর আমার প্রাণভরা কৃতজ্ঞতায় আজীবন আপনার কেনা দাসী হয়ে থাকব!

মাতঙ্গিনী। (বালা হস্তে লইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া স্বগত) এ কি সোনা! ঠিক যেন পিতল। তায় আবার ফাঁপা এমন যেন সোহাগার খই। এই নিয়ে কি না আমায় ভেট দিতে এসেছে! মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখ! সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠেছে। (প্রকাশ্যে) দেখ, আমি রাজাও নই—রাণীও নই যে, দণ্ড পুরস্কারে রাজ্য ওলট-পালট ক'রে দেব। এ রকম অনুরোধ করাই আমাকে অপমান করা।

রমণী। বড় আশা ক'রে এসেছি, মা গো ফেরাবেন না, তাড়াবেন না, একবার মহারাজ্ঞীকে বলুন, রক্ষা করুন—গরীবকে, অনাথাকে; ভগবান্ আপনার ভাল করবেন। (চরণে পতন)

মা। এ তো ভাল জ্বালায় পড়েছি। এ সব বেয়াড়া লোকেই বা অন্তঃপুরে আসে কেন? এ কি রাজ-কন্যার মহল পেয়েছ নাকি? পা ছাড় বলছি, (পা টানিয়া লইয়া) চোখের জলে, হা হুতাশে এবং ময়লা কাপড়ের দুর্গন্ধে দরবার জমাতে চাও সেখানে যাও বাছা, আমরা ও সব সহ্যি করতে পারবো না। দ্বাররক্ষিকা—প্রতিহারিণি!

রমণী। (ভূমিতে পড়িয়া) মা রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

(দ্বাররক্ষিকার প্রবেশ)

মা। এ কি রকম কাণ্ড! রাস্তার লোক এসে

ধ'। ক'রে পায়ে পড়ে লোটাবে, এ তো দেখছি, বড় বাড়াবাড়ি!

দ্বার। বাইরের লোক নাকি! তা তো জানি নে। আমি ভেবেছিলাম, ললিতার কোন আত্মীয়া—মাপ করবেন!

মা। মাপ—মাপ মাপ করবার আমি কে? বেজায় সব বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। সরাও একে এখান থেকে।

রমণী। (কাঁদিত কাঁদিতে, উঠিয়া) মা গো, সংসারে কি আর ধর্ম্ম-বিচার নেই! ভগবান্ কোথায় তুমি!

মা। কথায় কথায় ভগবান্ দেখান। ভগবান্ শীঘ্র তোমায় মুক্তি দিন। প্রতিহারিণি, যা, এখন এখান থেকে ওকে নিয়ে যা। আর যেন কাজে এ রকম গাফেলি না হয়।

দ্বার। চল, মর্‌তে কি আর জায়গা ছিল না তোমার।

[রমণীকে লইয়া দ্বাররক্ষিকার প্রস্থান।

মা। তোমরাও সবাই প্রস্তুত হয়ে নাও—আমি ফুল আনতে চল্লুম। [প্রস্থান।

প্রথমা। মাগী যেন রাক্ষসী, দেখলে গায়ে জ্বর আসে।

দ্বিতীয়া। আহা, মেয়েটি স্নানের ঘাটে আমাকে ধ'রে পড়েছিল—তাতেই আমি এ সময় তাকে এখানে আসতে বলি। কে জানে, সত্যিই বাঘিনীটা ওকে গিলে ফেলার যোগাড় কর্‌বে।

তৃতীয়া। ওটা না মর্‌লে রাজ্যের লক্ষ্মীশ্রী নেই।

সকলে। (আঙ্গুল মট্‌কাইয়া) মরুক—মরুক।

প্রথমা। তা হ'লে হরির লুট দেব।

দ্বিতীয়া। তা হ'লে সিন্নি দেব।

তৃতীয়া। কালীর কাছে পাঁটা মান্‌ছি।

চতুর্থী। শিবের চরণে বিল্বপত্র।

সকলে। মরেছে সে মরেছে নিশ্চয়, হরিবোল —হরিবোল—হরিবোল।

শিক্ষ। আরে থাম্, তোরা যে হাসিটা কান্না ক'রে তুললি।

প্রথমা। তাই তো—দুনিয়ার নিয়ম—প্রথমে হাসি, তার পর কান্না।

দ্বিতীয়া। আজ শিশু, কাল বৃদ্ধ!

তৃতীয়া। যার জন্ম, তারই মৃত্যু।

সকলে। তবে আবার বল ভাই, হরিবোল,—হরিবোল। (নেপথ্যে দুন্দুভিবাদন)

শিক্ষ। থাম্ থাম্, ঐ বেজেছে, হরিবোল রাখ—মধুরে শেষ কর্—গান গাইতে গাইতে চল্ যাওয়া যাক্।

রজনী রজত-মধুরা
গাও গো রঙ্গে বাজাও সঙ্গে
রুনু-ঝুনু নাচি আমরা॥

[গান গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যানভূমি।

নানাপ্রকার ফুলরাশি ও ফুলের টুক্‌রী সম্মুখে রাখিয়া মালিনীকন্যা সুগন্ধা অলঙ্কার রচনা করিতেছে।

সু। (একগাছি সপ্তনর হাতে তুলিয়া) এগাছি রাজকন্যাকে না পরালে তৃপ্তি নাই; এই ঝরা ফুল-গুলার মধ্যে হারটি লুকিয়ে রাখি—মাগী এসে পড়লে মুস্কিল হবে। কই, মধুগন্ধা তো এখনো এল না,—পদ্মফুল তুল্‌তে গেছে—সে তো কখন্?

(মধুগন্ধার প্রবেশ)

এই যে পদ্ম পেয়েছিস্ দেখছি।

মধু। অনেক খুঁজে একটি পেয়েছি দিদি। আজ কাল কি পদ্মের সময়—রাজকন্যা চেয়েছেন—তাই যেন তাঁকে আত্মদানের জন্যেই একটি অসময়ে ফুটেছিল।

সু। ভারি যে কবি হ'য়ে উঠলি? এই টুক্‌রীর মধ্যে তবে ফুলটি লুকিয়ে রাখ—মাগী এসে দেখলে আর রাজকন্যাকে দিতে পার্‌ব না, ফুল নিয়ে চ'লে গেলে তখন দিয়ে আস্‌ব। ঐ বুঝি আসছে—একটা যেন ছায়া দেখছি, নূপুরগুঞ্জন কানে বাজছে—লুকো—লুকো।

ম। (পদ্মফুল লুকাইতে লুকাইতে) আসতে আজ্ঞা হোক।

দুজনে। আসতে আজ্ঞা হোক, জয় মাতঙ্গিনী—রাণীসঙ্গিনীর জয়—জয়—জয়—

(হাসির প্রবেশ)

হা। বলি এত জয়-জয়কার কি আমার অভ্যর্থনায় নাকি? বড় তো সৌভাগ্য!

সু। ও মা! এ যে হাসি!

ম। তাই ভাল, বাঁচলুম—আমাদের আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গিয়েছিল!

সু। আমরা, ভাবলুম—বুঝি কুহকিনীটা এল,—এই নে ভাই,—সাতনর—

ম। এই নে ভাই পদ্মফুল, অনেক কষ্টে একটি যোগাড় করেছি। মহারাণীর জন্যে এতটা কষ্ট করতে ইচ্ছাই হোত না—কিন্তু আমাদের রাজকন্যা চেয়েছেন।

সু। মাগীকে দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, ভয়ে ভয়ে এতক্ষণ সাতনরগাছি ঝরা ফুলগুলোর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম।

হা। তবু তো তার জয়-জয়কার ছাড়িস নে?

ম। বল না থাকলেই ছল ধরতে হয়, নইলে দীন-হীন দুর্ব্বল আমাদের উপায় কি ভাই! রাজকন্যাকে ফুলগুলি দিয়ে ভাই, আমাদের প্রণাম জানাস।

হা। মহারাণীর জন্য কি অলঙ্কার তৈরী করেছিস্—একবার দেখে যাই—রোজ তো আসতে পাই নে।

সু। না ভাই, আর দেরী করিস্‌নে—শীঘ্র যা—তার আসার সময় ঘনিয়ে এল।

ম। তোর হাতে এ সব দেখলে আর রক্ষা থাকবে না।

হা। তবে তো আমি ভয়ে ম'রে গেলুম।

সু। তুমি না মর—আমরা তো মরব।

হা। মাগীর যেন বাপকেলে ধন। সংসারে এমন অকৃতজ্ঞ লোক আর দেখেছিস? রাজকন্যার মা বড় রাণীর খেয়ে প'রে মানুষ, আর তিনি মরতে না মরতে তাঁর সতীনের ঘরে ঢুকলো।

ম। তা ঠিক—হয়েছে,—রাহু রাজা—তস্য মন্ত্রী কেতু তো চাই। বড় রাণীর কাছে কিন্তু মাগীটার এ রকম মূর্ত্তি ছিল না, যেন কত ভাল মানুষটি!

ম। তা গেছে, ভালই হয়েছে, ও রকম লোক যাওয়াই ভাল।

হা। তা যাক্ না, মরুক না, কিন্তু যার স্নেহে তুই মানুষ, কি ক'রে তার মেয়ের সঙ্গে এমন ক'রে বাদ সাধিস্? মুখ দেখলেও পাপ হয়!

সু। জানিস্‌নে ভাই,—স্নেহ-মমতা করুণার ঋণ—দু'রকম ক'রে শোধ দেওয়া যায়, এক কৃতজ্ঞতা দিয়ে, আর এক কৃতঘ্নতা দিয়ে।

ম। তা ঠিক! রাণী তাকে যে রকম অনুগ্রহ করতেন—কৃতজ্ঞতায় তো সে ধার শোধ হবার নয়, তাই মাগী অন্য পথ ধরেছে।

সু। যা হোক, তুই ভাই পালা, আর একদিন ফুলের গহনা সব ভাল ক'রে দেখাব—

ম। হ্যাঁ ভাই—আর দেরী না—এখনি স'রে পড়্।

সু। ঐ আস্‌ছে, ঐ আস্‌ছে—পালা।

হা। কোথা দিয়ে যাই—এই দিকে—ও মা, ঐ যে, কোন্ দিকে ছুটি!

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

(এদিকে ওদিকে পলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে হাসি ঠিক মতঙ্গিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল)

মা। এ কে! হাসি দেখছি যে! আহা, কি নামই মা-বাপ দিয়েছিল গো! কখন তো মুখে এ পর্য্যন্ত হাসি দেখলুম না!

হা। পথ দেও গো, আমায় এখনি যেতে হবে।

(হাসির পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা, মাতঙ্গিনীর তাহাতে বাধা দান)

মা। ফুলে ফুলে যে চুবড়ি ভরা দেখছি। শুধু ফুল, না ফুলের গহনা—সাতনর—তার উপর আবার পদ্মফুল। বুঝেছি, ষড়যন্ত্র বুঝেছি, এই জন্যই মহারাণী একটা ভাল ফুল পান না।

সু। না দিদি, সাতনর আমরা গাঁথি নি—ও নিজে গেঁথে আমাদের দেখাতে এনেছিল।

মা। এ পদ্মফুলও আমরা দিই নি দিদি, ও কোথা থেকে তুলে এনেছে, আমরা সেই অবধি ওর কাছে ফুলটি চাচ্ছি—

সু। বল্‌ছি—অসময়ের ফুলটি আমাদের দে—মহারাণীকে দিলে ফুলটি সার্থক হবে—তা দিচ্ছে না।

মা। দে ভাই ফুলটি—মহারাণীর জন্য দে।

হা। কেন দেব! আমি তো নেমকহারাম নই। চিরদিন যাঁর অন্নে, যাঁর স্নেহে পালিত—ধনের লোভে আজ তাঁকে ত্যাগ করব, এমন বংশে জন্মাই নি আমি!

মা। (স্বগত) উঃ!—অসহ্য! (প্রকাশ্যে) যত বড় মুখ না তত বড় কথা—বেরো বল্‌ছি এখান থেকে!

হা। কেন বেরোব—তোমার কি না-বাপের বাগান—

মা। উঃ! দম্ভ দেখ! ওলো আঁধারচোখি, গোমসামুখি, আমার বাপের বাগান্ না, তোর বাপের বাগান না কি?

হা। আমার রাজকন্যার বাপের বাগান।

মা। রাক্ষসি, হতভাগি, এ আমার মহারাণীর বাগান। এ ফুল নিয়ে তুই যাস কি ক'রে—তাই দেখব।

(মাতঙ্গিনী টুকরী কাড়িতে উদ্যত হইলে হাসি সরিয়া দাঁড়াইয়া)

হা। খবরদার, এ ফুলে হাত দিও না।

মা। সুগন্ধা, মধুগন্ধা, ফুল কেড়ে নে বল্‌ছি ?

হা। কেড়ে নিবে! কাড়ুক দেখি!

সু। দে ভাই দে,—কেন মিছে গোল করিস্?

হা। কক্ষণো না,—প্রাণ থাকতে না! ফাঁসী তো দেবে না—

মা। ফাঁসী দেব না—শূলে দেব।

হা। দেবে দিও, ফুল দেব না, তোমার যা করবার কোরো—ভগবান্ আছেন।

[প্রস্থান।

মা। লক্ষ্মীছাড়ি, হতভাগি, পোড়ারমুখি, রাক্ষসি, গোমসামুখি, দেখব তোকে কে রক্ষা করে? তোর ভাই-ভাইপো সব নির্ব্বংশ কর্‌ব, ঘর-দোরে ঘুঘু চরাব, তবে আমার নাম মাতঙ্গিনী।

[প্রস্থান।

সু। সর্ব্বনাশ হোল দেখছি! এ কুহকিনীর অসাধ্য কিছুই নেই।

মা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে, উলু খড়ের প্রাণ যায়! আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে! কিন্তু মাগীটা বড় বাড় বেড়েছে!

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

(উদ্যান-বাটিকায় রাজকন্যা বীণা বাজাইয়া গান করিতেছেন।)

মধুর আকাশ মধুর রবি,

মধুর মিলনে আলোকিত সবি,
দশদিকে প্রেম-পুলক বয়।
লতা পাতা ফুল ঢালিছে সুগন্ধ,
বহিছে পবন শীতল সুমন্দ,
নির্ঝর তটিনী গাহিছে আনন্দ,
তব নামে বিভু উঠিছে জয়!

এত সুখ-ভরা এই নিকেতন
দ্যুলোক ভূলোক সুখে অচেতন
কেন পিতা তবে এ সন্তানগণ,
দীন দুঃখী শুধু তোমার ঘরে!
এমন ধরণী—এত সুখালোক
মেলিতে ফেলিতে পুলক-পলক
হের তাহাদের নিমীলিত চোখ,—
যাতনার অশ্রু-সলিল ভরে!
এ মহা আঁধার প্রভু হে ঘুচাও
এ সুখ-প্রভাতে তাদেরো জাগাও
তব রাজ্য হ'তে দূর ক'রে দাও,
শোক পাপ তাপ বিপদ-লেশ।
দিলে যদি জ্ঞান, কেন তবে মোহ,
কেন ঈর্ষ্যা দ্বেষ, দিলে যদি স্নেহ
এ আনন্দ-রাজ্যে কেন প্রভু দেহ,—
এত অমঙ্গল বেদনা ক্লেশ!

(একজন রমণীর ধীরে প্রবেশ এবং গান শেষ হইলে সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

কে তুমি শান্তে ?

রমণী। রাজকন্যে, আমি অভাগিনী, আপনার কাছে দুঃখ নিবেদন কর্‌তে এসেছি।

রাজ। কি দুঃখ বল ভগিনি, আমার ক্ষমতায় যদি তোমার দুঃখ নিবারণ হয়—তবে আমার সৌভাগ্য।

রমণী। সেনাপতির গরু আমাদের বাগানে ঢুকে শাকসব্‌জি নষ্ট করছিল—তাই আমাদের চাকরটা—গরুটাকে বেঁধে রাখে। বাবা তখন দোকানে ছিলেন; তিনি এ সব কিছুই জানেন না; তবুও আমাদের জিনিসপত্র সব বাজেয়াপ্ত—আর বাবাও বন্দী হয়েছেন।

রাজ। বৎসে—আমার যদি সাধ্য থাক্‌ত—এই মুহূর্ত্তে তোমার পিতাকে মুক্তি দিতুম, কিন্তু—

রম। বাবাব কিছু দোষ নেই, আপনি যদি মুক্তি না দেন, দয়া না করেন—তবে এই দীনহীন দুর্ভাগ্যেরা কার দ্বারে দাঁড়াবে ?

রাজ। (স্বগত) উঃ, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে উঠছে! (প্রকাশ্যে) আমি তোমাদের চেয়েও অসহায়া অনাথা। আমার প্রাণ দিলে যদি তোমাদের কষ্টের প্রশমন হোত, যদি রাজ্যে ন্যায় সত্য সুবিচার

ফেরাতে পারতুম—তো এক মুহূর্ত্তের জন্যও অপেক্ষা করতুম না

রম। আপনি একবার কেবল মহারাজকে বলুন।

রাজ। ভদ্রে, তোমাদের চেয়েও আমি অভাগিনী। মাতৃহারা হয়ে পর্য্যন্ত পিতার চরণ-দর্শনেও বঞ্চিত হয়েছি—কিন্তু ও কথায় আমাকে প্রবৃত্ত করো না।

রম। তবে আমাদের কি দশা হবে? বাবাই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়!—আমরা কোথায় দাঁড়াব তবে?

রাজ। বৎসে, আমার এক মুষ্টি অন্ন যত দিন মিলবে—তত দিন সে চিন্তা কোরো না, আমার এ ঘর যত দিন থাকবে—তত দিন তোমাদেরও আশ্রয় মিল্‌বে; কিন্তু তাতে তো তোমার পিতার কারামুক্তি হবে না।

রম। মা গো, অকূল সাগরে তুমি যে আমাদের তরণী দেখালে? আমি কি তবে মাকে নিয়ে আসব?

রাজ। যাও বৎসে, নিয়ে এস।

[প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

রাজ। এই সব অন্যায় অত্যাচার দেখলে—প্রাণ যে কি তীব্র বেদনায় অস্থির হয়ে উঠে, মনে হয়, অসুরমর্দ্দিনী হয়ে এ সব বিনাশ ক'রে ফেলি। তখনি আবার মর্ম্মে মর্ম্মে আপনার অক্ষমতা—দুর্ব্বলতা কি নিদারুণ ভাবেই অনুভব করি! হা বিধাতা! কেন তোমার রাজ্যে—এত নিপীড়ন, এমন অবিচার! মানুষ কি তোমার চেয়েও বড়, প্রভু! অন্যায় কি ন্যায়ের চেয়েও ক্ষমতাবান্? নিষ্ঠুরতা কি করুণার চেয়েও শক্তিশালী?

নেপথ্যে—"মা গো দয়া কর।"

(একজন কাঠুরিয়া-রমণীর প্রবেশ)

রাজ। কি চাও বাছা!

রমণী। আমার কাঠগুলো সব কেড়ে নিয়ে গেল মা! খাজনা নিতে এসেছিল, আমি বল্লুম—আজ না—আর একদিন আসিস্। তা শুন্‌লে না, কাঠগুলো নিয়ে গেল; ঘরে কিছু অন্ন নেই, ছেলেগুলো কাঁদছে মা।

রাজ।…কেঁদ না বাছা, আমার ঘরে এখনো অন্ন আছে—ছেলেদের এখানে নিয়ে এস গে। আর আমার বাগানে যত দিন গাছ থাক্‌বে, ডাল কেটে নিয়ে যেও।

রম। মা গো, রাজরাণী হও, স্বয়ং অন্নপূর্ণা মা আমার, জয় হোক!

[প্রস্থান।

(আর একজনের প্রবেশ)

"মা গো, রাজকন্যে!"

রাজ। কি বাছা?

নবাগত। মহারাণীর সেপাই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল—বাবা তা দেখে নি; রাস্তায় জল দিচ্ছিল বাবা,—দৈবাৎ জলের ছিটে সেপায়ের পায়ে লেগে গেল, আর অমনি বাবাকে ধ'রে নিয়ে গেছে মা;—মা গো, আমরা কোথায় দাঁড়াবো,—খাওয়াবার লোক কেউ আর নেই রাজকন্যে।

রাজ। আমি তো বাছা তোমার বাবাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না; তোমরা আমার কাছে এস—আশ্রয় দেব।

রন। তবে যাই মা—বোন্‌গুলোকে নিয়ে আসি?

রাজ। যাও বৎসে!

রম। শঙ্করী মা, তুমিই আমাদের কাণ্ডারী!

[প্রস্থান

(আর একজনের প্রবেশ)

নবাগত রমণী। দয়াময়ী রাজকন্যে—বাঁচাও গো।

রাজ। কি হয়েছে বাছা?

রম। আমার ছেলেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, জিনিসপত্রও সব কেড়ে নিয়েছে।

রাজ। কেন গা বাছা?

রম। আমরা মা শূদ্র—নীচ, কাহার জাত—

রাজ। সেটা তো কোন দোষের কথা নয় বাছা।

রম। দোষের কথা বড়ই হয়েছে মা; ছেলেটার মতি-গতি একেবারেই মন্দ হয়েছে—নইলে এমন দশা হয় রাজকন্যে?

রাজ। কেঁদ না বাছা, বল, কি হয়েছে?

রম। সে একজন সাধুর চাকর হয়েছিল; সাধু তাকে পাঠ করতে শেখায়, বুঝলে মা?

রাজ। সে তো ভাল কথা বাছা!

রম। ভাল কথা মা! তুমি এত জ্ঞানী হয়ে ঐ কথা বল্লে! সাধু যতদিন বেঁচেছিলেন, সব চল্‌ছিল ভাল; তিনি মর্‌তে ছেলেটা ঘরবাসী হয়েছে, এখানে এসেও কি না—পুথি পড়বে মা!—এত বলি, ও পাপ কার্য্য করিস নে, তা সে শোনে না; শেষে

রাজদ্বারে খবর উঠলো; যা ভেবেছিলুম, তাই!—দু'জন পণ্ডিত ঘরে এসে—মারপিট ক'রে সব জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে গেছে মা,—এখন কি করি বল না? ছেলেটা ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, বল তো চরণ-দর্শনে নিয়ে আসি।

রাজ। (স্বগত) কি অত্যাচার—আর শুনতে পারিনে। (প্রকাশ্যে)—যাও বাছা,—তাকে নিয়ে এস—আমার দেবী-মন্দিরে তোমার ছেলে স্তোত্র-পাঠ করবে।—

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। "মা গো রক্ষা কর মা।"

(একজন পুরুষের প্রবেশ)

রাজ। এস বাছা, কি হয়েছে?

পু। মা গো—আমরা ছোট জাত পরিয়া—একটা ষাঁড় তাড়া করেছিল, তাই ভবানী-মন্দিরে ঢুকে পড়েছিলুম—তাইতে পুরুত ঠাকুর লাঠীতে আধমারা ক'রে ফেলেছে, মা!

রাজ। (স্বগত) উঃ, কি ভয়ানক, প্রাণের রক্ত জল হয়ে যায়। দেবদেবীর দ্বারও দুর্ভাগ্যের নিকট বন্ধ! হে ব্রাহ্মণ, হে ক্ষত্রিয়, দুর্ব্বল-দলনেই কি আজ তোমাদের মহত্বের পরিচয়? হায়! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? তোমরা আমার বিনাশে শুধু না—তোমরা যে সমগ্র জাতির অধঃপতন আনয়ন করছ! (প্রকাশ্যে) বৎস, তোমার আর ভাবনা নেই—আজ থেকে আমার মন্দিরে তুমিই দেবতা পূজা করবে।

পু। মা গো, দয়াময়ি! এমন পাপ কাজ আমাকে করতে বলো না, এ জন্মে পরিয়া হয়ে জন্মেছি, পরজন্মে আবার কুকুর হয়ে জন্মাব

রাজ। বৎস, মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ রকম নিয়ম করেছে; দেবতার কাছে—ব্রাহ্মণশূদ্রের প্রভেদ নেই। বৎস! মনের শুদ্ধিই প্রকৃত শুদ্ধি। প্রকৃত শুদ্ধ মনের পূজা দেবদেবী সাদরে গ্রহণ করেন। যে সকল ব্রাহ্মণ এ রকম হীন কার্য্য করে—তারা দেবতার চরণ-স্পর্শের অনধিকারী, তুমি পূজক হ'লে আমার মন্দির শুদ্ধ হবে। এতে তুমি কুণ্ঠা বোধ ক'র না; যাও বৎস, মন শুদ্ধ ক'রে ফুল তুলে নিয়ে এস।

পু। মা যে আদেশ করেন। আমি মায়ের ভৃত্য। মূঢ় মূর্খ জন—আমরা আর কিছুই জানি না।

[প্রস্থান।

রাজ। আমার চোখের পর্দ্দা যেন খুলে গেছে, দিব্যদৃষ্টি হয়েছে। বিধাতাকে আমরা ধিক্কার দিই, অদৃষ্টকে আমরা নিন্দা করি, কিন্তু আত্মশক্তির সদ্ব্যবহারে আমরা তো কিছুই চেষ্টা করিনে। আমি অভিমানে নিষ্কর্ম্মা হয়ে এত দিন কেবল বিধাতাকে আর পিতাকেই নিন্দা করেছি, কিন্তু অদৃষ্টখণ্ডনের জন্য, অত্যাচার-নিবারণের জন্য, যথাসাধ্য সংগ্রাম করেছি কি? কিছু না—কিছু না। (অন্যমনে উর্দ্ধমুখে বীণা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে কিছুক্ষণ পরে বীণা রাখিয়া) আমার মনে আজ নবীন বল, নব আশার সঞ্চার হচ্ছে! এতদিন বৃথা কেঁদে, বৃথা দুঃখ ক'রে আমার অন্তর্নিহিত শক্তিরই অপলাপ করেছি। আজ বেশ বুঝতে পারছি, ক্রন্দন, অবসাদ, নিশ্চেষ্টতা মনুষ্যধর্ম্ম নয়, মনুষ্যত্বলোপক হীনতা মাত্র। যার মধ্যে যতটুকু শুভ শক্তি আছে, তাহার সাধনাতেই মনুষ্যের জীবন, জন্ম সার্থক, কর্ম্মই পুণ্য, কর্ম্মই ধর্ম্ম, কর্ম্মই উপাসনা। হে দেবতা! দ্যুলোক-ভূলোকের মঙ্গলময় অধিপতি! আজ হ'তে আমি সেই ব্রতই গ্রহণ করলেম, আজ হ'তে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারাই আমি তোমার পূজা করব। হে শুভ শক্তিদাতা বিধাতৃ-পুরুষ, তুমি আমাকে বর দাও, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে এই পুণ্যব্রত-সাধনে আমার সহায় হও।

হাসির প্রবেশ)

হা। রাজকন্যে, এই পদ্ম-ফুল এনেছি—আপনি এই ফুলে আজ দেবার্চ্চনা করতে চেয়েছিলেন।

রাজ। কিন্তু তোর মুখ তো আজ পদ্মের মত প্রফুল্ল দেখছি না হাসি? কি হয়েছে বল দেখি? আমার সহস্র দুঃখ-কষ্টও তো তুই হাসি দিয়ে ভোলাতে চাস্, আজ কেন তোর মুখে হাসি দেখছি নে?

হা। সেই মাগীটাকে মনে ক'রে আর হাসি আস্‌ছে না। তার সঙ্গে খুব ঝগড়া ক'রে এসেছি। এই সাতনর আপনাকে দিয়ে সুগন্ধা প্রণাম জানিয়েছে।

রাজ। কার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্?

হাসি। সেই কুহকিনী কালকেতুটার সঙ্গে। এই সাতনর আর পদ্মফুলটি আমার হাতে দেখে সে যেন রণরঙ্গে মেতে উঠলো। তবে সত্যি কথা বলি, আমিও তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

রাজ। ভাল কর নি হাসি, এতে হয় তো অনেক বিপদ্ ঘটবে—তোমাকে কত সহ্য করতে হবে।

আমার ফুলের কি দরকার সখি! আমি আজ বুঝেছি,—ফুলেই ভগবানের পূজা হয় না—পূণ্যকার্য্যেই তাঁর যথার্থ পূজা। ন্যায়, সত্য-প্রচার, অন্যায়-দমন-চেষ্টা এই এ সকলই তাঁর প্রিয় কার্য্য, ইহাই তাঁর উপাসনা। আজ থেকে সেই ব্রত আমি গ্রহণ করেছি। তুই পারবি হাসি আমার সহায় হ'তে?

হা। রাজকন্যে, আমি স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিনে, আমি শুধু তোমাকেই জানি। তুমি যে দিকে যাবে, সেই আমার পথ, তুমি যা করবে, তাই আমার কর্ম্ম; তুমি যা ধর্ম্ম ব'লে বোঝাবে, আমার মনে তাই সত্য, তাই পুণ্য, তাই ধর্ম্ম।

[অন্যান্য রমণীগণের জয়-জয়কার করিতে করিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

(মহারাণী মণিমুক্তাশোভিত সুকোমল শয্যায় বিশ্রাম করিতেছেন।)

ম। শুনছি, পঞ্চনদের রাজকুমার তার হস্তপ্রার্থী,—সে রাজরাণী হবে! উঃ, প্রাণটা যে জ্ব'লে উঠছে!—বেশ তো, যাবে যাক্ না? আমার চোখের বালি, বুকের শেল দুর হয়ে যাক্—ভালই তো। নাঃ; তার অত সুখ কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। আমি চাই বাঁদীর মত ছুটি ছুটি অন্ন দেব—দু'চারখানা ময়লা পুরান কাপড় পরাব—আর উঠ্‌তে বস্‌তে মনের জ্বালা দেব—তবু সে ছেঁড়া বালিসের মত আমার পায়ের কাছে লোটাবে। বিয়ে যদি দিতেই হয়,—শেষে আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব,—চিরকালই আমাদের চরণ-তলে পড়ে থাকবে। কিন্তু এত দিন ধ'রেও তো এ ইচ্ছা পূর্ণ হোল না, আমার বাগের মধ্যে কিছুতেই তো তাকে আন্‌তে পারছিনে। আজ আবার একেবারে ফাঁকি দিয়ে পালাতে চল্লো—উঃ—উঃ!

(কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া)

রাজরাণী! সেরাজ—রাণী, স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী—পুত্রগরবে গরবিণী! আর পারিনে! হয় তো সেই ছেলেই একদিন আমার বুকের উপর ব'সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করবে, একজন গিয়েও রক্ষা নেই আর একজন আবার—উঃ, কি যন্ত্রণা। মা চামুণ্ডে, আমি তোর চরণে কি অপরাধ করেছি, এত দিয়েও তুই সন্তান দিলিনে। এ হেন ঐশ্বর্য্যসম্পদ সব যে বৃথা ভবানি! উঃ, আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি। শত ছাগ, শত মহিষ ও-চরণে বলি দেব—নরবলি নরবলি—ঐ কুমারীর রক্তেই তোমার রাঙা-চরণ রাঙিয়ে তুলব—মা গো, প্রসন্ন হও আমাকে—

(নেপথ্যে দুন্দুভি বাদন)

এ কি, এরই মধ্যে কি বিশ্রাম, প্রহর ফুরিয়ে গেল? সজ্জার কাল এসে পড়লো? মনে যে নরক-জ্বালা—কি ক'রে এখন দেহ সাজাব!

(প্রতিহারিণীর প্রবেশ ও নমস্কারপূর্ব্বক)

প্র। মহারাজ আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এখানে আস্‌বেন; সংবাদ পাঠিয়েছেন।

রাণী। বেশ! তাঁকে মহারাণীর নমস্কার জানাও।

প্র। যে আজ্ঞে!

[নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান।

(সখীগণের থালিকাসজ্জিত রত্নালঙ্কার ও অঙ্গরাগাদি বহন করিয়া আগমন ও থালিকা নামাইয়া নমস্কার করিতে করিতে)

সকলে। জয় হোক্ মহারাণীর।

প্র-স। আমরা আজ সপ্তম সিন্দুকের অলঙ্কার আপনার সজ্জার জন্য এনেছি—আদেশ হ'লে সাজাতে আরম্ভ করি।

রাণী। (উঠিয়া হেলান দিয়া বসিয়া) সাজা তবে তোরা, নিখুঁত ক'রে সাজা! মহারাজ আজ বিকালেই আসবেন।

(সখীগণ একে একে থালিকা হইতে এক একখানি রত্নালঙ্কার হস্তে তুলিয়া লইল।)

প্র। এই রত্নমুকুট বড়রাণীর মাথার ছিল—তিনি কন্যার বিবাহের সময় নিজের মাথা থেকে কন্যাকে এই মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বি। এই হীরকহার সিংহলরাজ বড়রাণীকে যৌতুক দিয়েছিলেন।

তৃ। এই রত্নবলয়—এই মণিখচিত মেখলা—নাগর-রাজরাণী রাজকন্যাকে জন্মোপহার পাঠিয়েছিলেন।

রাণী। এ সমস্তই এখন আমার—আমারই!—

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ। এ সকল এখন আপনারই আর আপনার অঙ্গে এই সকল মণিরত্ন যেমন শোভা ধারণ করে—এমন পূর্ব্বে কারো অঙ্গেই শোভা পায় নি।

(অলঙ্কার পরাইতে পরাইতে গান)

সাজাব তোমারে আজি মোরা যতনে,
সুন্দর সুমোহন বেশ-ভূষণে।
কুঙ্কুম চন্দনে, অলক্ত রঞ্জনে,
সুগন্ধ উথলিত চারু বসনে!
তারকা-বিমোহন মুকুট সুশোভন
দিগন্ত-ঝলকন মণি-রতনে!
মুক্তা-হীরক-মালা, মরকত ফুল-কাননে
বৈদূর্য্য বাজু বালা ফুল-কাননে।
রাগিণী-ঝঙ্কৃত নূপুর চমকিত
কনক-পদ্ম পীত দিব চরণে!
মাধুরী উথলিয়া—হাসি বিকাশিয়া
উথলিবে রূপচ্ছটা দিকে গগনে।

(সজ্জা শেষ করিয়া)

প্র। কি সুন্দরই দেখাচ্ছে!

দ্বি। আহা ম'রে যাই!

তৃ। স্বর্গের অপ্সরা বিদ্যাধরীও কি এতই সুন্দরী!

(রাণীর উঠিয়া ভাবভঙ্গী সহকারে আয়নায় আপনাকে নিরীক্ষণ।)

রা। এইবার কুসুমালঙ্কার পরিয়ে দে দেখি তোরা।

প্র। মাতঙ্গিনী দিদি এখনো এসে পৌছন নি।

প্র। এত দেরী যে আজ?

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

দ্বি। এই যে নাম করতেই।

তৃ। মাতঙ্গিনী দিদি, আমরা তোমারই জন্য অপেক্ষা করছি,—ফুল—কই?

প্র। এ কি শূন্য হস্ত যে!

মা। মহারাণি, ভয়ে কব, না নির্ভয়ে কব?

রা। অবশ্য নির্ভয়ে। ব্যাপারখানা কি বল দেখি? সজ্জার সময় তুমি অনুপস্থিত, আর এলে যখন, তখনো—ফুল নিয়ে এলে না! হেঁয়ালি ব'লে মনে হচ্ছে যে!

মা। রাজকন্যার দাসী এসে তাঁর জন্যে সব অলঙ্কার—সব ফুল নিয়ে গেছে।

রা। রাজকন্যার জন্যে? আমার অলঙ্কার—আমার ফুল সমস্ত তার জন্যে নিয়ে গেছে? তুমি কি প্রলাপ বক্‌ছ—মাতঙ্গিনী?

মা। প্রলাপ নয়—সত্যি কথাই বল্‌ছি মহারাণি!

রা। (ভ্রূকুটিক্রুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া) এ কি, আমাকে যে পাগল ক'রে তুল্লে! মালিনীরা দিলে কেন?

মা। তারা বল্লে—হাসি এসে সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে গেল; হাজার হোক, রাজকন্যার দাসী ত—তাই তারা কিছু বল্‌তে সাহস পেলে না।

রা। কি আস্পর্দ্ধা—অসহ্য অসহ্য। (স্বগত) দেবীর কাছে বলি দিলেই এর সমুচিত শাস্তিবিধান হয়। (প্রকাশ্যে) বন্দী ক'রে আন্‌তে বল মাতঙ্গিনী,—শুধু তাকে নয়, তার কর্ত্রীকেও।

মা। ক্ষমা করবেন—একটি কথা বল্‌তে দিন—

রা। কি বল্‌বে বল, আমি কিন্তু কিছুতেই ক্ষমা করতে পার্‌বো না!

প্র। প্রমোদ-ভবনে মালী যে ফুল রেখে গেছে, তাই কি নিয়ে আসব?

রা। হ্যাঁ, সেই রকম দশা দাঁড়িয়েছে বটে। পুষ্পালঙ্কার যত রাজার মেয়ের, আর—

মা। আর বাগান ঝাটান ঝরা ফুল যত রাণীর! এ কথা মুখে আনিস্ কি ক'রে লো?

রা। না, আমার ফুলের দরকার নেই। (মাতঙ্গিনীর ইঙ্গিতে) পরিচারিকাগণ, তোমরা এখন যাও, আমার সজ্জা শেষ হয়েছে।

[সখীগণের নমস্কারপূর্ব্বক প্রস্থান।

মা। মহারাণি,—ধৈর্য্য ধরুন; প্রকাশ্যে এ রকম কোন শাস্তির আজ্ঞা দিলে আমরাই শেষে হেরে যাব। হাজার হোক্, তিনি রাজকন্যা, কোন প্রহরী বা সৈনিক কেহই এ আজ্ঞা সহসা পালন করতে চাবে না।

রা। তুমি কি ভুলে যাচ্চ—সেনাপতি আমার ভ্রাতা? সেনাপতির হুকুম কেউ পালন করবে না?

মা। কিন্তু নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়ে পালন করবে,—

আর রাজার কানে কথাটা উঠলে ক্ষতি হবে আমাদেরই।

রা। তুমি তবে কি পরামর্শ দাও, বল, আমার এখন মাথার ঠিক নেই। তুমি একটা উপায় উদ্ভাবন কর। প্রতিশোধ আমি চাই-ই চাই—এ রকম অপমান সহ্য ক'রে চুপ ক'রে থাকা আমার কর্ম্ম নয়।

মা। আপনার অপমান—আপনার চেয়েও আমার অসহ্য। আমি নিশ্চয়ই শোধ তুলব—হাসিকে জব্দ করবই—আর তাকে জব্দ করলেই রাজকন্যা জব্দ হবেন।

রা। উপায় কি ঠাওরাচ্চ বল দেখি ?

মা। চুপে চুপে হাসির বাড়ীতে আগুণ ধরিয়ে দেব—সবংশে সব নির্ব্বংশ হবে।

রা। হাঁ, তাতে হাসির দণ্ড হবে বটে, কিন্তু আমি রাজকন্যারও দণ্ড চাই—পঞ্চনদের রাজপুত্র এসে যে তাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে—এ আমার সহ্য হবে না।

মা। তা যাতে না হয়, তার ত সহজ উপায় প'ড়ে আছে, আপনার ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিন না ?

রা। রাজা কি রাজী হবেন ?

মা। আপনার কথায় রাজী হবেন না—কি বলেন ? কিন্তু আগে সে কথা বলবেন না, আগে বিয়েটা ভেঙ্গে দিন। পঞ্চনদের রাজা এদের অপমান করেছিলেন, এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেই এটা সহজে সিদ্ধ হবে।

রা। যদি না হয় ?

মা। তখন অন্য উপায় ভাবা যাবে, আমি থাকতে আপনার কোন ইচ্ছাই বিফল হবে না—এ বেশ জানবেন। দেখুন না, এখনি আমি কি ক'রে আসি।

রা। যাও মাতঙ্গিনী, তুমিই আমার প্রকৃত সখী, বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষিণী—তোমার উপকার জীবনে ভুলব না।

মাতঙ্গিনী। (স্বগত) রাজা রাণীর কথায় যে ভোলে, সেও নির্ব্বোধ—আর আপনার লাভটুকু বুঝে যে তাঁদের মন যোগায়ে না চলে—সে আরও নির্ব্বোধ। (প্রকাশ্যে) মহারাণি, আপনার কাজেই যেন এ জীবনটা কাটিয়ে যেতে পারি! তা হ'লেই জীবনটা সার্থক জ্ঞান করবো। চল্লেম তবে।

(মাতঙ্গিনীর প্রস্থান ও প্রতিহারিণীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাণি, মহারাজ প্রমোদভবনে এসে আপনার অপেক্ষা করছেন।

রা। এরই মধ্যে ? যাও প্রতিহারিণি—সংবাদ দাও; আমি এখনি আস্‌ছি।

[প্রতিহারিণীর প্রস্থান।

(রাণীর আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাজসজ্জা নিরীক্ষণকরণ)

রা। কিছুই ত ত্রুটি মনে হচ্ছে না, আয়নায় ত রূপটা ঝলমলই ক'রে উঠছে! যাই, আর দেরী করব না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

[পুষ্পসজ্জিত প্রমোদ-গৃহ, ফুল-রচিত সিংহাসনে রাজা রাণী উভয়ে উপবিষ্ট, নিকটে সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছে। রাজা সতৃষ্ণ নয়নে রাণীর দিকে চাহিয়া গুণ গুণ করিয়া কথা কহিতেছেন এবং মাঝে মাঝে সম্মুখে সজ্জিত পুষ্পস্তূপ হইতে পুষ্প গ্রহণ করিয়া নৃত্যকারিণীদের পারিতোষিক বর্ষণ করিতেছেন।]

সখীগণের গান।

জয় জয় জয় জয়।
গাও আমাদের রাজা রাণীর জয়।
এমন সুখের রাজ্য কোথা ত্রিভুবনময়!
ফুলে হেথায় নাইক কাঁটা,
মেঘে নাইক আঁধার-ঘটা,
আলোক মধুর স্নিগ্ধ ছটা, প্রখর তপ্ত নয়।
জয় জয় জয় জয়।
গাও আমাদের রাজা রাণীর জয়!
এমন সুখে আমরা আছি নাহি দুঃখ ভয়!
হেথা সদাই বাজে মধুর বাঁশী,
শুধুই আমোদ শুধুই হাসি,
মলয়-বায়ু দিবানিশি, সুধা গন্ধে বয়।
জয় জয় জয় জয়!
গাও আমাদের রাজা রাণীর জয়!

[ফুলবর্ষণের মধ্যে নৃত্যগীত করিতে করিতে সখীগণের প্রস্থান।

রাজা। (রাণীর দিকে চাহিয়া মুগ্ধ নয়নে স্বগত) কি সুন্দর! যেন চমকে যেতে হয়।

রাণী। মহারাজ আজ আমার পরম সৌভাগ্য, তুমি রাজ-কার্য্যে ব্যস্ত থাক আর আমি দিবানিশি তোমার অপেক্ষায় তোমারি ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকি।

রাজা। কি মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করেছ মহিষি! তোমাকে দেখলে আমাব কোন কার্য্যই— কোন কথাই মনে থাকে না। অতৃপ্ত হৃদয়ে ঐ রূপ-সুধাসমুদ্রে মগ্ন হয়ে পড়ি।

রাণী। মহারাজা আমি পরম সৌভাগ্যবতী।

রাজা। তুমি সৌভাগ্যবতী, না আমি সৌভাগ্য-বান্?

রাণী। ছি ছি, ও কথা ব'ল না প্রিয়তম; এখন বল, অসময়ে কি সংবাদ দিতে এসেছ?

রাজা। একটি সংবাদ এনেছি মহারাণি! পঞ্চনদের রাজপুত্র কল্যাণীর হস্ত প্রার্থনা ক'রে দূত পাঠিয়েছেন।

বাণী। খুব আহ্লাদের কথা। পুরস্কার কিছু দিবার থাক্‌লে দিতেম, মন প্রাণ আগেই ত সব দিয়ে ফেলেছি! অমন জামাতালাভ সৌভাগ্য বটে, কিন্তু—

রাজা। কিন্তু কি মহারাণি?

রাণী। এঁর পিতা শুনেছি, মহাবাজের পিতাকে পাদুকা পাঠিয়ে অপমানিত করেছিলেন।

রাজা। এ কি কথা!

রাণী। (স্বগত) সব আশা ব্যর্থ হোল বুঝি। (প্রকাশ্যে) কিন্তু এই রকম ত সবাই বলে।

রাজা। কে বলে, নামটা কর দেখি? আমার পিতাই বরঞ্চ অন্যায় করেছিলেন। পঞ্চনদের প্রাসাদে তিনি যখন অতিথি, সেই সময় রাজার পিতৃব্যকে তিনি ব্যঙ্গ করেন, তাইতে উভয়ে দ্বন্দযুদ্ধ বাধে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পিতাই পরাজিত হন। ঘটনাটা হচ্চে এই,—ঠিক বিপরীত।

রাণী (স্বগত) বাঁচা গেল, তবু একটা সূত্র পাওয়া গেল। (প্রকাশ্যে) ওঃ, বুঝেছি, এই পরাজয়ের অপমানটা লোকে পাদুকা ধ'রে নিয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, এই ঘটনার পর তারই ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করা কি সেই অপমানকে স্বীকার ক'রে নেওয়া নয়? সে বংশের কন্যা আনা স্বতন্ত্র কথা, তাতে বরঞ্চ অপমানের শোধ নেওয়া হয়, কিন্তু অপমানিত হয়ে কন্যাদান ঘোর অপমানজনক।

ম। প্রথমতঃ দোষ আমার পিতারই; অথচ তিনি অতিথি ব'লে পঞ্চনদরাজই এই ঘটনায় যথেষ্ট লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এ স্থলে কিছুতেই আমি সে বংশের প্রতি শত্রুতা ভাব রাখতে পারিনে। দ্বিতীয়তঃ সে বহুদিনের কথা, আমার পিতার ও পঞ্চনদের পিতৃব্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে— ঘটনাও বিস্মৃতিমগ্ন হয়েছে।

রাণী। কিন্তু লোকে তা বলে না—তা বোঝে না।

রাজা। লোকে অধঃপাতে যাক্।

রাণী। কিন্তু তোমার কন্যার যে রকম দম্ভ, তাতে সেও যে ও বংশে আত্মদানে সম্মত হবে—তা ত মনে হয় না।

মহা। তার মতামত কে জিজ্ঞাসা করবে— আমার আজ্ঞাই কি এখানে যথেষ্ট নয়?

রাণী। তা হ'লে ভাবনা কি ছিল মহারাজ! সে কি এত দিনেও আমাকে মা ব'লে স্বীকার করেছে— আমার অপরিসীম স্নেহও কি তার গর্ব্বকে নষ্ট করতে পেরেছে?

রাজা। মহারাণি! ও কথা আর বলো না— আমার রক্ত আগুন হয়ে উঠে।

রাণী। আমি কি তোমাকে সব কথা বলি মহারাজ! তোমার মনে পাছে আঘাত লাগে, পাছে তার প্রতি স্নেহ তোমার ক'মে যায়—এই ভয়ে যতক্ষণ পারি—নিজের মনে সব সহ্য করি।

রাজা। তুমি ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি—

রাণী। এই আজই আমার জন্য ফুল আন্‌তে গিয়ে দাসী ফিরে এল। আমাকে অপমানের জন্যই রাজকুমারীর দাসী সব ফুল লুট ক'রে নিয়ে গেছে।

মহা। সেই জন্যই বুঝি তোমার আজ ফুলাভরণ নেই! তুমি দেবী,—তুমি মূর্ত্তিমতী ক্ষমা।

রাণী। মহারাজ, সে আমার সন্তান—কুসন্তান হ'লেও কুমাতা হয় না। আমাকে হাজার অসম্মান অবজ্ঞা করলেও—তবু তাকে আমি কিছুতেই খর্ব্ব করতে চাই নে,—তার তেজ, গর্ব্ব তার বংশেরই যোগ্য গুণ।

রাজা। রাণি, তুমি যা বলছ—এতে তার গুণ কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না—তোমার মহত্বই উজ্জল

হয়ে উঠছে। তাকে বিদায় ক'রে দাও—বিয়েটা শীঘ্র শেষ ক'রে ফেলা যাক—তোমার যন্ত্রণা ঘুচুক!

রাণী। (স্বগত) আমি যে তা চাইনে—কিন্তু আজ দেখছি বেশী বলা ভাল নয়, সময় বুঝে বল্‌তে হবে।

রাজা। মহিষি, তোমার প্রতি যে এরূপ ব্যবহার করে, তার মুখ-দর্শন কর্‌তে আমার ইচ্ছা হয় না। ভগবান্ আমার সন্তান-ভাগ্য বড়ই মন্দ করেছেন! যাকে নিয়েছেন তার পরিবর্ত্তে যদি একে গ্রহণ কর্‌তেন!

রাণী। মহারাজ, আমি যদি প্রাণ দিয়েও সে শোক নিবারণ কর্‌তে পার্‌তাম!

রাজা। ভগবান্ যদি তোমার গর্ভে আমাকে একটি সন্তান দিতেন, তা হ'লেই আমার সব শোক নিবারণ হোত!

(অভিনয়-শিক্ষয়িত্রীর প্রবেশ)

শি। (নমস্কারপূর্ব্বক) জয় হোক! আমরা প্রস্তুত, আদেশ হলেই দৃশ্যপট উন্মুক্ত করা যায়।

রাজা। ক্ষণকাল বিলম্ব কর। এ কি! এমন চীৎকার ধ্বনি উঠছে কেন?

(নেপথ্যে আগুন—আগুন—রক্ষা কর,—রক্ষা কর মহারাজ—মহারাজ)

শি। তাই ত—এ কি ব্যাপার!

রাজা। যাও, দেখ, প্রতিহারিণীকে ডাক, আমি অভিনয়ের আদেশ পাঠাব।

[যথাদেশ বলিয়া অভিবাদনান্তে শিক্ষয়িত্রীর প্রস্থান।

(প্রতিহারিণীর আকুলভাবে প্রবেশ)

প্র। মহারাজ—বিষম অগ্নিকাণ্ড! পশ্চিম প্রজাবাস জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে!

রাজা! মন্ত্রী, সেনাপতি এঁরা সব কোথা তাঁরা অবশ্যই নির্ব্বাণ প্রয়াস করছেন!

প্র। মহারাজ! প্রজাগণ আপনার দর্শন চাচ্ছে, আপনার নিকট দুঃখ নিবেদন কর্‌তে এসেছে।

রা। মহারাজ কি নিজে অগ্নি নির্ব্বাপিত কর্‌বেন—এইরূপ তারা প্রত্যাশা করে?

রাজা। রাণি, সুস্থির হও, আমি সব বন্দোবস্ত কর্‌ছি। প্রতিহারিণি, সেনাপতিকে ডাক্‌তে বল।

[প্রতিহারিণীর প্রস্থান।

রাণী। মহারাজের মত করুণহৃদয় রাজা পেয়েই তারা এমন অসময়েও অসম্ভব প্রস্তাব করে। তারা কি মহারাজকে একটু বিশ্রামেরও অবসর দেবে না?

(প্রতিহারিণীর পুনঃপ্রবেশ)

প্র। মহারাজ, রাজকন্যা আপনার দর্শনে এসেছেন—এখানে আস্‌তে চান।

রাজা। রাজকন্যা—কল্যাণী?

প্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—আমাদের রাজকন্যা!

রাজা। এখানে আস্‌তে চায়। কখনই না। এমন অবাধ্য কন্যার মুখদর্শন কর্‌ব না। যাও প্রতিহারিণি, এখানে আস্‌তে তাকে নিষেধ কর।

প্র। তিনি বলেছেন, খুব জরুরী—

রাজা। তুমি যাও, আমার হুকুম প্রতিপালন কর।

[প্রতিহারিণীর প্রস্থান।

রাণী। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! কল্যাণী এখানে একবার পিতা-পুত্রীতে দর্শন হ'লে আমার মতলব সবই ব্যর্থ হবে; (প্রকাশ্যে) বোধ হয়, তিনি আমার নামেই কিছু বল্‌তে এসেছেন। দাসী ফুল লুঠ করেছে, শুনলে মহারাজ পাছে অসন্তুষ্ট হন, হয় ত তিনি তার সাফাই কর্‌তে আস্‌ছেন।

রাজা। আমি চল্লেম মহিষি, সে এখানে এসে পড়তে পারে—তার মুখদর্শন আমি কর্‌তে চাইনে!

(প্রস্থান ও পথিমধ্যে কন্যাকে দেখিয়া
স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান)

কন্যা। (প্রণাম করিয়া) অভাগিনী কন্যার প্রণাম গ্রহণ করুন মহারাজ!

রাজা। (স্বগত) সেই রকমই প্রতিকৃতি! প্রশান্ত মঙ্গলমূর্ত্তি! দেখলে ক্রোধ বিরাগ সব দূরে চ'লে যায়। এমন মধুরতার মধ্যে ত ঈর্ষাবিদ্বেষ!

(নেপথ্যে)—আগুন—আগুন ইত্যাদি)

রাজকন্যা। মহারাজ, পিতা, আমি প্রজাদের দুঃখ নিবারণ কর্‌তে এসেছি; প্রজামণ্ডল অগ্নিদাহে ভস্মীভূত! ঐ শুনুন, কিরূপ ক্রন্দন কোলাহল উঠছে

রাজা। সেজন্য ত তোমার চিন্তার কোন কারণ দেখি না! মন্ত্রী, সেনাপতি এঁরা সকলে নির্ব্বাণ ব্যবস্থা করছেন।

কন্যা। আমি সেই কথাই নিবেদন করতে এসেছি; আপনি যাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রে নিশ্চিন্ত আছেন—তারাই প্রজাপীড়ক।

রাজা। তুমি কি বলতে চাও, তারাই আগুন লাগিয়েছে?

কন্যা। মহারাজ—ক্ষমা—করবেন—প্রজারা এই বলছে—আরো—বলছে—

রাজা। কি বলছে, আমি শুনতে চাইনে—তুমি হয় ত বলবে, মহারাণীর আদেশেই এইরূপ ঘটেছে—তোমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

কন্যা। নিরীহ প্রজাদের অনুরোধ আপনি না শুনলে কে শুনবে? কে তাদের প্রতি সুবিচার করবে? সত্যই তারা মহারাণীকে—

রাজা। ক্ষান্ত হও, মাতৃনিন্দা মহা অধর্ম্ম—তোমার এই ঈর্ষ্যা আমার অসহ্য। তুমি আমাকে রাজধর্ম্ম শিখিও না, তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন ক'রে চল; তাতেই রাজ্যের সমস্ত অশান্তি অমঙ্গল দূর হবে।

[সক্রোধে প্রস্থান।

রাজকন্যা। উঃ, কি ক'রে আমি মহারাজের অন্ধ নয়ন ফোটাব! কি ক'রে দুর্ভাগ্য প্রজাদের দুঃখ দূর হবে?

[পটক্ষেপ—প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুরে রাণীর চারি জন সখী—
লতা, পাতা, ফুল, রেণু।

লতা। পাতা ভাই, এক দণ্ড আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা নেই।

পাতা। চল ভাই, আমরা রাজকুমারীর কাছে যাই—সেখানে প্রতারণা নেই, বিশ্বাসঘাতকতা নেই, কেবল স্নেহ, প্রীতি, ন্যায়, সুবিচার।

ফুল। ঠিক বলেছিস্ ভাই, এখানে এই ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যেও হাহাকার!

রেণু। কখন্ কি ব'লে বিষ-নজরে পড়ব, সেই ভয়েই অস্থির।

লতা। এ মিথ্যা জীবন আর সহ্য হয় না।

পাতা। চল ভাই, আমরা রাজকন্যার কাছে যাই।

(আলো ও ছায়ার প্রবেশ)

আ। তোরা ক্ষেপলি দেখছি! আমাদের ত সুখের অভাব নেই—অত ন্যায়ান্যায় পীড়ন অত্যাচারের সমালোচনার দরকার কি ভাই আমাদের?

লতা। হ্যাঁ সুখ! গরীব-দুঃখীর কান্না শোনাটা খুবই সুখ বটে!

পাতা। তোরা শুনতে পারিস শোন্।

ফুল। যাকে দুচক্ষে দেখতে পারিনে, তাকে রোজ চার বেলা মুখে ভালবাসা দেখান নিশ্চয়ই মহাসুখ!

রেণু। আর ত পারা যায় না।

আলো। তাতে হয়েছে কি—দুট মিষ্টি ঝুটো হ'লে যদি কাজ আদায় হয়—তাতে কুণ্ঠিত হওয়াও ত মূঢ়তা।

লতা। তা যাই বল ভাই—আর কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে।

পাতা। আমিও না।

ফুল। আমিও না।

রেণু। তোরা গেলে কি ভাই—আমি একলা থাক্‌ব না কি?

ছায়া। তবে যা—সেখানে এক মুঠো খেয়ে যদি বনের মোষ তাড়াতে চাস্ ত যা।

আলো। আমরা ভাই, তা পার্‌বও না—যাবও না।

পাতা। হাজার কষ্ট হোক্, তবুও ত সেখানে পাপের কষ্ট নেই।

ছায়া। আরে দেখা যাবে, ধর্ম্মগিরি কদিন থাকে।

আলো। আবার সেই আস্‌তে হবে লো হবে,—এই ব'লে দিলুম। এখন অভিনয়ে যাবি কি না, বল্ দেখি?

লতা। না ভাই, আমি যাব না। ও সব রঙের গান আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না এখন।

পাতা। আমারও না।

আলো। কিন্তু বুঝে দেখ, রাণী কি তা হ'লে রক্ষে রাখবেন?

ছায়া। শেষে ধনে প্রাণে মারা যাবি!

ফুল। তবে ভাই থাক্—আর রাজকন্যার কাছে গিয়ে কাজ নেই;—কি বলিস্?

রেণু। চল ভাই, তবে অভিনয়েই যাওয়া যাক্।

লতা। তা তোরা যে যাবি যা, আমি অভিনয়ে যাব না—আমি রাজকন্যার কাছেই যাব—মরি, সেও ভাল।

পাতা। আমারও ভাই অসহ্য হয়েছে—আমিও যাব। এখন স্বামীটিকে কেবল বাগাতে পারলে হয়। সেই নিরীহ জীবটিকে যখন এই নরকচক্রে ঘুরতে দেখি—তখন একদণ্ড আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

আলো ও ছায়া। তা তোরা যা হয় কর্—আমরা চললুম।

[আলোছায়ার প্রস্থান।

লতা। চল্ ভাই আমরাও রাজকন্যার কাছে যাবার উদ্যোগ করি।

পাতা! চল ভাই, আমার আবার স্বামীটিকে বাগাতে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুসজ্জিত কক্ষ।

বিদূষক আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া
গোঁপে চাড়া দিতেছেন।

বি। গৃহিণী যা বলে, তা কিন্তু ঠিক। রাজার যেন মতিচ্ছন্ন ধরেছে—প্রজামণ্ডলে আগুন লাগ্‌লো, আর রাজা কিনা অন্তঃপুরে প্রমোদমগ্ন। সন্ন্যাস অবলম্বনই শ্রেয় হয়েছে! রাজকন্যারই আশ্রয় নিতে হোল দেখছি? কিন্তু স্থানটা শুনেছি খুব কঠোর! কেবল চালকলা খেয়ে কি কাটাতে পার্‌ব? সেইটাই ভাবছি। তা ব্রাহ্মণী ত সঙ্গে থাকবে, ভাবনা কি? সে নিশ্চয়ই আমার জন্যে মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করবে। ডান চোখটা নাচছে যে!

হাসিটি যেন সত্যই হাসি! তাকে দেখলে ক্ষুধা-তৃষ্ণাও থাকবে না আর। গিন্নি, তুমি কিন্তু ঠাকরুণ নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারছ—আমি এই ব'লে খালাস, আচ্ছা—সেই আদিযুগ থেকে মেয়েরা দেখছি সমান বোকা! রত্নাবলীকে ঘরে এনে রাজার হাতে স'পে দিয়ে তখন কাঁদলে কি আর কেউ চোখের জল মোছায়! এ শর্ম্মাকে দে'খে যে, সে রত্নাবলীটিও মনটি ঠিক রাখতে পারবে—তা ত কিছুতেই মনে হয় না।

(মাথা নীচু করিয়া অবলোকন পূর্ব্বক)

খুঁতের মধ্যে এইটুকু—তা সহজেই বাগাতে পার্‌ব।

(পার্শ্বের চুল দ্বারা সযত্নে টাক আচ্ছাদনের প্রয়াস, এমন সময়ে পাতার প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া টাক ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি পুনরায় গুম্ফ আক্রমণে ব্যস্ত।)

পাতা। গোঁপে যে খুব চাড় পড়েছে—এ দিকে রাজ্যে হুলস্থুল!

বি। এস এস প্রেয়সি—আমার প্রাণ-সমুদ্রে বাণ—আমার জীবন-মাঠে ধান! (স্বগত) তাকে এই রকম ক'রে বল্লেই বোধ হয় ঠিক হবে।

(আনমনে পুনরায় টাক বিন্যাস)

পা। দেখ, অত ক'রে আর চুল বাগাতে হবে না—যে রূপ আছে তোমার, তাতেই ম'রে আছি!

(হাত দিয়া চুলগুলা লণ্ডভণ্ড করণ)

বি। (শশব্যস্তে অর্দ্ধহাত দূরে গিয়া) আরে কর কি, কর কি? (স্বগত) টের পেয়েছে দেখছি, (প্রকাশ্যে) কেন প্রেয়সি, তোমার রূপে শাণ দাও; তাতে দোষ নেই, আর আমাদের বেলাতেই মানহানির দণ্ড!

পাতা। তোমাদের এখনও তরবারে শাণ দিতে হবে—দেখছ কি, সময় বড় খারাপ পড়েছে।

বি। তবেই হয়েছে—আমি ঢাল-তববার ধরলেই রাজ্য সাবাড়!

পাতা। আচ্ছা, মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বল্‌তে পার না?

বি। সর্ব্বনাশ! এতদিন রাণীর সখীগিরি ক'রে তোমার এরূপ বুদ্ধি হয়েছে? তাঁরা যদি বলেন, সূর্য্য পশ্চিমে উঠেছে, তা কখনই মিথ্যা হবার নয়—বুঝলে ত?

পা। তবে চল, সখাগিরি সখীগিরি ছেড়ে রাজকন্যার আশ্রমে যাওয়া যাক্! তোমাকে নিয়ে যেতেই আমি এসেছি।

বি। (স্বগত) তা একবার গিয়েই দেখা যাক্ না, তেমন তেমন দেখি—স'রে পড়তে কতক্ষণ!

প্রকাশ্যে) তা চল না—তুমি যে পথে যাবে, শর্ম্মা তোমার আঁচলে বাঁধা !

গান।

(কীর্ত্তনের সুর)

মান যাও ভুলে—চাও মুখ তুলে
ওগো গরবিণী ধনী রাধা !
হের বৃন্দাবন-ধন গোপী-মোহন,
তোমার অঞ্চলে বাঁধা—
ঐ শ্রীচরণমূলে বাঁধা।
হের—ভূমিতে লুটায় মুরলীখানি,
নীরব সরব রাগরাগিণী
সপ্তসুর ললিত মধুর—
তব নামে যে গো সাধা !
ওগো তুমি রাধা তার মাথার মণি—
আমাদের শ্যামরাজা সে তোমাতে ধনী,
তুমিই তাহার বাসনা কামনা—
ধরমে করমে বাঁধা।

[গান করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সেনাপতির কক্ষ।

(কক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে)

সেনা। এতদিনে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুযোগ উপস্থিত। প্রজাদের বিদ্রোহী ক'রে তুলতে আর বেশী প্রয়াস পেতে হবে না। তার পর তারা যদি জেতে ত আমি সিংহাসনে উঠবই, আর হারে, তা হ'লেও মহারাজ জানবেন—আমিই বিদ্রোহ দমন করেছি। এ চালের আর মার নাই !

(অধীনস্থ সেনানায়ক ধ্রুবকুমারের প্রবেশ)

ধ্রুব। নমস্কার সেনাপতি।

সেনা। নমস্কার ধ্রুবকুমার—খবর কি বল দেখি ? (স্বগত) এই লোকটিকে দিয়েই আমার কার্য্য সিদ্ধ করব ! লোকটা অত্যাচারবিরোধী, কিন্তু প্রকৃত বীর, এ যদি একবার নেতা হয়ে দাঁড়ায়, তা হ'লে প্রজারা সহজেই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

ধ্রুব। সেনাপতি, শুনেছেন—ঘরে আগুন লাগায় যে সব প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে রাজদরবারে অভিযোগ করতে গিয়েছিল, তারা বিদ্রোহী ব'লে বন্দী হয়েছে। উঃ, কি অরাজকতা ! শাসনের নামে কি অশাসন—বিচারের নামে কি অবিচার !

সেনা। সেটা তুমি আজ নূতন ক'রে বুঝছ—আমরা অনেকদিন থেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে এই জ্বালা ভোগ করছি—কিন্তু কি করব বল ?

ধ্রুব। কি করবেন ? মহারাজকে বুঝিয়ে বলবেন। তিনি ত দেখতে পাই, আপনার কোন কথাই অগ্রাহ্য করেন না ; তিনি ত দেখি, আপনার উপর সমস্ত ভার দিয়েছেন, আপনি যদি প্রজাদের একটু আশ্বাস দেন যে, তাদের উপর অত্যাচার হবে না, তা হ'লেই তাহা শান্ত হয়। একটু দয়া, একটু অনুগ্রহের উপর রাজ্যের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করছে অত্যাচারের সম্পর্ক ঘুচিয়ে স্নেহের সম্পর্কে তাদের আবদ্ধ করুন—দেখবেন, রাজ্য মঙ্গলশ্রীতে ভ'রে উঠেছে।

সেনা। (স্বগত) রাজ্যের মঙ্গলে আমার মঙ্গল হয় কই ? (প্রকাশ্যে) বোঝ না হে, একটু প্রতাপ না দেখালে প্রজারা মাথায় চ'ড়ে বসে, প্রতাপ প্রভাবই হচ্ছে রাজ্যশাসন।

ধ্রুব। আপনি কি সত্যি তাই মনে করেন ?

সেনা। আমি কি মনে করি না করি, তাতে ত কাজ চলে না—মহারাজ তাই মনে করেন। আমি তাঁর দাস।

ধ্রুব। এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারিনে—আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি, তিনি প্রকৃত কথা কিছু জানেন না। আপনি সাহস করুন—তাঁকে বুঝিয়ে বলুন—দেশরক্ষা করুন।

সেনা। তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীন। আমি যতক্ষণ তাঁর আজ্ঞা পালন করব, ততক্ষণই তাঁর সেনাপতি।

ধ্রুব। তবে কি আপনি বলতে চান, আমাদের রাজা সত্যই এত নিষ্ঠুর—এত অত্যাচারী—এত—

সেনা। তা আমি বলছিনে। আমি বলছি, রাজা যে রকম ক'রে রাজ্যশাসন করতে চান, অবনত মস্তকে তাই তোমাকে সুশাসন ব'লে মেনে নিতে হবে।

ধ্রু। তা আমি পারব না, তা হ'লে আমি সৈনিক পদ ত্যাগ করব। অন্যায় জেনে, বুঝে ভ্রাতৃরক্তে আমি অসি কলঙ্কিত করতে পারব না।

সেনা। তা হ'লে তুমি বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করবে?

ধ্রুব। তারা বিদ্রোহী নয়—তারা সুবিচারপ্রার্থী।

সেনা। তথাপি রাজাদেশে তারা বন্দী—রাজবিচারে তারা বিদ্রোহী, তাহাদের পক্ষ গ্রহণ করাই বিদ্রোহিতা! তুমি বিশ্বাস করবে না—এরূপ আদেশপালন আমার পক্ষে কিরূপে কষ্টকর। সময় সময় বিদ্রোহিতাভাবে আমার রক্তও জ্বালামুখীর ন্যায় ফুটে উঠতে থাকে, তবু আমি নিরুপায়—অমি দাস।

ধ্রুব। হা ভগবান্! এই রকমেই রাজভক্ত প্রজারাও অবশেষে সত্যই বিদ্রোহী হয়ে উঠে—আমার কথা শুনুন—আপনি মহারাজকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলুন।

সেনা। নিশ্চয় জেনো, তাতে আমিই কেবল বিদ্রোহী ব'লে গণ্য হব। তখন কি তোমরা আমাকে রক্ষা করতে পারবে?

ধ্রুব। রক্ষা করতে পারব কি না, জানি না, কিন্তু তা যদি হয়, আমিই নেতা হয়ে রাজবিরুদ্ধে দাঁড়াব। যাঁকে ভগবান্ প্রজারক্ষার ভার দিয়েছেন—তিনি যদি প্রজাপীড়ন করেন—তখন আর তাঁকে পিতা মনে করতে পারিনে। কিন্তু তার আগে—আমি নিজে মহারাজকে সব জানাব।

সেনা (হাসিয়া) বেশ, তাই কর, দেখ কি ফললাভ হয়!

ধ্রুব। হাসবেন না! আপনার এই অবিশ্বাসে আমার অন্তরের বল যেন সব নিঃশেষ হয়ে আসে। অথচ আমার অন্তরাত্মা বলছে, পুণ্যের জয়—ধর্ম্মের জয় অব্যর্থ, মহারাজ সত্যই নিষ্ঠুর নন। যতক্ষণ দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে, আমি এই অমঙ্গল দূর করতে চেষ্টা করব। যাই—দেখি কি উপায় করতে পারি।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। নাঃ—যা আশা করেছিলেম, হোল না, একে বিদ্রোহী করা দেখছি সহজ নয়। বেশ বুঝেছি, এই আমার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, কণ্টকটাকে যে এখন সরাতে পারলে হয়। সেজন্য ভাবনাই বা কি এত! একটা কুটাকে খণ্ড করতে বেশী বলের প্রয়োজন করে না। তার পর রাজলক্ষ্মী যে আমার অঙ্কশায়িনী হবেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজ্যই বৃথা—যদি না রাজকন্যাকে লাভ করি। এত চেষ্টাতেও ত তাঁর একদিন দর্শন পেলেম না। অথচ আর সকলে অনায়াসেই তাঁর দর্শন পায়! যখন সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে বন্দিনীকে সম্মুখে দাঁড় করাব—তখন? তখনও কি ভিক্ষুক রমণী আমার মহিষী হ'তে শ্লাঘা অনুভব করবে না? তা যদি হয়—তখন সহস্র উপায় উদ্ভাবিত হবে। এখন রাজ্যধ্বংসের উপায় দেখা যাক্।

[প্রস্থান।

(রাজপথে ধ্রুবকুমারের প্রবেশ)

ধ্রু। এ কি কাণ্ড জেনে এলাম! উঃ, কি ষড়্‌যন্ত্র! সত্যই যে বিদ্রোহিতার আয়োজন হচ্চে আর সেনাপতিই তার মূল? কি ক'রে মহারাজকে সাবধান করা যায়? তিনি দেখছি, এদের হাতের যন্ত্রস্বরূপ? হায় হায়! কি উপায়ে তাঁকে সব জানাব! রাজকন্যার কাছে গেলে হয় ত কোন উপায় হ'তে পারে! দেখি, যদি তাঁর দর্শন পাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণ। রাজকন্যা মৃগচর্ম্মে আসীনা,
সম্মুখে ভূমিতলে বীণাটি পড়িয়া।

রাজ। এর চেয়ে সব কষ্টই সুখ, কি ক'রে এ অত্যাচার নিবারণ করব? পিতাকে সাবধান করব? কে আমার সহায় হবে! কে আমাকে পথ দেখাবে। হরি, দয়াময়, কোথায় তুমি?

(পূজাসম্ভার হস্তে সখীগণের প্রবেশ)

হাসি। আমরা এসেছি রাজকন্যে, প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে—আসুন, এবার পূজা আরম্ভ করি।

রাজ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ওঃ আজ যে সরস্বতী পূজা; ভুলে গিয়েছিলুম হাসি! হায়! আজ এই পূজার দিনেও কেন পুণ্য মিলনসঙ্গীতে জগৎ সুধাসিক্ত দেখতে পাচ্ছিনে!

(মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সকলের গান)

মঙ্গল পঞ্চমী আজি ভারতী গাও পুণ্য সুমিলন গান,
সুভাব সঙ্গীত-বন্যা সরিতে, ঘুচাও ঘুচাও এ ভারতে,
দ্বেষবিদ্বেষহীন স্বার্থ অভিমান।

আর্দ্র-শোণিত-পাতে, দীপ করোটি ভাতে
হেথা গো ভারতী,—
এ কি তোমার অর্চনা আরতি,
পুণ্য পূজা অপমান!
দীন অভাজনে, করুণা বিতরণে, দেহ চেতনা,—
নিবার পাপ, কর সুধা বর দান।
প্রসাদ উথলিত, নীরব নিনাদিত, বীণা তানে—
দেবি, প্রীতিপূরিত কর পৃথ্বি বিমান।
বাক্যে কর্ম্মে ভাবে ধর্ম্মে যজ্ঞে-যাগে
প্রাণে প্রাণে গো—
বহাও মিলন রাগ উদার জ্ঞান!

রাজ। (প্রদক্ষিণান্তে) স্বস্তি স্বস্তি, দেবি, প্রসন্ন হও।

সকলে। পঞ্চনদকুমার ও রাজকন্যার মঙ্গল হোক।

হাসি। (স্বগত) হায়! মনে হচ্ছে যেন, দেবীর নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

রাজ। মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, সর্ব্বভূতের মঙ্গল হোক, অভাগা অসহায় দুঃখীজনের দুঃখ দূর হোক।

(নেপথ্যে ভীষণ নাগারা শব্দ! সকলে চমকিয়া উঠিল, হস্তের দ্রব্যাদি স্খলিত হইয়া পড়িল)

রাজ। (সোৎকণ্ঠে) এ কি! আজ অসময়ে এই ভীষণ নাগারা কেন ধ্বনিত হচ্ছে?

সখীগণ। তাই তো, আজ সরস্বতী পূজার দিনে চামুণ্ডামন্দিরের নাগারা কেন বেজে উঠলো?

রাজ। হায় হায়! হয় তো কোন অভাগার বলিদানই বা হচ্ছে! হয় তো কোন নিরপরাধী শূলমঞ্চেই বা উঠছে! যাও সখীগণ, তোমরা যাও, সংবাদ আন, এই উৎকণ্ঠা নিয়ে কি ক'রে দেবীপূজা করব। আমি দেখি, কোন রকমে মহারাজের যদি একবার দেখা পাই।

(সকলের প্রস্থান ও কিছু পরে রাজকন্যার একাকী পুনঃপ্রবেশ)

রাজ। দেখা পেলাম না, কিছুতেই দেখা পেলাম না! হায়! আমার অসহায় নিরপরাধ আশ্রিতদের আমি কিছুতেই রক্ষা করতে পারব না! ওঃ পারিনে—আর পারিনে! শুনেছি, রাজপুত্র পঞ্চনদ আমার হস্তপ্রার্থী—তিনিই এসে আসুন; আমাকে বিবাহ ক'রে নিয়ে যান—এই অত্যাচার নিষ্ঠুরতা আমি আর চোখে দেখতে পারিনে, রাজা যখন রাজকর্ম্ম রাজধর্ম্ম ভুলেছেন, তখন ক্ষুদ্র আমার আর কি সাধ্য। এ রাজপুত্র, এস, আমাকে নিয়ে যাও, আর পারিনে—আমি পারিনে।

(মুদিতনেত্রে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়া পুনরায়)

কি ভয়ানক! কা'দের ছেড়ে চ'লে যেতে চাচ্ছি! এই আমার অনাথ সন্তানদের, অত্যাচারিত ভাই ভগিনীদের দুঃখসমুদ্রে ফেলে রেখে আমি সুখী হ'তে চ'লে যাব? হায়! কি ক'রে মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার এ ভাব মনে এল? তারা যদি অগ্নির জ্বালা সহ্য করে—তবে আমি কি তা পার্‌ব না? সুখের চেয়ে সে আগুন যে আমার উপভোগ্য! না—চ'লে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব—অসম্ভব! আমি শুধু বন্ধু চাই, সহকারী চাই। এস পঞ্চনদ, এস,—শুনেছি, তুমি করুণহৃদয়, ন্যায়বান্; তুমি এসে এই অত্যাচার নিবারণে আমার সহায় হও, এস বন্ধু—এস!

(ধ্রুবকুমারের আগমন ও বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজকন্যাকে নিরীক্ষণ)

ধ্রুব। কি পুণ্যমহিমময়ী মূর্ত্তি! দেখলে মন আনন্দে আর্দ্র হয়ে উঠে। স্বর্গের শিশিরধারার মত পবিত্র সেই আনন্দবারি ঢেলে চরণ ধৌত করতে ইচ্ছা হয়।

(নিকটে আসিয়া)

দেবি, নমস্কার!

রাজ। (স্বগত) কে এ সৌম্যমূর্ত্তি পুণ্যরূপ যুবা-পুরুষ? বিধাতা কি আমার প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে একেই আমার সহায়স্বরূপ পাঠালেন? (প্রকাশ্যে) কে তুমি ভদ্র?

ধ্রু। দেবি, পুণ্যবতি, আমি রাজসৈনিক, আপনার দাস, কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে চরণ দর্শনে এসেছি।

রাজ। বল ভদ্র কি কাজ?

ধ্রু। রাজার বিরুদ্ধে প্রবল ষড়যন্ত্র চলেছে—আমি গোপনে জানতে পেরেছি। প্রজাদের উত্তেজিত ক'রে বিদ্রোহিতার উদ্যোগ হচ্ছে—অতি শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ হবে।

(নেপথ্যে নাগারার শব্দ)

ঐ শুনুন নাগারার শব্দ—চীৎকার উল্লাস।

রাজ। এ তবে বিদ্রোহী প্রজাদের ঘোষণা?

ধ্রু। মহারাজ এ ঘোষণায় বধির, তিনি ভাবছেন, চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে তাঁর আদেশে অপরাধীর বলিদান হচ্ছে। তিনি শত্রুকে মিত্র ভেবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তমনে আমোদপ্রমোদ করছেন! দেবি, তাঁকে সাবধান করুন, এই মুহূর্ত্তে সাবধান করুন। এই কথা বলতেই আমি এসেছি।

রাজ। ভ্রাতঃ, এ কি বলছ তুমি? আমিও তাঁর নিকট অবিশ্বাসী—এইমাত্র তাঁর দ্বার হ'তে তাড়িত হয়ে এসেছি।

ধ্রু। কি উপায় তবে? না, সাবধান করতে পারলে হয় তো আজ রাত্রেই তিনি বন্দী হ'তে পারেন।

রাজ। ভ্রাতঃ, যাও, তুমি যাও, যে উপায়ে পার, তাঁকে রক্ষা কর।

ধ্রু। দেবি, আপনি আমাকে ভ্রাতা ব'লে সম্বোধন করেছেন—আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি। আমার প্রাণে অসীম উদ্যম, দেহে অমিত বলসঞ্চার হচ্ছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্বল্প সেনা নিয়েও নিশ্চয়ই এ বিদ্রোহ দমন করতে পারব।

রাজ। যাও ভ্রাতঃ যাও—ভগবান্ তোমার সহায় হোন্, এ যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রেরণা, এ জয়ে কেবল রাজরক্ষা নয়—রাজ্যরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা। ভগবান্ তোমার সহায় হোন্।

ধ্রু। চল্লেম। সম্ভবত যুদ্ধ করতে হবে না, তাদের অভিসন্ধি প্রকাশ হয়েছে—এ কথা রাষ্ট্র হ'লে আপন হতেই বিদ্রোহ দমন হয়ে যাবে। তা যদি না হয়—শেষ পর্য্যন্ত আমি সেনাপতিকে ব্যর্থ করতে চেষ্টা করব—অকৃতকার্য্য হয়ে না ফিরি, এই আশীর্ব্বাদ করুন।

(অবনত জানু হইয়া রাজকন্যাকে তাঁহার নমস্কার। পূজার ফুল মস্তকে দিয়া রাজকন্যার তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ)

রাজ। যাও ভ্রাতঃ, যাও ভাগ্যবান্, কর্ত্তব্য পালন কর—যাও পুণ্যবান্ ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ কর।

ধ্রু। (উঠিয়া) আপনার আশীর্ব্বাদে ধর্ম্মের বল আমি হৃদয়ের প্রতি অণুতে পরমাণুতে অনুভব করছি। জয় মহারাজের জয়,—জয় রাজকন্যার জয়—জয়—সত্যের জয়—জয় জয় ধর্ম্মের জয়—

(প্রতি বাক্যের সহিত তরবারি উত্তোলন এবং শেষে উত্তোলিত তরবারি মস্তকে স্পর্শ করত নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান।)

রাজ। হায়! হৃদয় তবু আশ্বস্ত হচ্ছে না—হয় তো এই ষড়যন্ত্রে মিত্রজনই শেষে নিষ্পেষিত হবে। হয় হোক,—তাতেই বা দুঃখ কি? এ মৃত্যু জীবনের চেয়েও প্রার্থনীয়, সুখের চেয়েও বরণীয়!

(মন্দিরমধ্যে প্রবেশ)

পঞ্চম দৃশ্য

রাজান্তঃপুর।

রাজা ও মহিষী উপবিষ্ট।

রাজা। মহিষি, আশ্চর্য্য ব্যাপার! কথা উঠেছে, তোমার সিপাহীসৈন্য দাসদাসী প্রজাপীড়ন করে, তোমার ভ্রাতা সেনাপতি অবিচারে প্রজাগণকে শাস্তি দান করেন—তোমারি আজ্ঞায় প্রজাদের ঘরে আগুন লাগান হয়েছিল,—এই সব।

ম। মহারাজ! তাই কি তুমি বিশ্বাস করেছ?

রা। আমি বিশ্বাস করব? কিন্তু তোমার শুভ্র নামে এই বৃথা অপবাদও আমার পক্ষে অসহ্য কষ্টকর।

ম। আমারি দুর্ভাগ্য! আমি প্রজাদের সন্তান-তুল্য ভালবাসি—তবু তারা আমার নামে অপবাদ রটায়।

রা। কিন্তু এর তো প্রতীকার করা চাই।

ম। প্রতীকার কি বল মহারাজ! এর প্রতীকার কি ক'রে হবে, আমার মৃত্যু ভিন্ন এর প্রতীকার আর কিছুই নেই।

রা। মহিষি, তুমি কি ভুলে যাও, ও রকম কথায় প্রতিশোধের স্পৃহা আরো জ্বলন্ত হয়ে উঠে, যারা এরূপ মিথ্যা রটনায় সাহস করে—তাদের শাস্তিবিধানই এর প্রতীকার।

ম। নিরীহ নির্ব্বোধ সব প্রজা—তাদের শাস্তি দিবার কথা মনেও এন না মহারাজ। তাদের কি দোষ? গৃহবিচ্ছেদ এর মূল। যে কথা বলতে আমার একেবারেই ইচ্ছা করে না, এমনি অদৃষ্ট যে, বাধ্য হয়ে সেই কথাই আমাকে বলতে হয়। নির্দ্দোষ প্রজাদের উপর তুমি রাগ করবে, তাও তো আমি সইতে পারি না।

রা। বল তবে; তুমি কি জান মহিষি!

ম। বলতে যে মুখ বন্ধ হয়ে আসে!

রা। তবু বল, আমার অনুরোধে বল।

ম। তবে বলি,—রাজকন্যার শত্রুতাই এই কথার কারণ।

রা। (স্বগত) তা তো আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি।

ম। যদি বল্‌লেম, তখন সব কথাই খুলে বলা ভাল। শুন্‌ছি, রাজকন্যাই প্রজাগণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন। তুমি তো রাজকার্য্য নিয়েই ব্যস্ত—কিছু ত খবর রাখ না—রাজকন্যাই এ রাজ্যের রাজা, তাঁর মহল হচ্ছে একটি দরবার স্থান। যত প্রজাদের আদর-আবদার, বিচার, পরামর্শ সব সেখানে চলে।

রা। আর ব'ল না, থাক্। বিয়ে দাও মহারাণি, বিয়েটা দিয়ে দাও, এ রাজ্য থেকে দূর হয়ে যাক্।

ম। বিয়ে কল্লে তো? তবে আরও একটু খুলে বল্‌তে হয়, কিন্তু মুখ যে ফোটে না!

রা। না, বল মহারাণি, আমার জানা আবশ্যক।

ম। সে পঞ্চনদকে কিছুতেই বিয়ে করবে না। ধ্রুবকুমার ব'লে কে একজন সৈনিক আছে, শুন্‌ছি, তারই প্রতি সে অনুরাগিণী, তাকে রাজ্যে বসানই তার উদ্দেশ্য!

রা। বিশ্বাস হচ্ছে না, বিশ্বাস হচ্ছে না, যতই দোষ থাক্, আমার কন্যা, সে কখনো দুশ্চরিত্রা হ'তে পারে না।

ম। প্রার্থনা করি মহারাজ, এ কথা মিথ্যাই হোক। কিন্তু সকলেই ধ্রুবকুমারকে তার কাছে সর্ব্বদা দেখতে পায়।

রা। যদি সত্য হয়, তা হ'লে চামুণ্ডার নিকট বলিদানই তার প্রায়শ্চিত্ত, এই আমাদের বংশের নিয়ম। কিন্তু প্রমাণ চাই, প্রমাণ চাই!

(নেপথ্যে চীৎকার, কোলাহল ও নাগরার শব্দ)

(প্রতিহারিণীর প্রবেশ)

প্র। মহারাজ, সেনাপতি দ্বারে দণ্ডায়মান; প্রজাগণ বিদ্রোহী!

রা। এ আবার কি ব্যাপার!

(ত্রাস্তে উঠিয়া দ্বারদেশে আগমন)

সেনা। (অন্তরাল হইতে) মহারাজ, দারুণ ষড়যন্ত্র, রাত্রিকালেই রাজবাটী আক্রমণ করবার উদ্যোগ হচ্ছিল; সৌভাগ্যক্রমে আমি ব্যর্থ ক'রতে পেরেছি।

রা। সত্য! কি আনন্দ! কে নেতা?

সেনা। ধ্রুবকুমার। তার দল ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তাকে ধরতে পারি নি, সে পলায়ন করেছে। শুনছি, রাজকন্যা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

রা। উঃ, আমি যে পাগল হয়ে যাব! সেনাপতি, তুমি বিদ্রোহীদের বন্দী কর, আমি এখনি রাজকন্যার কাছে যাচ্ছি।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ম। উঃ, বড় ভয়ে ভয়ে ছিলেম, কিন্তু দেবী চামুণ্ডা উদ্ধার করেছেন, চারিদিকের মেঘ কেমন আস্তে আস্তে কেটে গিয়ে আমার সৌভাগ্যসূর্য্যকে প্রকাশ ক'রে তুলেছে।

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাত। জয় হোক্ মহারাণীর!

ম। বল, খবর কি?

মাত। খবর কত বল্‌ব? একমুখে বলা যায় না। একদিক থেকে ফাঁসী, শূল, কারাবন্ধন, দ্বীপান্তর।

ম। বল, বল, ভাল ক'রে বল, প্রাণটা প্রফুল্ল হয়ে উঠুক, ফুল যেমন সূর্য্যকিরণে একটা একটা ক'রে খোলে, তেমনি ক'রে হৃদয়দল বিকসিত হতে থাকুক।

মাত। যারা বলেছিল, মহারাণীর হুকুমে আগুন লেগেছে, তাদের ফাঁসী, যারা রাজদ্বারে আবেদনে এসেছিল, তারা উত্তেজক ব'লে নির্ব্বাসিত, যারা চুপে চুপে আলোচনা করেছিল, তারা বেত্রাহত; যারা দাঁড়িয়ে দেখেছিল, তারা বন্দী।

ম। তারপর? এ বিদ্রোহটা আবার কি ব্যাপার বল দেখি!

মা। সেটা এখনো ঠিক বুঝতে পারি নি, তবে মনে হচ্ছে, রাজকন্যাকে ও ধ্রুবকুমারকে জব্দ কর্‌বার জন্যই সেনাপতির এ আর একটা ফন্দী।

ম। বেশ হয়েছে! ঠিক হয়েছে! মহারাজ রাজকন্যার পুরে গেলেন, এখন তাকে সেখানে দেখতে পেলে হয়; চামুণ্ডে, বলির রক্তে তোমার চরণ ধৌত কর্‌ব, দেবি, যেন মহারাজ সেখানে ধ্রুবকুমারকে দেখতে পান। তা নইলে আমার সমস্ত আয়োজন, সমস্ত উদ্দেশ্য বৃথা হবে।

মা। অভিনয়ের সব ঠিক, চলুন, দর্শন করবেন।

ম। চল চল, আজ আমার জয়ের দিন—হর্ষের দিন।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—পথ-সন্নিহিত উদ্যান-ভূমি

নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল, নাগরা-শব্দ, অস্ত্রধ্বনি, চীৎকার, আস্ফালন ইত্যাদি।

(উৎকণ্ঠিতভাবে রাজকন্যার প্রবেশ)

রাজ। (আকাশের দিকে চাহিয়া) উঃ, আকাশ কি মেঘাচ্ছন্ন! দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যা-ভ্রম হচ্ছে। রাত থেকে যুদ্ধ চলেছে, এখনো তো কোলাহলের নিবৃত্তি নেই—ক্রমশই যেন বাড়ছে! কোন্ পক্ষের জয় হ'ল, কিছুই তো বুঝতে পারছিনে। যাকেই সংবাদ আনতে পাঠাচ্ছি, সেই অদৃশ্য হয়ে পড়ছে! (করযোড়ে) হরি, বিপদের কাণ্ডারি, দয়াময়, রক্ষা কর প্রভু!

(হাসির ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ)

রাজ। বল বল—কি সংবাদ হাসি!

হাসি। রাজকন্যে, উঃ, কি দৃশ্য—সে কি দৃশ্য!

রাজ। মহারাজ অক্ষত তো?

হাসি। কি বলব রাজকন্যে, কিছুই জানিনে, শুধু কানে বাজছে সেই গগনভেদী চীৎকার, হুঙ্কার আর চোখের উপর নৃত্য করছে, সেই সহস্র হস্তের অসির ঝলক, রক্তের ঝলক, কাটামুণ্ড আর কাটা দেহ।

রাজ। (স্বগত) বল দাও প্রভু, বল দাও।

হাসি। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাজকন্যে! তবু দূর থেকে দেখেছি ; তোমাকে যে একা ফেলে গেছি—নইলে—

রাজ। ধ্রুবকুমার—হাসি?

হাসি। জানিনে রাজকন্যে, কি ক'রে জানব, কে ধ্রুবকুমার?

রাজ। (স্বগত) হৃদয় যে অবসন্ন হয়ে আসছে।

হাসি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সেই চলন্ত মানুষের দল মারছে, কাটছে, চীৎকার করছে—আর—

রাজ। (স্বগত) এ কি আশঙ্কা—এ যে তাঁর মঙ্গল শক্তির প্রতি অবিশ্বাস!

হাসি। আর আহত হয়ে মাটীতে পড়ছে। তার মধ্যে কে শত্রু, কে মিত্র, কে আত্মীয়, কে পর, কি ক'রে জানব—কি ক'রে চিনব রাজকন্যে!

রাজ। (স্বগত) তবু ভক্তি অটল রাখ দেব,—বিশ্বাস অবিচলিত হোক্।

হাসি। হায়! হায়! কত আত্মীয়-স্বজনকে না জানি হারালেম!

রাজ। তাই হয় হোক, অন্ধকার প্রভাতের আগমনই ঘোষণা করে, ঝটিকা শান্তিরই পূর্ব্বসূচনা, সেই শোণিতপাতেই যদি তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাই হোক! বল দাও প্রভু, বল দাও।

(নেপথ্যে দ্বিগুণতর কোলাহল, হুঙ্কার, মার মার কাট কাট ধ্বনি, উভয়ে ব্যাকুলভাবে পথের দিকে নিরীক্ষণ)

হাসি। (ভীতচকিতভাবে) রাজকন্যে, বিদ্রোহীরা এই দিকে আসছে, মন্দিরে চলুন, মন্দিরে চলুন!

(মন্দিরাভিমুখে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় রাজকন্যার হস্তধারণ)

রাজ। শান্ত হও হাসি, নির্ভয়ে থাক। আমাদের প্রতি এরা কখনই কোন অত্যাচার করবে না—এ কি—এ কি!

হাসি। (রাজকন্যার হস্ত ত্যাগ করিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ) দেখুন—দেখুন—সত্যই তারা এই দিকেই আসছে—এইখানেই—

রাজ। এ যে ধ্রুবকুমার! অভিমন্যুর মত চারিদিক্ থেকে সকলে তাঁকে আক্রমণ করেছে। ক্ষান্ত হও সৈন্যগণ—থাম থাম

(নেপথ্যে)

বহুকণ্ঠে। এ যে আমাদের রাজকন্যা, তিনি কি আদেশ করছেন শোন!

রাজ। তোমরা আমার ভাই, আমার সন্তান—অসহায় আহতজনকে আঘাত ক'র না তোমরা।

(নেপথ্যে ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে)

১। ছেড়ে দাও তবে, ছেড়ে দাও,—

২। যাঃ তবে। বড় ভাগ্যের জোর বেটার, বেঁচে গেল!

৩। বেশ বাগিয়ে জাল ফেলা গিয়েছিল, মস্ত মাছটা ফস্কে গেল রে।

রাজ। ইনি আমাদের শত্রু নন, মিত্র, সহায়, বন্ধু—

(নেপথ্যে)

বহুকণ্ঠে। এ বেটারা কে শত্রু, কে মিত্র, তা তো বোঝার যো নেই—সবাইকেই এক কোপে নিকেশ করতে পারলেই মঙ্গল।

১। কিন্তু রাজকন্তে আদেশ করেছেন, তার উপর তো কথা নেই। বা বেটা বা—তোর অনেক পরমায়ু।

সকলে। প্রণাম হই রাজকন্তে, জয় আমাদের রাজকন্যার জয়—জয়—জয়!

(জয়ধ্বনি করিতে করিতে নেপথ্য হইতে সকলের প্রস্থান—রক্তাক্তদেহে ধ্রুবকুমারের প্রবেশ)

ধ্রু। দেবি, ভগিনি, কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে, মহারাজ অক্ষত, বিদ্রোহী নিবারিত হয়েছে।

(বলিতে বলিতে পদতলে ভূমিতে পতন)

রাজ। জল—হাসি—জল—শীঘ্র ঐ পুকুর থেকে জল আন। (পার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হায়, তুমি যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এসেছ ভ্রাতঃ!

[হাসির প্রস্থান।

(রাজকন্যা—ধ্রুবকুমারের অঙ্গবস্ত্র উন্মোচনে নিরত)

রাজ। (রক্তাক্ত অঙ্গরক্ষা খুলিতে খুলিতে) ভ্রাতঃ! তুমিই ধন্য! সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য এ জীবন তুমি তুচ্ছ করেছ। হায়! তবু কেন চোখের জল মানছে না! উঃ, একখানা ভাঙ্গা বর্শাফলক এখনো বুকে বিঁধে রয়েছে—রক্তে যে স্থান ভেসে গেল।

(বর্শাফলক তুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ ও অঞ্চলবস্ত্রে রক্তমার্জ্জন)

ধ্রু। (মুদ্রিত-নেত্রে হস্ত আস্ফালন করিয়া) দুর্ব্বৃত্ত—কুতম!

রাজ। শান্ত হও, শান্ত হও বৎস,—তুমি জয়ী হয়ে এসেছ।

ধ্রু। (চক্ষু খুলিয়া) ভগিনি, দেবি, এ তুমি! কি শান্তি! কি আনন্দ! মহারাজ অক্ষত—সেনাপতি ব্যর্থ—আঃ!

(পুনরায় মূর্চ্ছিতভাবে অবস্থান। উদ্যানভূমিতে পতিত একটা জীর্ণ ঝারিতে করিয়া হাসির জল লইয়া আগমন।)

রাজ (ধ্রুবকুমারের ক্ষতস্থানে জল দিতে দিতে) যাও, হাসি তুমি আবার যাও, ছুটে প্রলেপাদি নিয়ে এস—আর পথে যাকে পাও, শিবিকা আনতে বলো।

হা। আর তুমি একলা—

রাজ। যাও হাসি, দেরী ক'র না। আমি একলাই সেবা করছি—যাও। [হাসির প্রস্থান।

রাজকন্যা। (ধ্রুবকুমারের ক্ষতস্থান ধৌত করিতে করিতে) হায়! এ শোণিতে কি মহারাজের জাগরণ হবে না—হবে না? ধর্ম্মের আলোকে—সত্যের আলোকে—তাঁর অন্ধ নয়ন খুলে যাবে না? অসত্যের জয় যে অল্পদিন, সত্যের জয় চিরন্তন।

ধ্রু। (মুদিত-নেত্রে) কোথায় গেল, কোথায় গেল, তাকে যে ধরতে পাচ্ছিনে।

রাজ। শান্ত হও ভ্রাতঃ! হায়! এখনো যুদ্ধের মধ্যেই বিরাজ কর্‌ছেন। এ কি! এঁর বক্ষ থেকে এ কি রত্ন হাতে খুলে এল, জলে ধুয়ে যেন তারার মত জলছে। এ কি! এ কি! এ যে আমারই আমার কবচ! ভ্রাতঃ, বৎস বীর, এত দিন যে আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলেম! প্রিয়তম, প্রাণাধিক! আজ কি মৃত্যুতে তোমাকে পেলেম!

(নত হইয়া দুই হস্তে ধ্রুবকুমারের কণ্ঠবেষ্টন, রাজার প্রবেশ ও স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান)

রাজা। সত্য তবে তবু সত্য! সব সত্য! আমার অন্তরের ভিতর থেকে এ কথার যে প্রত্যয় জন্মায় নি। তবু সত্য! দুশ্চারিণি—

রাজ। (সচকিতে ও সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) পিতঃ—মহারাজ—তোমারই সন্তান, এ তোমারি—

রাজা। (অসিতে হাত দিয়া) চুপ, লজ্জাহীনা, চুপ পাপীয়সি, বিধাতাপুরুষকে শত ধিক্কার যে, তুই আমার সন্তান। এ অস্ত্রে আজ—না, এ হস্ত তোর পাপরক্তে কলঙ্কিত করব না।

(দ্রুতবেগে নিষ্ক্রমণ, দ্বারদেশে, সেনাপতিকে দেখিয়া নেপথ্য হইতে)

সেনাপতি! চামুণ্ডা-মন্দিরে এখনি বলিদানের আয়োজন করতে বল—আর সৈনিকের মৃতদেহ চণ্ডাল-হস্তে সমর্পণ কর।

সেনা। (নেপথ্য হইতে) যথাদেশ।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাজকন্যা। তবু ধৈর্য্য ধরতে হবে, উঃ, কি করব—কি উপায়! কি ক'রে বাঁচাব! (একটি বৃক্ষপত্র কুড়াইয়া) এই পাতায় এই রক্ত দিয়েই পত্র লিখি—সময় নেই—সময় নেই! অবসাদ, ক্রণকাল দূরে থাক; মৃত্যু, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর—ভগবান, বল দাও—বল দাও।

(বর্মাকলকখণ্ডে ভূমি হইতে রক্ত লইয়া গাছের পাতায় পত্র লিখিয়া)

কা'কে দেব ? কে নিয়ে যাবে ? বুঝি সব বৃথা হ'ল এখনি এসে পড়্বে, ঐ বুঝি এলো।

(বিদূষকের প্রবেশ)

উঃ, ভগবান্ রক্ষা কর্লেন ! ধন্য তাঁর দয়া !

বিদূ। হাসির সঙ্গে পথে দেখা, সে আমাকে এই সব ওষুধ-বিষুধ দিয়ে এখানে পাঠালে, আর নিজে শিবিকার চেষ্টায় গেল। উঠুন—আপনি উঠুন—আমি সেবা কর্ছি। বেদবেদান্ত কিছু শিখি না শিখি, বৈদ্যশাস্ত্রটা এক রকম দখল করেছি—বিশ্বাস কর্বেন।

রাজ। (উঠিয়া) বিদূষক, দাও—ওষুধ আমাকে দাও—আর তুমি শীঘ্র যাও, এই পত্র নিয়ে এখুনি ছুটে যাও।

বিদূ। আবার ছুটতে হবে ? (বক্ষে হাত দিয়া) উঃ, এখনো নিশ্বাস পড়ছে না। (পত্র গ্রহণ করিয়া) এ কি, এ যে রক্তে লেখা ! কোথায় যাব ?

রাজ। যাও বিদূষক, শীঘ্র যাও, আর সময় নেই—এই পত্রখানি মহারাজকে দিতে হবে, যদি পত্রখানি না দিতে পার তো মুখে ব'ল, এ সৈনিক তাঁরই সন্তান, আমাদের যুবরাজ—রাজপুত্র মরেন নাই।

বিদূ। ধ্রুবকুমার আমাদের রাজপুত্র ?

রাজ। হ্যাঁ বিদূষক, যাও, সেই কথাই মহারাজকে শীঘ্র বল ; নইলে শত্রুর হাত থেকে এঁকে বাঁচাতে পারব না, শীঘ্র যাও, আর এই কবচটি তাঁকে দিও, তা হ'লেই তিনি সব বুঝবেন।

বিদূ। আমাদের রাজপুত্র জীবিত ! কি আনন্দ—কি আনন্দ ! যাচ্ছি—এখনি যাচ্ছি ! এই সু-খবর আমিই তাঁকে দেব,—দেখবেন, এ কথা আর কাউকে এখন বলবেন না।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

রাজ। (পুনরায় উপবেশনপূর্ব্বক ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে দিতে) রক্তে যে ভেসে গেল ! হাসি তো এখনো শিবিকা নিয়ে এল না ? আবার কার পায়ের শব্দ এ ! হায় ! বুঝি পারলেম না—সব নিষ্ফল—সব ব্যর্থ ! ভগবান্ দয়াময়—

(চণ্ডালসৈনিকগণের সহিত সেনাপতির প্রবেশ ও সকলের রাজকন্যাকে সৈনিক প্রথায় নমস্কার)

সেনা। শিবিকা প্রস্তুত, আপনি উঠলেই—

রাজ। শিবিকার প্রয়োজন নেই, মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর—আমি এখনি পদব্রজে চামুণ্ডা-মন্দিরে উপস্থিত হব।

সেনা। ক্ষমা কর্বেন, এ জীবন থাক্তে সে নিষ্ঠুর আদেশ পালিত হ'তে দেব না। আপনাকে নিরাপদ্ কর্বার জন্য আমি শিবিকা এনেছি ; বিলম্ব কর্বেন না।

রাজ। তোমাদের মঙ্গল হোক্ ! আমি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে অপারগ—কেবল একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা আমার আছে।

সেনা। বলুন—আমি আপনার দাস !

রাজ। সৈনিকেরা যেন এই দেহ স্পর্শ না করে।

সেনা। (স্বগত) কি অনুরাগ হৃদয়ে জ্বলে উঠছে ! (প্রকাশ্যে) ক্ষমা করুন—আপনাকে রক্ষার জন্য রাজাদেশ লঙ্ঘন কর্তে পারি ; কিন্তু সামান্য সৈনিকের জন্য—

রাজ। সামান্য সৈনিক ! (স্বগত) না, বলা হবে না।

সেনা। সৈনিকগণ, এই শব উঠিয়ে নিয়ে যাও।

(সৈনিকগণের ধ্রুবকুমারকে লইতে আগমন)

রাজ। বৎসগণ, এঁকে তোমরা স্পর্শ ক'র না, দূরে দাঁড়াও—তোমাদের রাজকন্যার আদেশ—দূরে দাঁড়াও।

(সৈনিকগণের সচকিতে দূরে দণ্ডায়মান ও সভয়ে সেনাপতিকে নিরীক্ষণ)

সেনা। আপনি কন্যা হয়ে রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনে এদের প্রবৃত্ত করছেন ?

রাজ। না। মহারাজ শব নিয়ে যেতে বলেছেন ; এ সৈনিক এখনো জীবিত।

সেনা। (স্বগত) উঃ, সহ্য হয় না। জীবিত ! এই মুহূর্ত্তে এই অসির আঘাতে শত খণ্ড ক'রে ফেল্তে ইচ্ছে হচ্ছে যে ! কিন্তু তা'তে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। (প্রকাশ্যে) রাজকন্যার আদেশ—সৈনিকগণ, যতক্ষণ না আমি ডাকি, তোমরা অন্তরালে দাঁড়াও।

(সৈনিকগণের যবনিকার অন্তরালে গমন)

সেনা। রাজকন্যা যা আদেশ করবেন, এ দাস তাই পালন করতে প্রস্তুত। আপনার জন্য এ জীবন-দানও তুচ্ছ কথা—কিন্তু দাসও পুরস্কার প্রার্থনা করে।

রাজ। বল, কি পুরস্কার চাও?

সেনা। আপনাকে—আমার—মহিষী—

রাজ। মাতঃ বসুন্ধরা—বিদীর্ণ হও, বিদীর্ণ হও—বিদীর্ণ হও!

সেনা। (সক্রোধে) সামান্য সৈনিকের পদসেবা অপমানের নয়—আর আমার মহিষী—

রাজ। চুপ নরাধম—চুপ নরাধম—

(করযোড়ে উর্দ্ধে দৃষ্টিদান এবং ধ্রুবকুমারের সহসা উত্থান)

ধ্রুব। পাপিষ্ঠ নরাধম! এত বড় স্পর্দ্ধা! এই—এই—এই প্রতিফল!

(সেনাপতির বক্ষে অসি বিদ্ধকরণ এবং সেনাপতি ও ধ্রুবকুমার উভয়েই ভূমিতে পতন!)

সেনা। উঃ, কি জ্বালা! সৈনিকগণ, চণ্ডালগণ, লও, ধর, বাঁধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

ধ্রুব। এখন মৃত্যুতেও আমার দুঃখ নাই।

পটক্ষেপ।

সপ্তম দৃশ্য

মন্দিরে—দেবীর সম্মুখে বলির স্থান। স্তম্ভিত পুরোহিতের পার্শ্বে পূজারী এবং রাজকন্যার পার্শ্বে ক্রন্দন-পরায়ণ সখীগণ দাঁড়াইয়া।

রাজ। ঠাকুর, আর বিলম্ব করবেন না, রাজার আদেশ—

পু। মাতঃ! আমি রাজাদেশ-পালনে অক্ষম। মাতৃরক্তে আমি মাতার পূজা করতে পারব না—আজ হ'তে আমি আমার পৌরোহিত্য ত্যাগ করলেম।

রাজ। (পূজারীর নিকট অগ্রসর হইয়া) পূজারী, তবে তুমি এস! মন্ত্রের জন্য আর অপেক্ষা ক'র না, বৃথা কেন কালক্ষেপ করছ—রাজাজ্ঞা পালন কর।

(ভূমি হইতে খড়্গ উঠাইয়া)

এই লও খড়্গ, পিতার আজ্ঞালঙ্ঘন-পাপ থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

পূজারী। (নতমুখে অস্পষ্টস্বরে) পারব না—পারব না!

(হাসির তাড়াতাড়ি রাজকন্যার হস্ত হইতে খড়্গগ্রহণ এবং তাহা পূজারীর পদমূলে রাখিয়া নতজানু হইয়া উপবেশন।)

হাসি। ঠাকুর, আমার রক্ত গ্রহণ করুণ—রাজকন্যার বদলে আমাকে—

রাজ। (গম্ভীর স্বরে) ওঠ হাসি—আমার আজ্ঞা—ওঠ।

লতা। আমি এসেছি দেব—আমাকে—

পাতা। তুমি সর, আমি—আমি—

ফুল। ওঠ, তোমরা ওঠ, আমাকে ঠাকুর—

রাজ। সখীগণ, তোমরা আমার ধর্ম্মপালনে বাধা দিও না, আমাকে কর্ত্তব্যপালনে বল দাও—ওঠ—মিনতি করছি—আজ্ঞা করছি—ওঠ, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন!

(সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া করযোড়ে প্রার্থনা)

সমস্বরে। অভয়া অভয় দান কর—অভয় দান কর—তারিণি, ত্রাণ কর—ত্রাণ কর।

(মাতঙ্গিনীর সহিত রাণীর প্রবেশ)

রাণী। জানি, আমি জানি—এ কাজে কেউ অগ্রসর হবে না। কাপুরুষ পুরোহিত—ভক্তিহীন পূজারী! তোরা নরাধম—নরাধম! মাতঙ্গিনি—চিরকালই তুমি আমার সখী—সহায়; এইবার তোমার প্রীতি-ভক্তির চরম পরীক্ষা! এস—এস!

(তাহার হস্তে খড়্গ প্রদান)

মা। (খড়্গ হস্তে লইয়া পুনরায় মাটীতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) মহারাণি, ক্ষমা করবেন—পারব না—পারব না, আর যা বলবেন, তাই করব—কিন্তু—

রাণী। এ কি মাতঙ্গিনি—এ সময় তুমিও আমাকে ত্যাগ করবে? এই শেষ মুহূর্ত্তে—শেষ মুহূর্ত্তে! তুমি যে একদিন আমারি আদেশে আমারি মঙ্গলের জন্য এর ভাইকে—শিশু রাজপুত্রকে বধ করেছিলে—আর আজ—

মাত। না, বধ করি নি, আমি পারি নি মহারাণি—ধাত্রী তাকে নিয়ে গিয়েছিল। আজও পারব না—এ কাজ পারব না, আর যা বলেন—

রাণী। কি বল্লে তুমি? ধাত্রী তাকে নিয়ে গেছে? পার নি তুমি? পারবে না? এই দেখ (খড়্গ তুলিয়া) শির নত কর্ পাপীয়সি!

রাজ। (মস্তক নত করিয়া) নমস্কার মাতঃ, এ প্রাণ গ্রহণ করুন—রাজ্যের মঙ্গল হোক—

রাণী। (খড়্গ তুলিয়া) এ কি! আমার হাত উঠে না কেন? অঙ্গ যে অবশ হয়ে আসছে, চামুণ্ডে, সদয় হও।

রাজ। হায়! এই হতভাগিনীর জন্য কত লোকের কষ্ট! মাতঃ, আর না, প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও, আমাকে গ্রহণ কর, রাজ্যের অশুভ অমঙ্গল নিবারিত হোক্।

(রাণীর অবসন্ন হস্ত হইতে খড়্গ স্খলিত হইয়া
রাজকন্যার অঙ্গে পতন এবং ধরাশায়ী
রাজকন্যার রক্তে ভূমিতল প্লাবিত।
সকলের চিত্রার্পিতের ন্যায়
অবস্থান, রাজা ও বিদূ-
ষকের মন্দিরসম্মুখস্থ
পথে আগমন।)

রাজা। (কবচ নিরীক্ষণ করিতে করিতে) সত্য ক জীবিত! বল বিদূষক! ধ্রুবকুমার আমারি পুত্র! সত্য কথা, না মিথ্যা প্রতারণা?

বিদূ। মিথ্যা নয়, সত্যই রাজপুত্র জীবিত! রাজকন্যার অন্তঃপুরে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা হচ্ছে। কিন্তু আপনি শীঘ্র চামুণ্ডার মন্দিরে আসুন, আগে রাজকন্যার বলি নিবারণ করুন।

রাজা। কল্যাণীর বলি!

বিদূ। হাঁ মহারাজ, আপনারই আদেশে তিনি সিস্থানে গেছেন।

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—যাও বিদূষক, যাও, বলি নিবারণ কর, এখনি—এখনি—

বিদূ। এই যে আমরা চামুণ্ডা-মন্দিরের দ্বারেই এসেছি।

(উভয়ের মন্দির-মধ্যে প্রবেশ)

রাজা। (উন্মত্তভাবে) এ কি! কি দৃশ্য এ! কি স্বপ্ন!

বিদূ। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া) না মহারাজ, এ জাগরণ।

রাজা। অভাগিনি! বৎসে, সত্যই পিতা হয়ে তোমায় বলিদান দিলেম! চামুণ্ডে—রাক্ষসি, এ কি করলি—এ কি হ'ল!

(কন্যার পদতলে পতন)

(চিত্রার্পিত দৃশ্য,—শূন্যদেশ উজ্জ্বল আলোক মালায় রঞ্জিত।)

পটক্ষেপ।

শেষ দৃশ্য

(রাজার সন্ন্যাসিবেশে প্রবেশ)

রাজা। উঃ! কি রক্ত! সে কি রক্ত! সে রক্তে জগৎ-সংসার লাল হয়ে গেছে! এতদিন বিশ্ব অন্ধকার ছিল—সেই পবিত্র রক্তের স্রোতে সে অন্ধকার কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! যে নয়ন এতদিন অন্ধ ছিল, তার নিমীলিত নয়নের দৃষ্টি দিয়ে সেই অন্ধ নয়ন সে ফুটিয়ে তুলে গেছে,—আজ পূর্ণ জাগরণ নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়িয়েছি। হে বিশ্ব-নিয়ন্তা, মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষ—তাই হোক্, তাই হোক্, যে উদ্দেশ্যে সে প্রাণপাত করেছে, সে উদ্দেশ্য সফল হোক্। এ রাজ্য হ'তে মিথ্যা ধর্ম্ম দূর হোক্, আচারের নামে বিদ্বেষ, ঘৃণা, পাপাচার, দেবপূজার নামে প্রাণিহত্যা, নরবলি দূর হোক্। মঙ্গলসত্যের মহিমাবিস্তারই মানবের ব্রত হোক্—পুণ্যকল্যাণে, শান্তিমমতায় মর্ত্ত্যলোকে নবযুগ অভ্যুদিত হোক্। হে শুভশক্তিদাতা জ্ঞানস্বরূপ, তুমি সহায় হও, জ্ঞান দাও—বল দাও, তোমার পুণ্যশক্তিতে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ কর।

(নিশানহস্তে সন্ন্যাসিনীবেশে হাসি, লতা, পাতা,
ফুল, রেণু প্রভৃতি বালিকাগণের গাইতে
গাইতে প্রবেশ)

জয় জয় সত্যের জয়।
দুঃখে কষ্টে ক্ষয়, মৃত্যু অমৃতময়
সত্য ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে
মিথ্যা হউক লয়,
পাপ হউক ক্ষয়!
জয় জয় ধর্ম্মের জয়।

যবনিকা-পতন।

সমাপ্ত।